জনসভার সাহিত্য

বিনয় ঘোষ

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১৩৬২ আশ্বিন

প্রুফ সংশোধক : জগন্নাথ ভট্টাচার্য

অরিজিৎ কুমার, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা ৪ প্রকাশিত
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত, বাণীশ্রী, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা ৬ মুদ্রিত
ও দীনেশ বিশ্বাস, ১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা ৯ গ্রন্থিত।

বিষয়

রাজসভার সাহিত্য

রাজসভার সাহিত্য। পেট্রনের যুগ

প্রথম প্রস্তাব

CUSTOMERS ARE OUR PATRONS

বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স ও দোকানে ঢুকলে দেখা যায়, অনেক ভাল ভাল বাণীর সঙ্গে এই বাণীটিও দেয়ালের গায়ে লটকানো আছে। অন্যান্য বাণীর চেয়ে এর যে বিশেষ কোনো আকর্ষণ বা মূল্য আছে, ক্রেতা-তথা-পেট্রনদের কাছে তা মনে হয় না। থাকবেই বা কেন? ওরকম কত বাণীই তো অহরহ আমাদের চোখে পড়ছে, এমন-কি আজকাল ঝল্‌সে উঠছে পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর অক্ষরে, তবু তার একটি অক্ষরও আমাদের মনে থাকে না। তার উপর আবার দোকানদারের বাণী। কাশীরাম দাস কথিত মহাভারতের কথা পুণ্যবানরা 'অমৃত সমান' মনে করতে পারেন, কিন্তু দোকানদারের কথা স্বয়ং বেদব্যাস বর্ণিত হলেও কোনো ভাগ্যবান ক্রেতাও তাকে অমৃতবৎ মনে করবেন না। কেনই বা করবেন? উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে যাঁরা চালাকির দ্বারাই সমস্ত কাজ সারাজীবন ধরে করছেন, তাঁদের দোকানে যদি 'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না'—এই মহাপুরুষোক্ত বাণী দেয়ালে লটকানো থাকে, তাহলে নগদ মূল্য দিয়ে যাঁরা কেনাকাটা করেন তাঁদের কাছে অন্তত তার কোনো মূল্যই থাকে না। তাই 'ক্রেতারাই যে বিক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষক'—একথার তাৎপর্য কোনো ক্রেতাই বোধহয় আজ পর্যন্ত ভেবে দেখেন নি, দেখা প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু একথার যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, সেই কথাই এখানে বলছি।

এমন এক যুগ ছিল যখন দোকানদাররা একথা দেয়ালের গায়ে লিখে রাখতেন না। সেটা মধ্যযুগ। প্রাচীনযুগে তো রাখতেনই না, মধ্যযুগেও না। 'কাস্টমার' বা ক্রেতা কথার তখন উৎপত্তি হয়নি। ব্যবসায়ী ও কারিগররা পণ্যদ্রব্য তৈরি করতেন প্রধানত রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওম্‌রাহদের সন্তুষ্ট করবার জন্য, সাধারণ ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়। আমাদের দেশের এই অবস্থা মাত্র একশো বছর আগেও ছিল, অর্থাৎ ব্রিটিশ-যুগেও দীর্ঘকাল ছিল। ব্রিটিশযুগের ঠিক আগে, মোগলযুগের শেষে এই দোকানদারি ও কারিগরির অবস্থা কি ছিল তা সম্রাট ঔরঙ্গজীবের অন্যতম বিদেশী চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়াঁ বার্নিয়ের তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মঁশিয়ে ছ লা

ভেয়ারের কাছে 'দিল্লী ও আগ্রা' সম্বন্ধে লিখিত পত্রে বার্নিয়ের বলেছেন যে, মোগল রাজধানী দিল্লীর দোকানে জিনিসপত্র সাজানো থাকে না বিশেষ। দিল্লীর শিল্পী ও কারিগরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।[১] সাধারণ মানুষ ও ক্রেতার সঙ্গে দোকানদার বা কারিগরের যেন কোনো সম্পর্কই নেই মনে হয়। না থাকবারই কথা, কারণ বার্নিয়ের বলেছেন যে, রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ ও বড় বড় রাজকর্মচারীরা কখনো দোকানে গিয়ে জিনিসপত্তর কেনেন না। তাঁদের যখন যে জিনিসের দরকার হয়, তখন সেপাই-সামন্ত পাঠিয়ে তাঁরা শিল্পী-কারিগরদের বাড়িতে ধরে নিয়ে আসেন এবং তাদের বরাত দিয়ে বাড়িতে জিনিস তৈরি করিয়ে নেন। জিনিস তৈরি হবার পর প্রভু যদি তুষ্ট হন, তাহলে কারিগররা যৎসামান্য কিছু দক্ষিণা পায়। দক্ষিণা নিয়ে মুখ বুজে শিল্পীদের চলে যেতে হয়, কারণ বিড়-বিড় করে বিক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রভুরা বেত্রাঘাত দক্ষিণা দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই হল সাধারণ অবস্থা। খুব উচ্চস্তরের দু'চারজন আমীর-ওমরাহ বাঁধা বেতনে খোরপোষ দিয়ে কারিগর রাখেন। আর খোদ সম্রাটের বেতনভুক শিল্পী যাঁরা তাঁরা অবশ্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি তোয়াজে থাকেন। এই হল মধ্যযুগের কারিগরী ও ব্যবসাদারির কথা। প্রভুরাই তখন ছিলেন পেট্রন এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা ছিলেন তাঁদের আজ্ঞাধীন অনুচর মাত্র। শিল্পী-ব্যবসায়ীর কোনো স্বাধীনতা ছিল না এবং স্বাধীনতা না থাকলে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধও থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না একালের মতো। সরল সহজ একঘেয়ে জীবন বাঁধাধরা মোটা জিনিসেই তৃপ্ত হত। দু'মুঠো ভাত আর দু'খানা মোটা কাপড়ের (আধুনিক দশহাত কাপড় নয়) জন্য ব্যবসায়ীদের দোকান সাজাবার দরকার হত না। ধান হত মাঠে, আর কাপড় হত তাঁতশালে। দোকানের প্রয়োজন কোথায়? জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা যাঁদের প্রধানত ভাত-কাপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আধুনিক অর্থে তাঁরা 'কাস্টমার' বা ক্রেতা-পদবাচ্যও ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের জন্য দোকানে দেয়ালবাণী লটকানো তো দূরের কথা, দোকান খোলারই বিশেষ প্রয়োজন হত না। জানি না, সেই রাজা-রাজড়ার যুগে কোনো দুঃসাহসী ব্যবসায়ী বা দোকানদার তাঁর দোকানের সামনে 'Customers are our Patrons' কথাটা লটকে রেখেছিলেন কি না। যদি রেখে থাকেন তাহলে

আমীর-অমাত্যরা তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য যে তাঁকে কোনো গাছের ডালে প্রকাশ্যে লটকে দিয়েছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চক্ষু রক্তবর্ণ করে নিশ্চয় তিনি বলেছিলেন : 'কাস্টমার? ক্রেতা? ক্রেতারা পেট্রন? এত বড় স্পর্ধা।' সাধারণ মানুষ যে শিল্পী-ব্যবসায়ীদের 'পেট্রন', একথা উচ্চারণ করার পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল না কারও। ফিউডাল যুগের সর্বময় কর্তা রাজা-বাদশাহ আমীর-অমাত্য-সামন্ত প্রভুরা এবং তাঁরাই সবকিছুর একমাত্র 'পেট্রন'। ক্রেতা ও বিক্রেতা নয়, ভৃত্য ও প্রভু, এই হল সে-যুগের অন্যতম সামাজিক সম্বন্ধ। সুতরাং সাধারণকে ক্রেতা বা বিক্রেতা মনে করাটাই অমার্জনীয় অপরাধ এবং ক্রেতাদের 'পেট্রন' বলা রাজদ্রোহিতার নামান্তর মাত্র। 'Free Market' বা 'খোলা বাজার' বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব ছিল না মধ্যযুগে। কেনারও যেমন স্বাধীনতা ছিল না, বেচারও তেমনি স্বাধিকার ছিল না। কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণের সর্বময় কর্তা ছিলেন ফিউডাল লর্ডরা। সর্বপ্রকারের লেনদেন ও বেচাকেনা নিয়ন্ত্রিত করে তাঁরা মানুষের সামাজিক জীবনটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই ছিল প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের অবস্থা। অতএব এ-যুগের দোকানে লটকানো যে বাণীকে আমরা অবজ্ঞা করি, উপেক্ষা করে চলি, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। সামান্য কাষ্ঠফলকে লটকানো কৃত্রিম বিবর্ণ একটা বাণী — 'Customers are our Patrons' — কিন্তু কি ভয়ানক তাৎপর্য তার! যুগ-যুগান্তের কত অলিখিত ইতিহাসই না ঐ কয়েকটা কথার মধ্যে লেখা রয়েছে। কল্পনা করা যায় না।

আমাদের কথা বলি। অনেকেই শুনেছেন, ট্রেনযাত্রী রবীন্দ্রনাথকে জনৈক সহযাত্রী একদা নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'মহাশয়ের কি করা হয়?' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'লিখি।' উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন : 'তা তো বিলক্ষণ বুঝলাম, কিন্তু করা হয় কি?' রবীন্দ্রনাথ আবার স্থিরভাবেই উত্তর দেন : 'শুধু লিখি, আর কিছু করি না।' ভদ্রলোক নিশ্চয় সন্তুষ্ট হন নি এবং 'শুধু লিখি' এই কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে তাঁর মুখের চেহারা যে কিরকম হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় দেখেছিলেন, কিন্তু আমাদের কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই। লেখাটা যে একজন ভদ্রলোকের জীবনের একমাত্র পেশা হতে পারে, একথা তো আজও অনেক ভদ্রলোক ভাবতে পারেন না। 'কি করেন' কথার উত্তরে কেউ যদি বলেন 'ধূমপান করি', তাহলে যেরকম অবস্থা হয়, কতকটা সেইরকম। তাই নিজেদের 'লেখক' বলতে আমি অন্তত ভরসা পাই না, সাধু ভাষায় 'সাহিত্যিক' তো নয়ই। যেকথা আধুনিক বাণিজ্যের যুগে, বেচাকেনার যুগে, সকলে বিনা টীকায় বুঝবেন, তাই বলাই ভাল। অর্থাৎ আমরা

লেখক বা সাহিত্যিক নই, কেবল 'বাক্যব্যবসায়ী'। ব্যবসায়ী যখন তখন প্রশ্ন ওঠে, আমাদের পৃষ্ঠপোষক বা 'পেট্রন' কারা? প্রকাশকরা, না পাঠকরা? প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কোনো লেখকই বোধহয় কথাটা আজ পর্যন্ত ভাল করে ভেবে দেখেন নি। গ্রন্থাকারে বাক্যের পশরা সাজিয়ে আমরা প্রকাশকদের দ্বারে-দ্বারে ফিরি করি, প্রকাশকরা দরদস্তুর করে কিনে নেন। কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে বেচাকেনার পালাটা এইখানেই শেষ হয়ে যায় না। প্রকাশকরা নিজেদের জন্য কেনেন না, কেনেন পাঠকদের জন্য। বই প্রকাশিত হবার পর পাঠকরা যখন কেনেন তখন বই বেচাকেনার পালা শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথমে আমরা যারা বাক্যব্যবসায়ী, তারা বই বিক্রি করি, প্রকাশকরা কেনেন। প্রথম পর্বে, লেখক বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী এবং প্রকাশক কাস্টমার বা ক্রেতা। পরে প্রকাশকরা বই বিক্রি করেন, কেনেন পাঠকরা। অর্থাৎ দ্বিতীয় বা শেষ পর্বে বিক্রেতা ও ব্যবসায়ী হলেন প্রকাশকরা এবং কাস্টমার বা ক্রেতা হলেন পাঠকরা। ব্যবসায়ের বাজারে ক্রেতারা যদি পেট্রন হন তাহলে বাক্যব্যবসায়ী লেখকদের ঘরের দেয়ালে 'Publishers are our Patrons' এবং প্রকাশকদের দোকানে 'Readers are our Patrons' কথাটা লটকে রাখতে হয়। বইপ্রসঙ্গে কথাটা স্ববিরোধী হয়ে যায় না কি? লেখকদের দিক থেকেও প্রশ্নটা অমীমাংসিত থেকে যায়। বাস্তবিকই, পেট্রন তাহলে কারা? প্রকাশকরা, না পাঠকরা?

প্রকাশকরা বই কিনলেন লেখকদের কাছ থেকে, কিন্তু পাঠকরা সেই বই তেমন কিনলেন না। নীট ফলাফল কি হল? পরে প্রকাশকও আর সেই লেখকের বই সহজে কিনতে চাইবেন না। তাহলে লেখকদের পোষকতা কে করছেন? পাঠক, না প্রকাশক? নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত—পাঠক। পাঠকই তাহলে লেখকের পেট্রন—নয় কি? কিন্তু আরও একটু প্রশ্ন আছে। লেখক ভাল, বইও ভাল লেখেন, পাঠকরাও তাঁর বই কিনতে ও পড়তে চান। যে-কোনো কারণেই হোক্, প্রকাশকরা হয়ত তাঁর বই কিনে ছাপতে চান না। একাধিক কারণে অনেক লেখকের এরকম অবস্থাসঙ্কট দেখা দিতে পারে। তাহলে প্রকাশকরাই কি লেখকদের একমাত্র বা অন্যতম পোষক হচ্ছেন না? সমস্যাটা জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জটিলতার আরও একটু বাকি আছে। এখনও সব বলা হয় নি। প্রকাশক বই ছাপলেন লেখকের, সমালোচকরা তার বিরূপ সমালোচনা করলেন, অথবা তার উল্লেখই করলেন না। পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়ে সে-বই কিনে পড়লেন না, অথবা অনেকে হয়ত জানতেও পারলেন না। লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই এলিট্-ক্রিটিক্‌গোষ্ঠী নাকচ করে দিলেন। বর্তমান সমাজে এ-সমস্যা উপেক্ষণীয় নয়। এলিট্-ক্রিটিক্‌গোষ্ঠীর উপর যাঁদের (লেখক ও প্রকাশক) ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব নেই

বিশেষ, তাঁরা মাঠে মারা গেলেন। একেবারে চিরকালের মতো মারা না গেলেও, দীর্ঘকালের মতো যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এলিট্-ক্রিটিক্গোষ্ঠী এইভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব থেকে অনেক প্রতিভাবান লেখককেও দীর্ঘকালের জন্য ঘায়েল করে রাখতে পারেন। বর্তমান সমাজে তো অবশ্যই পারেন। তাহলে পেট্রন কারা? এলিট্-ক্রিটিক্গোষ্ঠীই নয় কি? লেখক ও প্রকাশক উভয়েই এই কথা লিখে দেয়ালে লটকে রাখতে পারেন :

CRITICS ARE OUR PATRONS

তাহলে সমস্যাটা শেষ পর্যন্ত খুবই জটিল হয়ে যাচ্ছে না কি? পেট্রন কারা? প্রকাশকরা? পাঠকরা? না, সমালোচক-সমঝদাররা? বইয়ের বাজারে এই তিনটি বাণী লট্কানো থাকতে পারে

Publishers are our Patrons (লেখকের ঘরে)।

Readers are our Patrons (প্রকাশকের দোকানে)।

Critics are our Patrons (লেখক ও প্রকাশক উভয়ের ঘরে)।

প্রশ্ন হল—কোনটি সত্য? সত্য হলে কতটা সত্য, আর কতটা মিথ্যা? সত্য মিথ্যা যাই হোক্—যুগে-যুগে এইটাই সত্য ছিল না? তাই বিচার্য। এই প্রশ্নের উপরেই নির্ভর করছে—'কাস্টমার কারা'—তার উত্তর। লেখক-পাঠক-প্রকাশক প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অতীতের অনেকদিনের ইতিহাসের জীর্ণ পাতা ধরে টান দিতে হয়। চমকপ্রদ ইতিহাস।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

> the history of literature is in large part the history of the beneficence of individual princes and aristocrats...In the Middle Ages much of the principal art kept entirely within the general outlook of the bread giver....The world is seen through the spectacles of the feudal lord. . —Schucking. *

চমকপ্রদ ইতিহাস এই পেট্রন প্রকাশক ও পাঠকের। সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সমাজের একদিকে লেখক, অন্যদিকে তাঁর পেট্রন, প্রকাশক ও

পাঠক—এই হল সাহিত্যের একটা অন্যতম প্রধান দিক। সাহিত্যের ভাবধারা, সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা ইত্যাদি নিয়ে যে সাহিত্যের ইতিহাস, তার সঙ্গে লেখক ও পেট্রন-পাঠক-প্রকাশকের এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যুগে-যুগে পেট্রনের মর্জি অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহ্ পেট্রনরা যখন আধুনিকযুগের প্রকাশক-পেট্রনে পরিণত হয়েছেন, তখন প্রকাশকরাও নানাভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বর্তমানে প্রকাশক-পেট্রনের যুগ থেকে আমরা ধীরে ধীরে পাঠক-পেট্রনদের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছি এবং সাহিত্যের ধারারও যুগোপযোগী পরিবর্তন হচ্ছে। পেট্রনদের মর্জি, প্রকাশকের রুচি থেকে আমরা পাঠকের দাবির যুগে পৌচেছি। সাহিত্যের ইতিহাসের এও একটা দিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্বসাহিত্যের যেমন, আমাদের বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি।

শুশ্‌কিং বলেছেন যে, অতীত যুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত রাজা-রাজড়া ও অভিজাত 'অ্যারিস্তোক্রাটদের' কৃপা ও পোষকতার ইতিহাস।[২] রুটি যোগাতেন যিনি, রুচিরও কর্তা ছিলেন তিনি—সাহিত্যের রুচি, শিক্ষার রুচি, শিল্পকলার রুচি। সমাজ বলতে তাঁদেরই বোঝাত, রাজা-বাদশাহদের, সামন্ত-প্রভুদের, জমিদার-জায়গীর-দারদের, আমীর-অমাত্যদের সমাজ। সাহিত্যিকরা ছুনিয়াটাকে দেখতেন বাদশাহী চশমার ভিতর দিয়ে। সাধারণ মানুষ সিলুয়েট মূর্তির মতো দিগন্তরেখায় ভেসে উঠত উদাসীন ও নিষ্ঠুর মধ্যযুগের আকাশের তলায়। কোনো মমতাবোধ ছিল না মানুষের প্রতি বা জীবনের প্রতি। সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার মতো সাহিত্যও ছিল দরবারী সাহিত্য, প্রধানত দরবারী মেজাজ ও রুচি পরিতৃপ্তির জন্য।

ঐতিহ্য সহজে মরে না, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, মানুষের অজ্ঞাতসারে। মানুষের মতো সমাজেরও একটা অবচেতন সত্তা আছে। সেই অবচেতন সত্তার আলো-অন্ধকারে অতীতের সব মৃত অভ্যাস ও আচার উঁকি-ঝুঁকি মারে, নিয়মিত হানা দেয় গোরস্থানের প্রেতাত্মাদের মতো। দীর্ঘকাল যে আমরা, সাহিত্যিকরা ও শিল্পীরা, রাজদরবারের বদান্যতার ছায়াতলে মানুষ হয়েছি, তা আজও আমরা ভুলতে পারিনি। টিউটন যুগের স্থতরা (Court singer) আজও 'লরিয়েট্ কবি'র মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। রাজকীয় সম্মান, পদবী ও পুরস্কারে আজও যে-সব সাহিত্যিক ও শিল্পীকে ভূষিত করা হয়, তাঁরা তাঁদের রচিত সাহিত্যে-শিল্পে প্রজার চেয়ে রাজার রুচির খোরাক যোগান বেশি। তর্ক করে একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

২ L. L. Schucking : *The Sociology of Literary Taste.* London, 1945, Ch. 2

টিউটন যুগের দরবারী গীতকারদের 'স্কপ' (Scop) বলা হত। স্কপরা রাজা-রাজড়াদের গুণগান করতেন, কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করতেন আবৃত্তি করে। আমাদের দেশের এই কবি-গায়কদের 'সূত' বলত। বাহ্যত তাঁরা আইরিশ 'ফাইল' (File) ও টিউটন 'স্কপদের' মতো ছিলেন। মনেহয় যেন ওডেসিউসের ফিমিওসের মতো, আলকিনুসের কোর্টের ডিমোডোকোসের মতো, তাঁদের সঙ্গে পেট্রনদের সম্পর্ক ছিল। আগামেমনন একবার তাঁর রানীকে পর্যন্ত কোর্ট-গায়কের অভিভাবকত্বে রেখে গিয়েছিলেন এবং ডিমোডোকোসকে একস্থানে 'লর্ড' পর্যন্ত বলা হয়েছে। টিউটন স্কপরাও রাজার কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন এবং পেট্রনরা তাঁদের একেবারে দাসানুদাস মনে করতেন না। ভারতীয় সূতরাও বৃত্তি পেতেন, রাজদরবারে সম্মানও পেতেন, কিন্তু তবু তাঁদের পদমর্যাদা অতটা উন্নত ছিল কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সিদ্ধান্ত এ-সম্বন্ধে বলেছেন৩

> The Indian Suta, as we find him, is a much humbler individual. Whatever he might originally have been, we see him reduced to the position of an underling, one who is no better than a professional flatterer or clown.

ভারতীয় সূতরা অনেকটা পেশাদার স্তাবক ও ক্লাউনের মতো ছিলেন। ইয়োরোপীয় সূতরা যে তা ছিলেন না তা নয়। তাঁরাও তাই ছিলেন, তবে স্বতন্ত্র পরিবেশে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ত অপেক্ষাকৃত কিছু উন্নত ছিল। সাধারণত বীরগাথা ও কীর্তিকাহিনী সূতরা গাইতেন। ঋগ্বেদেও এরকম কাহিনী আছে। ত্রিৎসু রাজা সুদাসের দশজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করার কাহিনী আছে (ঋগ্বেদ, সপ্তম : ১৮), দিবোদাস কর্তৃক সম্বরের পরাজয়ের কথা আছে (প্রথম : ১১২, ১১৬, ১১৯ ইত্যাদি)। এগুলিকে বীরগাথা বলা যায়। সূতরাই মুখে-মুখে গাইতেন নিশ্চয়। শতপথব্রাহ্মণে আরও ভালভাবে আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের এক বর্ণনা-প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণরা গান করবেন দিনে, রাজন্যরা রাতে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ত্রয়োদশ : ১, ৫, ৬), ব্রাহ্মণ গায়করা দানধ্যানের গুণগান করবেন, রাজন্যরা যুদ্ধবিগ্রহ ও জয়ের গান করবেন। রাজা ও পুরোহিত যখন যজ্ঞাসনে বসবেন তখন অধ্বর্যু আহ্বান করবেন হোতাকে আবৃত্তি করতে। সূতদের জাতি ও মর্যাদার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে শতপথব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ সূত ও ক্ষত্রিয় সূতের কর্তব্যও

৩ N. K. Siddhanta : *The Heroic Age of India.* London, 1929, p 65

পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সূত দানধ্যানের ফিরিস্তি দিয়ে দাতার মহিমা কীর্তন করবেন, আর ক্ষত্রিয় সূত বীরগাথা গেয়ে বীরের গুণগান করবেন। প্রত্যেকে নিজের পেশার গুণকীর্তন করতেন, পরিষ্কার বোঝা যায়। বৈদিক যুগের প্রথম পর্বের সামাজিক অবস্থায় তাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল, সূতদের স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণী তখনও গড়ে ওঠে নি। ভারতের আদি কবিরা তখনও রাজদরবারের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠেন নি। ব্রাহ্মণ সূতদের দানমাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যে রাজন্যদের স্তাবকতা কতটা থাকত তা অবশ্য বলা যায় না। তবে রাজন্যরা নিজেরাই যখন নিজেদের বীরত্বের কাহিনী আবৃত্তি করতেন, তখন কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার তাঁদের প্রয়োজন হত না। কিন্তু ক্ষত্রিয় মাত্রই রাজা ছিলেন না, একথা মনে রাখা উচিত। সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা বীরগাথা গাইতেন মানে রাজন্যরাই যে গাইতেন, তা নাও হতে পারে।

মহাভারতের যুগে সূত ও মাগধদের পেশাদার স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। পেশা ও বৃত্তিভেদে সামাজিক জাতিবিন্যাস তখন ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তানই সূত বলে পরিচিত হবে এবং তার পেশা হবে, রাজারাজড়া ও মহাপুরুষদের কীর্তিগাথা গান করা। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের মিলনে মাগধের জন্ম এবং মাগধের কর্তব্য হল, উচ্চকণ্ঠে স্তুতিগান গাওয়া। সূত ও মাগধের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে মহাভারতে বলা হয়েছে যে পৃথু রাজার দু'জন স্তুতিগায়ক ছিলেন—একজন সূত, অন্যজন মাগধ। পৃথু তাঁদের প্রচুর জায়গা-জমি বৃত্তি দিয়েছিলেন। সূতদের দিয়েছিলেন সমুদ্রতীরবর্তী স্থান, মাগধদের দিয়েছিলেন মগধ দেশ। একথা পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে হয়। সংযোজন হলেও, স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে স্তুতিগায়কদের যে বিকাশ হয়েছিল মহাভারতের যুগে, তার আভাষ পাওয়া যায় এর মধ্যে। সূতরা সকলেই যে রাজবৃত্তি পেতেন তা নয়, রাজকবি ও রাজসূতরা পেতেন। ভোরবেলা রাজকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে স্তুতিগান গেয়ে যাঁরা সেকালের রাজা-মহারাজাদের রাজকীয় ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন (পাখির গানে রাজাদের ঘুম ভাঙত না, প্রজাদের ঘুম ভাঙত), তাঁরা যে ভাতা বা বৃত্তি পেতেন না, তা নয়। পেতেন এবং কোনো-কোনো ভাগ্যবান রাজকবি যথেষ্ট পরিমাণেই পেতেন। কিন্তু সূত বা পেশাদার কবি ও স্তুতিগায়ক মাত্রই যে পেতেন, তা নয়। ক'জন কবি ও গায়ককে রাজারা পোষণ করতেন? রাজারা ছাড়াও অমাত্যরা কবি পুষতেন, জমিদার-জায়গীরদাররাও সভাকবি রাখতেন। এইভাবে যাঁদের পেট্রন ছিল, পেট্রনভেদে তাঁদের নিজেদের মধ্যেও স্তরভেদ ও মর্যাদাভেদ ছিল। সম্রাটের সভাকবি আর প্রাদেশিক শাসনকর্তার সভাকবি, অথবা স্থানীয় জমিদারের

সভাকবির বৃত্তি বা মর্যাদা 'এক' ছিল না। তবু এঁরা সকলেই পেট্রন-পালিত ছিলেন, পেট্রনের দৃষ্টিতে বাইরের জগৎটাকে দেখতেন, পেট্রনের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী গাথা ও কাব্য রচনা করতেন এবং তার বদলে পেট্রনের দেওয়া বৃত্তিভোগ করে জীবন-ধারণ করতেন। গাথা ও কাব্য তখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হত না, বইয়ের দোকানে দোকানে বিক্রিও হত না। প্রকাশকরা তখন ছিলেন না, লেখক বা কবিরা তখন 'রয়াল্‌টি'ও পেতেন না। 'রয়াল' যুগে 'রয়াল্‌টি' বলে কিছু ছিল না, ছিল একমাত্র 'লয়াল্‌টি'।

সূত, স্তুতিগায়ক বা কবি মাত্রই রাজসভায় স্থান পেতেন না। রাজসভায় স্থান পাওয়াও সহজ ছিল না। তার জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করার প্রয়োজন হত। যাঁরা স্থান পেতেন তাঁরা ভাগ্যবান, তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। যাঁরা স্থান পেতেন না, তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তাঁরা কি করতেন? বাইরের লোকসমাজে তাঁরা ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে-গ্রামে উৎসবপার্বণে, মেলায়-মেলায় তাঁরা কবিগান করে বেড়াতেন। কিসের গান? ঐ রাজসভার কবিদের রচিত গান। নিজেদের রচিত গান হলেও, তার মধ্যেও রাজস্তুতি ছাড়া অন্য কিছু থাকার উপায় ছিল না। ভাঁড়ের মতো একটু-আধটু সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার, তামাসা-রসিকতা করার হয়ত সুযোগ তাঁরা কিছু পেতেন এবং তার মধ্যে সমাজের যৎসামান্য বাস্তবরূপও প্রতিফলিত হত। রাজসভার কবিদের কাব্যেও যে হত না, তা নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রধানত কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হলেও, তার মধ্যে তখনকার সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধ্যান-ধর্মাদির পরিচয়ও কম নেই। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র। বাইরের লোকসমাজে যাঁরা কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন, তাঁরাও রাজসভার পরিবেশ থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। রাজস্তুতি প্রাণের দায়ে তাঁদেরও করতে হত, যদিও রাজবৃত্তি হয়ত তাঁরা পেতেন না সকলে। কারণ যে-রাজার বা যে-জমিদারের রাজ্যে তাঁরা বাস করতেন এবং যে-যুগে বাস করতেন তাতে স্বাধীন মনোভাবের বিকাশ হতে পারে না। বিকাশের সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না তখন। স্বাধীন লেখক বা স্বাধীন কবি তখন কল্পনাতীত ব্যক্তি ছিলেন। কথায়-কথায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে যখন রাজদণ্ড দেওয়া হত, তখন গ্রাম্য কবির স্বাতন্ত্র্য জাহির করার কোনো স্পর্ধা থাকা সম্ভবপর নয়। পেট্রনের যুগের এই হল প্রকৃত রূপ। সেইজন্যই সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং বলেছেন যে, 'The world is seen through the spectacles of the feudal lord; there is no feeling for the little man and no respect for physical labour.'

ফিউডাল লর্ডরাই সেদিন পর্যন্ত লেখক-কবি-শিল্পীদের প্রধান পেট্রন ছিলেন এবং তাই ফিউডালযুগের সাহিত্যে ও শিল্পকলায় তাঁদেরই রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ পড়েছে বেশি। বাংলা দেশে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণের সভাকবিদের যুগ সেদিন শেষ হয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা তার জের টেনে চলেছি। প্রকাশকরা আমাদের পেট্রনরূপে তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। প্রকাশকযুগের আগের যুগ আসল পেট্রনদের যুগ, অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার যুগ, রাজসভার যুগ ও সভাকবিদের যুগ। বাংলা দেশের সেই পেট্রনযুগের কথা কিছু না বললে, প্রকাশকযুগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়।

তৃতীয় প্রস্তাব

সাহিত্যের ইতিহাসকে তাহলে আমরা তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি – (ক) পেট্রনের যুগ, (খ) প্রকাশকের যুগ এবং (গ) পাঠকের যুগ। প্রাচীন ও মধ্যযুগ হল পেট্রনের যুগ। আধুনিকযুগ হল প্রকাশক ও পাঠকের যুগ। প্রকাশকের যুগ থেকে আধুনিকযুগে আমরা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হচ্ছি। সামন্ততন্ত্রের যুগ থেকে আধুনিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে উত্তরণকালে প্রকাশকব্যবসায়ীরা একটা যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে পেট্রনযুগের অচলায়তন থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছেন প্রকাশকরা সর্বপ্রথম। সেকথা পরে বলব। তার আগে বাংলা সাহিত্যের পেট্রনযুগের সামান্য একটু পরিচয় দিই।

পালযুগ থেকে আরম্ভ করছি। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য রচনা করেছিলেন। পালবংশের রাজা রামপালের কীর্তিকথাই রামচরিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কবি সাধারণভাবে গুণগান করেন নি। রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা এবং গৌড়পতি রামপালের চরিতকথা যে একই, এই কথাটুকু বলবার জন্য তিনি শ্লেষ অলঙ্কারের সাহায্যে একটি দ্ব্যর্থবাচক দুর্বোধ্য কাব্য রচনা করেছিলেন। কথাবস্তুর দিক দিয়ে রামচরিততুল্য কাব্য ভারতীয় সাহিত্যে আরও অনেক আছে—যেমন দণ্ডীর দশকুমারচরিত, বাণের হর্ষচরিত, পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি। সবই পেট্রনযুগের অপূর্ব নিদর্শন এবং পেট্রনের মহিমাকীর্তন। কিন্তু বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বোধহয় সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। কেবল মহিমাকীর্তনে তিনি খুশি হন নি,

রঘুপতি রামের সঙ্গে পালরাজা রামপালের তুলনা করতে গিয়ে তিনি এক কঠিন আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোকের দু'রকম অর্থ হয়—একটিতে রামায়ণ-কথা, দ্বিতীয়টিতে রামপাল-কথা বোঝা যায়। তা ছাড়া পেট্রনের প্রশস্তির তো তুলনাই হয় না। কবিপ্রশস্তির শেষে রামপালপ্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দী বলছেন[৪]

যোয়ং গদিতো নাগস্কন্ধক্ষিতিভৃন্ময়া বিদিতগোসারঃ।
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌমি॥

এই হস্তিস্কন্ধ ও জ্ঞাতপৃথ্বীসার যে নরপতি রামপাল আমার দ্বারা বর্ণিত হল, বিষ্ণুর ন্যায় পরম বিলাসী সেই বিষ্ণুনিবাসভূত রাজাকে কেমন করে আমি স্তব করব? রাজা রামপালের উপর অজস্র স্তুতিবর্ষণ করেও কবি শেষ পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে বলছেন, কথমিব স্তৌমি। পেট্রনযুগের এমনিই মাহাত্ম্য। রামপাল-পুত্র মদনপালকে কবি বলছেন

শুচিরুচিরবিক্রমকলাময়মিদমুদিতং গবামধিপ তে রত্নম্।
শব্দগুণভূষণাদ্ভুতমুত্তংসয়তে সতে গিরীশায় নমঃ॥

অর্থ হল: হে ভূমিশ্বর (মদনপাল), পণ্ডিত ও বাগবিশারদ, তোমাকে নমস্কার করি; কারণ তুমি শুদ্ধ, মনোজ্ঞ ও বক্রিমকলাবিশিষ্ট এবং শব্দগুণ ও অলঙ্কারে অদ্ভুত আমার এই প্রশংসিত রত্ন (কাব্য) তুমি কর্ণভূষণ করেছ। পেট্রনের মহিমা কীর্তনপ্রসঙ্গে কবি আত্মমহিমা প্রচারে মশগুল। পেট্রনযুগের এও এক বৈশিষ্ট্য।

সেনযুগের কথাও তাই। অনেকেই জানেন, লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব মিশ্র, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। প্রধানত রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁরা তাঁদের কাব্যপ্রতিভা উৎসর্গ করেছিলেন বলা যায়। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কালিদাস। তিনি গীতগোবিন্দের সুললিত পদ গাইতেন, আর পদ্মাবতী নাকি তালে-তালে নাচতেন। এই হল জনশ্রুতি। অর্বাচীন নয় জনশ্রুতি। তার কারণ, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রামসরস্বতী তাঁর জয়দেব কাব্যে এই জনশ্রুতিকে স্বীকার করেছেন

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে।
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে॥
কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি।
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী॥

৪ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত ও অনূদিত: রামচরিত, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ ১৪২-১৫২

জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাইছেন, পদ্মাবতী নাচছেন, আর পেট্রন লক্ষ্মণসেন শুনছেন ও দেখছেন। দৃশ্যটি কল্পনা করতেও তন্দ্রা আসে। মদিরার মতো গীতগোবিন্দের ভাব এবং মৃদঙ্গ ও নূপুরশিঞ্জনের মতো তার ভাষা ও ছন্দ। পেট্রনকে পটাবার অমোঘ অস্ত্র এর চেয়ে আর কি হতে পারে? তার উপর, রাজসভায় পেট্রনকে সম্ভাষণ করার ভাষা কি?

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সঙ্কল্প কল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালঙ্কার কারার্পিত
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্।

অর্থাৎ পরম পেট্রন রাজা লক্ষ্মণসেনকে সম্ভাষণ করে কবি বলছেন: 'হে লক্ষ্মীর কেলিনায়ক, হে জঙ্গমহরি, হে যাচকের কল্পদ্রুম, হে মুক্তিসাধকের সহায়ক, হে যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম, হে বঙ্গের প্রিয়, হে গৌড়েন্দ্র, হে রাজপ্রতিনিধি-সামন্তমণ্ডিত সভামণ্ডপের অলঙ্কার, হে বন্দীকৃত অরিরাজমণ্ডল, হে সজ্জনের পালক, তোমাকে যে দর্শন করলাম, তাতেই আমরা তুষ্ট।' ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, কবি জয়দেব এখানে যতগুলি 'বিশেষণ' প্রয়োগ করেছেন তার ক'টির যোগ্যতা লক্ষ্মণসেনের ছিল। 'লক্ষ্মীর কেলিনায়ক' তিনি ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু 'যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম' ছিলেন কি? মুসলমানরা যখন রাজ্যের সীমান্তে হানা দিচ্ছে, বাংলার সৌভাগ্যরবি যখন ডুবুডুবু, তখন যিনি দৈবাচার্য ডেকে ভাগ্যগণনা করাচ্ছিলেন, তিনি যে কত বড় বীর ছিলেন, তা না বলাই ভাল। যাই হোক, ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে লাভ নেই। জয়দেবের মতো কবিও যে কিভাবে রাজসভায় উপস্থিত হতেন, পূর্বোক্ত সম্ভাষণ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। পেট্রনযুগের এই হল বিশেষত্ব।

লক্ষ্মণসেন ধোয়ীকে 'কবি-ক্ষ্মাপিত' বা কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ও প্রতীকরূপে দিয়েছিলেন স্বর্ণাভরণমণ্ডিত হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত দুই চামর। উমাপতি ধর বলে গেছেন যে, চন্দ্রচূড়চরিত-কাব্য রচনার জন্য রাজা চাণক্যচন্দ্র অন্তরঙ্গ কবিকে নানারকম রত্নালঙ্কার, বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং একশত গ্রাম দান করেছিলেন। বাংলার পাঠান-রাজারাও অনেকে এই প্রথা অনুসরণ করতেন। সেকথা পরে বলব। রাজসভায় কবিদের ইহজীবনের চরম আদর্শ কি ছিল, সেকথা স্বয়ং ধোয়ী চমৎকারভাবে তাঁর আত্মকথায় বলেছেন

গোষ্ঠীবন্ধঃ সরসকবিভির্ভিবাচি বৈদর্ভরীতিম্
বাসো গঙ্গাপরিসরভুবি স্নিগ্ধভোগ্যা বিভূতিঃ।

সংৎসু স্নেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে
ভক্তির্লক্ষ্মীপতিচরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি ॥

অর্থাৎ ধোয়ী বলছেন : 'সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ, বৈদর্ভী রীতিতে কাব্যরচনা, গঙ্গাতীরভূমিতে বাস, ধনৈশ্বর্য আত্মীয়স্বজনের ভোগে লাগানো, সজ্জনের সঙ্গে মৈত্রী, রাজসভায় সভাকবির সম্মান এবং লক্ষ্মীপতির চরণকমলে ভক্তি যেন জন্মান্তরেও লব্ধ হয়।'[৫]

ধোয়ীর এই কামনা-বাসনার তালিকাটি আধুনিক কবিরাও একবার স্মরণ করতে পারেন, চরিতার্থ হোক্-না-হোক্। 'সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য' সকলেই চান। কিন্তু সত্যিই চান কি? শব্দমাধুর্য ও বাকচাতুর্য হল বৈদর্ভী রীতির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বৈদর্ভী রীতিতে কাব্যরচনা করতে চাওয়াও ধোয়ীর পক্ষে আশ্চর্য নয়। পেট্রন রাজার কথা মনে থাকলে, বৈদর্ভী রীতিতে রচনার কথাও ভোলা যায় না। কাব্যরীতির উপর, কাব্যের আঙ্গিকের উপর পর্যন্ত পেট্রনের রীতিমত প্রভাব দেখা যায়, শুধু কাব্যবস্তুর উপর নয়। 'গঙ্গাতীরভূমিতে বাস' ধোয়ীর মতো সভাকবিদের বাসনা হওয়াও বিচিত্র নয়। পেট্রনযুগের কবিরা রাজানুগ্রহে অনেকেই শৈলশিখরে বা গঙ্গাতীরে বাস করার সুযোগ পেতেন। প্রকাশক ও পাঠকের যুগে এ-বাসনা চরিতার্থ হওয়া সহজে সম্ভবপর নয়। 'ধনৈশ্বর্য আত্মীয়স্বজনদের ভোগে লাগানোর' সদিচ্ছাও সেকালের সভাকবিদের থাকা সম্ভবপর। প্রকাশক ও পাঠকের যুগে 'ধনৈশ্বর্য' কবিদের ভাগ্যে জোটাও সহজ নয় এবং জুটলেও আত্মীয়স্বজনের ভোগে লাগানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ পেট্রনের যুগের আত্মীয়স্বজনও এখন আর নেই। অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, প্রকাশক ও পাঠকের যুগে ধনৈশ্বর্য বরং বেশি করে আত্মীয়স্বজনেরই ভোগে লাগে, কবি বা লেখকের ভোগে লাগুক বা না লাগুক। এ-যুগের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকের অদৃষ্টে তাই হয়। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হয়, রঙ্গমঞ্চ ছায়াচিত্র থেকে সাধারণ পাঠক পর্যন্ত তাঁর সমাদর ও চাহিদা বাড়ে, এবং তার ফলে প্রচুর অর্থ-সমাগম হয়। প্রকাশক ও আত্মীয়-স্বজনরা সেই ঐশ্বর্য ভোগ করেন।* সুতরাং ধোয়ীর একথাটি এ-যুগেই বেশি প্রযোজ্য বলে মনে হয়। 'সজ্জনের সঙ্গে মৈত্রী' সব যুগে সকলেই চান, যদি অবশ্য সজ্জন ব্যক্তি সহজলভ্য হয় সমাজে।

৫ শ্রীসুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ ১৭-২১

* যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাশ যদি ইহজগৎ থেকে বিদায় না নিতেন তাহলে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' বা 'অ্যাকাডেমি পুরস্কার' কোনটাই তাঁরা এত সহজে পেতেন না। তাঁদের দুঃখকষ্টজর্জর জীবনে এ-পুরস্কার কোনো উপকারেই লাগে নি। আত্মীয়স্বজনেরা হয়ত কিছু উপকৃত হয়েছেন।

'রাজসভায় সভাকবির সম্মান' পাওয়া পেট্রনযুগের কবির জীবনের চরম কাম্য ছিল। ধোয়ী সেকথা পরিষ্কার করে বলেছেন। শুধু ইহজীবনে নয়, তিনি বলেছেন—জন্মান্তরেও তাঁর সেই কামনা যেন চরিতার্থ হয়। আধুনিক প্রকাশক ও পাঠকের যুগে, বিশেষ করে পাঠকের যুগে, এই কামনার কথা বাইরে প্রকাশ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু তাই বা নয় কেন? রাজা ও রাজ্যের উপর সেটা নির্ভর করে এবং সেই রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে পাঠকগোষ্ঠীর—তথা জনসাধারণের ধারণার উপর। রাজা ও রাজ্যের প্রতি পাঠকগোষ্ঠী, অর্থাৎ জনসাধারণ যদি কোনো কারণে বিমুখ হন এবং কোনো কবি বা সাহিত্যিক যদি সেই রাজ্যের সভাকবি বা রাজকবির সম্মানলাভের বাসনা প্রকাশ করেন, তাহলে তিনি খেতাবই পাবেন, খ্যাতি নয়। কিন্তু রাজা ও রাজ্যের প্রতি কোনো কারণে জনসাধারণের যদি সহানুভূতি থাকে, তাহলে কবি-সাহিত্যিকরা প্রাণপণে সেখানে রাজকবির সম্মান পাবার চেষ্টা করেন। আজও যে করেন, তার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'নোবেল প্রাইজ' থেকে 'স্ট্যালিন প্রাইজ' পর্যন্ত তার উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং ধোয়ীর কথার তাৎপর্য বদলেছে মাত্র, কথাটা বদলায়নি। অবশ্য তাৎপর্য বদলানোও কম কথা নয়। পেট্রন-রাজার যুগ আর পেট্রন-প্রকাশক ও পেট্রন-পাঠকের যুগের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। পেট্রন-রাজার যুগে সভাকবি হওয়া আর প্রকাশক-পাঠক-রাজার যুগে সভাকবির সম্মান পাওয়া এক-কথা নয়। পার্থক্য অনেক।

চতুর্থ প্রস্তাব

কীর্ত্তির্লব্ধা সদসি বিদুষাং লালিতাঃ ক্ষৌণীপালা
বাক্‌সন্দর্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যন্দিনো নির্মিতাশ্চ।
তীরে সম্প্রত্যমরসরিতঃ কাপি শৈলোপকণ্ঠে
ব্রহ্মাভ্যাসপ্রবণমনসা নেতুমীহে দিনানি। —ধোয়ী

'পবনদূত' কাব্যের শেষ শ্লোকে ধোয়ী তাঁর শেষ জীবনের কামনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—'বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি, রাজার সেবা করেছি, কতিপয় অমৃত-নির্ঝর কাব্য ও কবিতা রচনা করেছি। এখন চাই ভাগীরথীতীরে কোনো শৈলোপকণ্ঠে ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ মন নিয়ে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে।'

কে না চায়? কিন্তু তার জন্য লক্ষ্মণসেনের যুগে, অথবা সেকালের কোনো

রাজা বাদশাহের যুগে জন্মগ্রহণ করা দরকার। রাজসভার সভাকবি হয়ে রাজার সেবা করতে না পারলে তখন বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা যেত না। সেকালের সেই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আজকের প্রতিষ্ঠার পার্থক্য অনেক। বিদ্বৎসমাজ বল্‌তে যা বোঝায়, তারও রূপ আজ একেবারে বদলে গেছে। তখন কয়েকজন আমলা-অমাত্য, পণ্ডিত-বৈদ্যদের নিয়েই বিদ্বৎসমাজ গঠিত ছিল। সুতরাং রাজসভার কবিদের পক্ষে বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। রাজসভার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে, বৃহত্তর লোকসমাজে বিদ্বজ্জনের অস্তিত্বও বিশেষ ছিল না। সুতরাং রাজার সভাকবি হওয়া, আর বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা প্রায় একই ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া, কবির আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম যে-কাব্য, সেই কাব্যের সঙ্গে লোকসমাজের যোগাযোগেরও কোনো উপায় ছিল না তখন। কবি যে-কাব্য রচনা করতেন, তা তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকত। লিপিকাররা পাণ্ডুলিপি নকল করতেন, কিন্তু তাও ধনী জমিদার ও অমাত্যদের জন্য—সাধারণের জন্য নয়। সুতরাং কাব্য বা প্রতিভার গুণে কবির প্রতিষ্ঠা হত না। তাই বলে, সেকালের সভাকবিদের যে কাব্যপ্রতিভা ছিল না, এমন কথা কেউ বলবেন না। নিশ্চয়ই ছিল এবং শক্তিশালী কবিরাই সভাকবির মর্যাদা-লাভের সুযোগ পেতেন। কিন্তু যতই প্রতিভা নিয়ে কোনো কবি জন্মান না কেন, তাঁর স্বীকৃতি নির্ভর করত রাজা ও তাঁর সভাসদদের মর্জি ও রুচির উপর। রাজস্বীকৃতি না পেলে কোনো প্রতিভাই প্রতিভা বলে গণ্য হত না, গণ্য হবার মতো সুযোগও ছিল না। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী যে কতিপয় অমৃতস্যন্দী কাব্য ও কবিতা রচনা করেছিলেন, তার রসাস্বাদন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল ক'জনের? সংস্কৃত ভাষায় বৈদর্ভীরীতিতে কাব্যরচনা করতেন ধোয়ী। তখন তো দূরের কথা, এখনই বা ক'জন তার অমৃতরস আস্বাদন করতে পারেন? রসাস্বাদন করতেন সভাপণ্ডিতরা—আর তাঁদের ইশারায় রাজা ঘাড় নাড়তেন এবং তাঁর পারিষদরাও 'আহা মরি' করতেন। এই ছিল ধোয়ীর যুগ, উমাপতি ধর ও জয়দেব মিশ্রের যুগ। বাংলা সাহিত্যের পেট্রনযুগ।

হিন্দুযুগের পর মুসলমানযুগেও এই রাজা-পেট্রনদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। কারণ মুসলমানযুগে শুধু রাজসিংহাসন বদল হয়েছিল, রাজ্যের বা সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি বিশেষ। অর্থাৎ সমাজের গড়ন বদলায়নি এবং এমন কোনো শক্তি বা আদর্শ সমাজজীবনে সঞ্চারিত হয় নি, যার ফলে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। ব্রিটিশযুগে নতুন শক্তি ও নতুন আদর্শের প্রভাবে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছিল সমাজে। তাও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পেট্রনযুগের প্রভাব দীর্ঘকাল অক্ষুন্ন ছিল ব্রিটিশযুগেও। সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে

অনেক সময় লেগেছে। তারপর—প্রকাশকের যুগ। সেকথা পরে বলছি। তার আগে পেট্রনযুগ-প্রসঙ্গে মুসলমানযুগ সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাসে পেট্রনের মাহাত্ম্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা তা না হলে সম্ভব নয়।

যদিও লক্ষ্মণসেনের সভাকবিরা তাঁর বীরত্বের খুব প্রশস্তি গেয়েছেন, যদিও কবি শরণ বলেছেন

ভ্রূক্ষেপাদ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান্।

যিনি ভ্রূক্ষেপমাত্রে গৌড়লক্ষ্মীকে জয় করেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে কলিঙ্গদেশ বিজয় করেছেন এবং 'স্বেচ্ছা ম্লেচ্ছান্ বিনাশং'—স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছদের বিনাশ করেছেন! যদিও উমাপতি ধর বলেছেন

সাধু ম্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ত্ততে—

'ম্লেচ্ছরাজ, সাধু সাধু! আপনার মাতাই যথার্থ বীরপ্রসবিনী। নীচবংশজাত হলেও আপনার মতো লোকের জন্য এখন পৃথিবী সুক্ষত্রিয় রয়েছে', কারণ

দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিষন্মারাঙ্কমল্লে পুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতিস্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ।

'মারাঙ্কমল্লদেব ('বীর লক্ষ্মণসেন) যখন সাক্ষাৎভাবে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করছিলেন তখন জিহ্বারূপ পত্রান্তরাল থেকে শস্ত্র, শস্ত্র—আপনার এই বাক্য ঘন ঘন নির্গত হচ্ছিল' —তাহলেও ইতিহাসে এমন কোনো নজীর নেই যাতে লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের এই নির্জলা প্রশস্তি সমর্থন করা যায়। পেট্রন-প্রশস্তি ভিন্ন পেট্রনযুগের কবি ও পণ্ডিতদের বাঁচার উপায় ছিল না। ক্ষাত্র বাহুবল যে তখন কি পরিমাণে দৈববলের উপর নির্ভরশীল ছিল, তা মন্ত্র-তুক্-তাকের সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হবার নীতি প্রচার থেকেই বোঝা যায়। গণৎকাররা ও দৈবাচার্যরা যখন রণনীতি রচনা করতেন, তখন ঐভাবে লক্ষ্মণসেনের গুণগান করা এবং ক্ষাত্রবলের প্রশংসা করা পেট্রন-পালিত সভাপণ্ডিত ও সভাকবিদের দ্বারাই সম্ভবপর ছিল। তখনকার তথাকথিত রণনীতির কোনো বই থেকে বীরত্বের একটু নিদর্শন দিচ্ছি। বইয়ে বলা হয়েছে যে, যদি চারদিক থেকে শত্রুসৈন্য ঘিরে দাঁড়ায়, তাহলে শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে—

ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহঙ্গহি সাহিণেহি
মশাণেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং ফট্ স্বাহা।

—আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে

সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হলে সেই তূর্যের শব্দ শুনে 'ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্যবিজয়ঃ'। দৈবাচার্যরা যে-যুগে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ হয়ে বসেছেন, মশানের ছাই গাছের ছাল-মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে মাখিয়ে যে-যুগে 'হুং-ফট্ স্বাহা' বলে যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই যুগের রাজার বীরত্ব ও ক্ষাত্রবলের প্রশংসা করা নির্জলা পেট্রন-প্রশস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। পেট্রনযুগের এই হল অন্যতম বিশেষত্ব।

পাঠান-মোগলযুগে, মুসলমান শাসনকর্তাদের পোষকতায় বাংলা সাহিত্যের যে রীতিমত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন, আর হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়-সিংহাসন অধিকার করেন। চৈতন্যযুগ বা ষোড়শ শতাব্দীকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। 'কবিচক্রবর্তী—রাজপণ্ডিত—পণ্ডিত সার্বভৌম—কবি পণ্ডিত চূড়ামণি—মহাচার্য—রায় —মুকুটমণি' বৃহস্পতি মিশ্রের মনীষা সুলতান জালালু-দ্-দীনের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল, অনেকেই জানেন। 'গৌড়াধিপাদুপচিত প্রচুর প্রতিষ্ঠঃ'—তিনি গৌড়াধিপের কাছে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্রের পর নাম করতে হয় সনাতন ও রূপের। সকলেই জানেন, এই দুই মহাপণ্ডিত ও মহাকবিভাই ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের ডান-হাত, বাঁ-হাত। একজন ছিলেন 'দবীর-খাস' বা প্রাইভেট সেক্রেটারি, আর একজন ছিলেন 'সাকর-মল্লিক' বা চীফ্-সেক্রেটারি। এই দু'জন মহাকবি ছাড়াও হোসেন শাহের কর্মচারীদের মধ্যে আরও অনেক কবি পণ্ডিত ছিলেন, যেমন কেশব খান ছত্রী, রামচন্দ্র খাঁ, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি। হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দ্-দীন নসরৎ শাহের অনুগত ছিলেন 'কবিশেখর' উপাধিধারী দেবকীনন্দন সিংহ। নসরৎ শাহের পুত্র আলাউ-দ্-দীন ফীরুজশাহ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়েছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র ছুটি খানও বাঙালী কবিদের পেট্রন ছিলেন। মুসলমান ভূস্বামীরাও নিজের-নিজের সভায় কবি-পণ্ডিত পোষণ করতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মথুরেশের 'শব্দরত্নাবলী'তে। 'শব্দরত্নাবলী' অভিধানের বই। মথুরেশ ছিলেন সুলেমান খানের পৌত্র, ইশা খানের পুত্র মুসা খান মসনদআলির সভাপণ্ডিত। শব্দ-রত্নাবলীর উপক্রমে ও উপসংহারে মথুরেশ যেভাবে তাঁর পেট্রন মুসা খানের ও তাঁর ভাইদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, তা উদ্ধৃত করবার মতো। যেমন

যল্লক্ষ্মীর্বরবৈরিণ্যাং কুলবধূসিন্দুর বিধ্বংসিনী
যদ্বাণী ললিতা সতাং গুণবতামানন্দকল্লোলিনী।

যদ্ব্লোত্তরকল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদিপৃথ্বীভুজাং
সোহয়ং শ্রীমশনন্দ এল্লিনৃপতির্জীয়াচ চিরং ভূতলে।

'যাঁর সৌভাগ্যে প্রধান শত্রুবর্গের কুলবধূদের সিঁদুর মুছে যায়, যাঁর ললিতবাণী সৎ ও গুণবান্ লোকের হৃদয়ে আনন্দনদী বইয়ে দেয়, যাঁর দান-প্রাচুর্য কর্ণ প্রভৃতি রাজাদের (যশ) পরাজিত করেছে, এই সেই মসনদ আলি নৃপতি, পৃথিবীতে চিরজীবী হোন।'[৬] একেই বলে সভাপণ্ডিত ও সভাকবির পেট্রন-প্রশস্তি এবং পেট্রনপোষ্য সাহিত্যের এই হল মাহাত্ম্য। শুধু মসনদ আলির মহিমাকীর্তন নয়, তাঁর অনুজ মহম্মদ খান ও আবদুল্লা খানের গুণগান করতেও মথুরেশ কুণ্ঠিত হননি। মহম্মদ খান সম্বন্ধে মথুরেশ বলেছেন

শ্রীমৎখান মহম্মদস্তদনুজো মধ্যাহ্নচণ্ডদ্যুতি—
বৈরিপ্রৌঢ়িঘনান্ধকারশমনো গাম্ভীর্যধৈর্যোন্নতিঃ— ইত্যাদি।

অর্থাৎ 'তাঁর অনুজ শ্রীমহম্মদ খান হচ্ছেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রচণ্ড এবং শত্রুবর্গ-রূপ ঘনান্ধকারে শমনস্বরূপ। গাম্ভীর্যে ও ধৈর্যে তিনি উন্নত।' তারপরই মথুরেশ তাঁর অনুজ আবদুল্লা খান সম্বন্ধে বলছেন

এতাস্মাদনুজশ্চিরং বিজয়তাং বীরেন্দ্রচূড়ামণিঃ
শ্রীমৎকামসহোদরোহতিরসিকঃ খানাবদুল্লাহ্বয়ঃ।

'চিরকাল বিজয়ী হোন তাঁর অনুজ আবদুল্লা খান যিনি বীরেন্দ্র চূড়ামণি, কন্দর্পসহোদর, অতি রসিক।'

বাংলা দেশের রাজসভায় মহাভারত পাঠ অনেকদিন ধরে চলে আসছিল। রাজসভায় যাঁরা মহাভারত-পুরাণাদি পাঠ করতেন তাঁরাই 'পাঠক' নামে পরিচিত হতেন। প্রাচীন সাহিত্যে ভারত-পাচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজদরবারের পোষকতাতেই হয়েছিল। পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী, রামচন্দ্র খান, কাশীরাম সকলেই এই পেট্রন-পোষকতার কথা লিখে গেছেন। গ্রন্থারম্ভে পরমেশ্বর দাস বলেছেন[৭]

ভূপতি হোসেন শাহা হএ মহামতি
পঞ্চম গৌড়ে ত যার পরম যে খ্যাতি।
অস্ত্রেশস্ত্রে বিশারদ প্রতাপে অপার
কলিযুগে এই ভেল পৃথিবীর সার।

৬ শ্রীসুকুমার সেন: মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী পৃ ১৪-২২
শ্রীসুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৭ শ্রীসুকুমার সেন: ঐ, তৃতীয় পর্ব, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভণিতায় কবি অনেকবার পরাগল খানের ভারত-কাহিনীর প্রিয়তার কথা ও মুক্তহস্তে দানের কথা বলেছেন

লস্কর পরাগল গুণের নিধান
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান।
দানে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী
কতুহলে করাইল ভারত-পাঞ্চালী।

শ্রীকর নন্দীও তাঁর পেট্রন নসরৎ খাঁ ওরফে ছুটি খাঁ সম্বন্ধে লিখেছেন

নৃপতি হোসেন শাহা হয় ক্ষিতিপতি
সাম-দান-দণ্ড-ভেদে পালে বসুমতী।
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া কৈল সন্ধিধান।

কাব্যরচনার ইতিহাস এই

অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়
সভা খণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপিয়া
... ...
শ্রীকর নন্দী এ কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

রাজসভার পোষকতায় সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি যে কিভাবে হয়েছিল, এগুলি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পেট্রনের পোষকতা ছাড়া সাহিত্যচর্চা সম্ভব হত না এবং পেট্রনের অনুগ্রহজীবী হওয়া ছাড়া কবি-পণ্ডিতদের উপায়ও ছিল না।

পঞ্চম প্রস্তাব

বাংলা দেশের প্রান্তীয় রাজসভাতেও পৌরাণিক ও রোমান্টিক কাব্যের চর্চা অব্যাহত-গতিতে চলত। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর বীর ভাই শুক্লধ্বজ বা 'চিলা রায়' কবি-পণ্ডিতদের বিশেষভাবে সমাদর করতেন। সাহিত্যের পেট্রনযুগে কোচ-বিহারের রাজাদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুক্লধ্বজের আগ্রহে ও উৎসাহে কবি অনিরুদ্ধ মহাভারত-পাঁচালী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অনিরুদ্ধের উপাধি ছিল 'রামসরস্বতী'। তাঁর অগ্রজের নাম ছিল (বা উপাধি) 'কবিচন্দ্র'।

অনিরুদ্ধ শুক্লধ্বজের সভায় পুরাণপাঠক ছিলেন, কবিচন্দ্র সম্ভবত নরনারায়ণের সভাকবি বা পাঠক ছিলেন। নরনারায়ণের বিদ্বৎপ্রীতি বর্ণনা করে রামসরস্বতী লিখেছেন[৮]

জয় নরনারায়ণ নৃপতিপ্রধান
যাহার সমান রাজা নাহিক যে আন।
ধর্মনীতি পুরাণ ভারত শাস্ত্র যত
অহোরাত্রি বিচারন্ত করিয়ে সতত।

নরনারায়ণের অনুজ শুক্লধ্বজ সম্বন্ধে রামসরস্বতী বলেছেন

শুক্লধ্বজ অনুজ যাহার যুবরাজ
পরমগহন অতি অদ্ভুত-কাজ।
তেঁহো মোক বুলিলন্ত মহাহর্ষ মনে
ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।
আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত
নিয়োক আপন গৃহে দিলোহোঁ সমস্ত।
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই
পঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাঁই।
খাইবার সকল দ্রব্য দিলন্ত অপার
দাস-দাসী দিলা নাম করাইলা আমার।
এতেক তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত
কৃষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃদয়ত।
বিরচিলো পদ ইতো অতি অনুপাম—

শুক্লধ্বজ মহাহর্ষমনে রামসরস্বতীকে বলেছিলেন—'ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।' শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বইপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, খাদ্যদ্রব্য ও দাসদাসী দিয়েছিলেন কবিকে। তবেই কাব্যরচনা করা সম্ভব হয়েছিল। পেট্রনযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সভাকবি প্রথমে রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য করে, পরে কৃষ্ণের যুগলপদ হৃদয়ে ধারণ করেছেন। অর্থাৎ পেট্রন রাজার আদেশ আগে, তারপর দেবতা পতিভক্তি-ভালবাসা ইত্যাদি। আগে শুক্লধ্বজের আদেশ, তারপর কৃষ্ণের যুগলপদ। সর্বাগ্রে পেট্রন-বন্দনা, তারপর দেবতা-বন্দনা। পেট্রনের চেয়ে বড় দেবতা পেট্রনযুগে আর কেউ ছিলেন না। তাই সবার আগে, সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ও ছন্দে সভাকবিরা

৮ শ্রীসুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, পৃ ১৮-১৯

পেট্রন-বন্দনা করে গেছেন। রামসরস্বতীকে প্রথমে বলতে হয়েছে—'এতেক তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত'-তারপর 'কৃষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃদয়ত।' শির বড়, না হৃদয় বড়, এখানে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। বাস্তব সমাজে বিগলিত হৃদয়ের তুলনায় উন্নত শিরের মর্যাদাই যখন বেশি, তখন শিরই বড়, হৃদয় তুচ্ছ।

কামরূপ রাজ্যে বা কাঙুর কামতায় রাজসভার পোষকতায় সাহিত্যের রীতিমত চর্চা হয়েছিল একসময়। কামরূপ সাহিত্যের গোষ্ঠীপতি ছিলেন শঙ্করদেব (শঙ্করাচার্য নন)। শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য-উপশিষ্যরা এক বিচিত্র বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন। পেট্রন নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য শঙ্করদেব মল্লরাজের (মল্লভূমের রাজা নন) উদ্দেশে একাধিক 'ভটিমা' পদ রচনা করেছিলেন। যেমন*

হাসি সুভাষিত করেঁ। বহু ধীর
মল্ল-নৃপতি সম নাহি-কয় বীর।
কাশী-বারাণসী গৌড় পর্যন্তে
মল্ল-নৃপতিক সব মহিমা কহন্তে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বারাণসীর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'প্রাণাভরণ' কাব্য লিখে মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রশস্তি গেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজারা যখন পরম বৈষ্ণব হয়ে পড়েন এবং সাহিত্যচর্চার পোষকতা করতে থাকেন, তখন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে এমন কোনো কবি ছিলেন না যিনি মল্লরাজবংশের (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের) প্রশস্তি গান নি। বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যদেব নিজে সুকবি ছিলেন বলে শোনা যায়। ইনি 'সংকাব্য-রত্নাকর' নামে কাব্যসঙ্কলন করেছিলেন। ভুলুয়ার রাজসভায় ন্যায়শাস্ত্রেরও খুব চর্চা হত। লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের সভাকবি 'কবিতার্কিক' তাঁর 'কৌতুক-রত্নাকর' প্রহসনের প্রারম্ভে ভুলুয়া রাজধানীর ও রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনেকে বর্ধমানের রাজবংশের প্রশস্তি গেয়েছেন নানাভাবে।

রাজা-মহারাজা বা ভূস্বামীদের বেশ শাঁসাল পেট্রনরূপে না পেলে কবিদের যে কি দুর্গতি হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জীবনালেখ্য থেকে। বাংলা দেশে পাঠান রাজশক্তি তখন অস্তগামী। দেশের মধ্যে জায়গীরদার

* উদ্ধৃতিগুলি শ্রীসুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড, ১৮ পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত।

ও জমিদাররা প্রায় অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতার সীমা নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। ন্যায়বিচার নেই, নিরাপত্তা নেই, শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। এই অবস্থায় মুকুন্দরামের পূর্বপুরুষরা যাঁর তালুকে ছয়-সাত পুরুষ ধরে বাস করেছিলেন, সেই দামিন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীও বকেয়া রাজস্বের দায়ে বন্দী হলেন

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
কোনো হেতু নাহি পরিত্রাণে।

মুকুন্দরামও খাজনার দায়ে পড়ে স্ত্রীপুত্র-ভাই সঙ্গে করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। ভেলিয়া গাঁয়ে পৌঁছে দুষ্টলোকের পাল্লায় পড়ে যখন তাঁর সর্বস্ব খোয়া গেল তখন যদু কুণ্ডু তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কবি লিখেছেন

ভাল্যায়েতে উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥

মুড়াই নদী (মুণ্ডেশ্বরী) বেয়ে মুকুন্দরাম ভেঘট্যা (বা কেঁউটা) গ্রামে উপস্থিত হলেন। তারপর দারকেশ্বর উত্তীর্ণ হয়ে পাতুল গ্রামে পৌঁছলেন। সেখানে কবির মাতুলপুত্র গঙ্গাদাস তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। তারপর তাঁরা দামোদর পার হয়ে গোচড়্যা গ্রামে গেলেন।[১০] সেখানে কবির জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। কবির মায়ের রূপ ধরে দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কৃতার্থ করলেন। তারপর

চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই পারাইয়া যাই
আরড়াতে হৈলাম উপসন্নে।

আরড়া ব্রাহ্মণভূমি।* স্থানীয় ভূস্বামীও ব্রাহ্মণ। নাম বাঁকুড়া রায়। তাঁর দ্বারস্থ হয়ে কবি যখন আত্মপরিচয় দিলেন তখন খুশি হয়ে রাজা বাঁকুড়া রায় অবিলম্বে দশ আড়া ধান মেপে দিয়ে তাঁকে ছেলেদের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবি লিখেছেন

সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
সুত-পাঠে কৈল নিয়োজিত

১০ এ-সম্বন্ধে অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য' দ্রষ্টব্য (প্রদীপ, অগ্রহায়ণ ১৩১২)

* 'ব্রাহ্মণভূমি' উত্তর-মেদিনীপুরে।

তাঁর সুত রঘুনাথ দ্বিজকুলে অবদাত
গুরু করি পূজিল বিহিত।

তারপর সুখে-দুঃখে কবির দিন কাটতে লাগল। বাঁকুড়া রায়ের পর রঘুনাথ রায় রাজা হলেন। কবিরও সুদিন দেখা দিল। কবি কিন্তু স্বপ্নের কথা ইতিমধ্যে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, যদিও ডামাল নন্দী তাঁকে প্রায়ই সেকথা মনে করিয়ে দিত।

সঙ্গে ছিল ডামাল নন্দী সে জানে স্বপন-সন্ধি
অনুদিন করয়ে যতন।

অবশেষে পুত্রের মৃত্যু কবিকে সচেতন করল। দুঃখ করে একদিন তিনি রাজাকে বললেন

কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা
শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি
অকালে বিকাইল মোর হাল্যা।

শুনে রঘুনাথ অবিলম্বে 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করতে অনুরোধ করলেন। তারপর সম্পূর্ণ কাব্য রচিত হয়ে যখন গীত হল, তখন প্রচলিত প্রথানুসারে রাজা কবিকে ও গায়েনকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন।

কানে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠমালা
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ।

পেট্রনযুগের আসল রূপটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জীবনে যেমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, এরকম আর কারও জীবনে বোধহয় হয় নি। তাঁর জীবনের প্রতি পর্বে এই কথাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পেট্রনপ্রধান যুগে কাব্যচর্চা বা সাহিত্যচর্চা পেট্রনের পক্ষপুটে না থেকে করা সম্ভব নয়। 'প্রভু গোপীনাথ নন্দী'র তালুক দামিন্যায় (বর্ধমানে) যখন মুকুন্দরাম বাস করতেন তখন তাঁর কাব্যশক্তির বিকাশ তেমন হয়নি। প্রভুর তালুক যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন প্রভুহীন মুকুন্দরাম নোঙরহীন নৌকার মতো জীবন-সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে চললেন। কোথায় কিনারা, তার কোনো ইসারাও পেলেন না কোথাও। রূপরায়ের বিত্তহরণের পর যদু কুণ্ডুর কাছে আশ্রয় পেলেন বটে, কিন্তু মাত্র তিনদিনের জন্য। পাতুল গ্রামে মাতুলপুত্রের সাহায্যও বিশেষ কাজে লাগে নি। গোচড়্যা গ্রামে দেবীকে স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। পেট্রন-যুগের মাহাত্ম্যের দিক থেকে কবিকঙ্কণের জীবনের এইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পেট্রনের মাহাত্ম্যের কাছে স্বয়ং দেবদেবীর মাহাত্ম্যও যে কিছু নয়, মুকুন্দরামের জীবনের

এই ঘটনা তার ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। স্বপ্নে দেবীদর্শনের পরেও কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব হল না, কারণ তখনও হতভাগ্য কবির জীবনে পেট্রনদর্শন ঘটে নি। দেবী স্বপ্নে তাঁকে পেট্রনের সন্ধান দিয়ে দিলেন, তবেই তিনি আরড়াতে গিয়ে বাঁকুড়া রায়ের দেখা পেলেন। কবির জীবনে দেবী চণ্ডীর চেয়ে ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের প্রাধান্য অনেক বেশি, কারণ তিনি পেট্রনের কবি। তাও আবার বাঁকুড়া রায় তাঁকে দশ আড়ি ধান মেপে দিয়ে পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবি হবার সুযোগ তখনও পেলেন না মুকুন্দরাম প্রাইভেট টিউটর হয়ে রইলেন। মাস্টারি করতে-করতে দেবীর স্বপ্নের কথা তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর রঘুনাথ রায় যখন রাজা হলেন এবং রাজা হয়ে তাঁকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার আদেশ দিলেন, তখন তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হল, প্রায় শেষ জীবনে। অর্থা পেট্রনের যখন সত্যিই আবির্ভাব হল জীবনে, তখন তিনি 'প্রাইভেট টিউটর' থেকে 'পোয়েট' হবার সুযোগ পেলেন এবং কাব্য রচনা করে রাজার কাছ থেকে 'কানে সোনা, করে বালা', 'গলে কণ্ঠমালা', 'করাঙ্গুলি রতনভূষণ' ইত্যাদি উপহার পেলেন।

পেট্রনযুগের এই নিয়ম। পেট্রন দেবতা, পেট্রনই হর্তাকর্তাবিধাতা। পেট্রনই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উৎসাহদাতা, অন্যতম শ্রোতা ও পাঠক। বাইরের সবকিছুর সম্রাট যিনি, সবকিছুর পেট্রন যিনি, তিনি সাহিত্যেরও সম্রাট, সাহিত্যেরও পেট্রন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে কবি পণ্ডিতদের একপাও চলবার উপায় নেই, একটি কবিতা বা একটি শ্লোক পর্যন্ত রচনা করার শক্তি নেই। যদু কুণ্ডু আর গঙ্গাদাসদের সাধ্য কি কবিকে প্রেরণা দেন? রূপরায়ের মতো দুষ্টু লোক মুকুন্দরামের বিত্তহরণ করেছিলেন বলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ তার কাছে মুকুন্দরাম আর যে-কোনো রাম একই কথা। আধুনিকযুগেও কি তাই নয়? পকেটমার ও চোর-ডাকাতরা এ-যুগের কবি-সাহিত্যিকদের যে খাতির করে চলে, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ-বৈশিষ্ট্য শুধু পেট্রনযুগের নয়, প্রকাশক ও পাঠকের যুগেরও।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

'...পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন

সঙ্ঘটিত হত ; কেন না Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত, তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে—অন্তত জহুরীর কাছে।' কথাগুলো কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর। কথার মতো কথা।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যজীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছি। বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছি, পেট্রন-কৃপাবঞ্চিত মুকুন্দরাম কিভাবে ভেলার মতো ভেসে বেড়িয়েছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। স্বয়ং দেবীর স্বপ্নাদেশেও তাঁর কাব্যশক্তির স্ফূরণ হয় নি। বাঁকুড়া রায়ের গৃহ-শিক্ষক মুকুন্দরাম কাব্যরচনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন একরকম বলা চলে। যতদিন না রঘুনাথ রায় তাঁর জীবনে পেট্রনরূপে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে কাব্যরচনার আদেশ দেন, ততদিন তাঁর পক্ষে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করা সম্ভব হয় নি। পেট্রনযুগের এই হল ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। পেট্রনযুগ থেকে প্রকাশকের যুগে অবতীর্ণ হবার আগে সন্ধিক্ষণের কবিদের কথাও বলা প্রয়োজন। আধুনিকযুগের কবির সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান কবি পেট্রনের মনোরঞ্জনের জন্য যে কিভাবে আত্মবিক্রয় করেছিলেন এবং শিক্ষা ও রুচি বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেকথা প্রমথ চৌধুরী মশাই তাঁর 'বীরবলের হালখাতা'র মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আগেই তাঁর সেই উক্তি উদ্ধৃত করেছি। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবিদের মধ্যে পেট্রনযুগের হতভাগ্য নায়কস্বরূপ বাংলা দেশের 'কবিয়ালদের' নাম করতে হয় সর্বাগ্রে। বনেদী পেট্রন তখন বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে একে-একে বিদায় নিচ্ছেন—ঐতিহাসিক বিদায়। উদীয়মান ব্রিটিশযুগ আর বিলীয়মান নবাবী আমলের সন্ধিক্ষণে বনেদী রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশাহ, জমিদার-জায়গীরদারদের বদলে নতুন-নতুন সব ভুঁইফোঁড় হঠাৎ-রাজা ও হঠাৎ-নবাবের দল গজিয়ে উঠছে দেশের মাটিতে। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা বদলাচ্ছে, রুচি ও প্রবৃত্তিও বদলাচ্ছে। সেই নব্যযুগের হঠাৎ-নবাবদের বিকৃত রুচি পরিতৃপ্তির জন্য ডাক পড়ল বাংলা দেশের কবিয়ালদের। পেট্রনযুগের শেষ বংশধরদের বিকৃত বাসনা ও রুচি চরিতার্থ করে বাঙালী কবিয়ালরা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন। কমবেশি নানাস্তরের কবিত্বশক্তি নিয়েও যে বাংলা দেশের কবিয়ালরা সাহিত্যমঞ্চে ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু নব্যযুগের বিকৃতরুচি ভুঁড়িয়াল পেট্রনরাই যে তাঁদের ভাঁড় তৈরি করেছিলেন, সে-কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

ভারতচন্দ্র ও কবিয়ালদের কথা বলে পেট্রনযুগের কাহিনী শেষ করব। প্রথমে ভারতচন্দ্রের কথা বলি। হাওড়া জেলার ভুরসুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত পেঁড়োর জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র যে কষ্টভোগ করেছিলেন যথেষ্ট, তা

অনেকেই জানেন। দ্বার থেকে দ্বারান্তরে তাঁকে কাঙালের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল আশ্রয়ের জন্য। বর্ধমানের মহারাজা তাঁদের জমিদারী গ্রাস করেছিলেন এবং পরে রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। বর্ধমানের কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি কটকে গিয়ে শিবভট্ট নামে এক সুবাদারের আশ্রয় নেন। তাজপুরের আচার্য পরিবারে বিবাহ করেন এবং দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসী ভাষা শেখেন। তখনই তিনি সত্যপীরের কথা অবলম্বনে দু'খানা কাব্য রচনা করেন, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে। কিন্তু প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পেট্রনাভাবে তাঁর কাব্যশক্তির প্রকৃত বিকাশ হল না। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসেন এবং ফরাসী গভর্নমেণ্টের ধনাঢ্য দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে বলেন, 'মশায়! আমি আপনার আশ্রয় নিলাম, শরণাগত হলাম। যেরকম করেই হোক, আমাকে আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করুন।' ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন: 'এতদ্রূপ করুণাকর অনুকূল বচনে ভারতচন্দ্রের মানসমুকুল আনন্দমকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল।' হবারই কথা। পেট্রনযুগের এমনই মাহাত্ম্য! চৌধুরী মশায়ের জাতিঘটিত কোনো অপবাদ থাকাতে ভারতচন্দ্র তাঁর বাসায় না থেকে ডাচ গভর্নমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকে আহারাদি করতেন। আহার করলেও ভারতচন্দ্র প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় চৌধুরীবাবুর কাছে হাজ্‌রে দিতে এবং উমেদারি করতে ভুলতেন না। পেট্রনযুগের কবিদের যেন অস্থিবিন্যাসই ছিল অন্যরকম। মেরুদণ্ড তাঁদের সবসময় বেঁকেই থাকত এবং ঘাড় থাকত হেঁট হয়ে। কাব্যচর্চার চেয়ে মোসাহেবি ও ভাঁড়ামির চর্চাতেই তাঁরা পটু ছিলেন বেশি। পটুতা তাঁদের অর্জন করতে হয়েছিল, কারণ তা না হলে পেট্রন মনিবের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হত না। যাই হোক, তখনও অবশ্য ভারতচন্দ্রের ভাগ্যে আসল পেট্রনদর্শন ঘটে নি।

নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দু'চার লক্ষ টাকা ঋণের দরকার হলে তিনি প্রায় চৌধুরীবাবুর শরণাপন্ন হতেন। একদিন তিনি ভারতচন্দ্রকে বললেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র এলে তিনি তাঁকে তাঁর কথা বলবেন। শুনে ভারতচন্দ্রের মনে কিরকম ভাবের উদয় হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গুপ্ত কবি বলেছেন: 'এই বচনে ভারতচন্দ্র বারিষ-বদন-বিনির্গত-বারিবিন্দু পতনপ্রত্যাশী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।'[১১] চাতকপক্ষীর ন্যায় মহারাজার অনুগ্রহবারিবিন্দুর

১১ 'সংবাদ প্রভাকর', ১২৬২ সন, ১ জ্যৈষ্ঠ। ঈশ্বর গুপ্ত: কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৬২, আষাঢ়)।

প্রত্যাশায় ভারতচন্দ্র দিন গুণতে লাগলেন। অতঃপর একদিন কৃষ্ণচন্দ্র এলেন। চৌধুরী মশায় তাঁকে বললেন: 'মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে। এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, অমুকের সন্তান, ভাল সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিত্বশক্তি ভাল আছে। বর্তমানে দীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁকে অনুগ্রহ করে প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করতে হবে।' মহারাজা উত্তর দিলেন: 'আমি এখন কলকাতায় চললাম। কালী দর্শন করে কালীঘাট থেকে কৃষ্ণনগরে ফিরলে উনি যেন একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।'

ভারতচন্দ্র একদিন কৃষ্ণনগরে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহারাজা তাঁকে ৪০৲ টাকা মাসিক বেতন ও বাসা দিয়ে বললেন, 'প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।' মহারাজের আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় রাজসভায় উপস্থিত হতেন এবং মহারাজাকে ছোট-ছোট স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। কৃষ্ণচন্দ্র খুশি হয়ে তাঁকে 'গুণাকর' উপাধি দিলেন এবং বললেন, 'ভারত! তোমার কবিতা শুনে আমি প্রীত হয়েছি, কিন্তু এরকম ছোট-ছোট পদ্য শুনতে ইচ্ছা করে না।' ভারতচন্দ্র বলেন, 'যেরকম শুনতে ইচ্ছা হয়, আদেশ করুন।' তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যেভাবে ও ভাষায় 'চণ্ডী' রচনা করেছিলেন, তুমিও সেই পদ্ধতিতে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা কর।' ভারতচন্দ্র তারপর 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করতে আরম্ভ করলেন। এই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' রচনার ইতিহাস।

ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন।

ব্রাহ্মণ লেখক নিযুক্ত করে একদিন ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করতে আরম্ভ করলেন। কাব্যরচনা করে গান শোনানো ছাড়া তখন আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। এক-একটি পালা ভারতচন্দ্র রচনা করতেন, ব্রাহ্মণ লেখক পুঁথিতে লিখতেন এবং নীলমণি সমাদার নামক জনৈক গায়ক সেই সব পালাভুক্ত কবিতা সুর-রাগ সহযোগে পাঁচালীর মতো গান করে শোনাতেন। শুনতেন প্রধানত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কারণ তিনিই পেট্রন। আর শুনতেন অন্যান্য সভাসদরা। শুনতে-শুনতে একদিন মহারাজা বললেন, 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে সরলভাবে বর্ণনা করে এর সঙ্গে জুড়ে দাও।' সভা বর্ণনায় মহারাজার মন উঠছিল না

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল ॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥

এত স্তুতিগানেও কৃষ্ণচন্দ্র যেন আনন্দে মশ্‌গুল হতে পারছিলেন না কারণ সভাকবির কাছ থেকে পেট্রনরূপে এই স্তবস্তুতি যে তিনি না চাইতেও পাবেন, তা তিনি জানতেন। তাঁর মনটা উস্‌খুস্ করত অন্যরকম রসাস্বাদনের জন্য এবং সে-রস যে আদিরস তা বলাই বাহুল্য। তাই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণনার হুকুম দেওয়া হল অন্নদামঙ্গলের মধ্যে। হলই বা অন্নদামঙ্গল, তাতে কি? তার সঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর' জুড়ে দিতে ক্ষতি কি? বিশেষ করে পেট্রনের বাসনা যখন। কথাপ্রসঙ্গে একালের সিনেমার কথা মনে পড়ে। সিনেমার ডিরেক্টার যেমন প্রডিউসারের কথা বা আদেশ অনুযায়ী কাজ করেন, কোনো মহাপুরুষের জীবনচরিত অথবা কোনো আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক কাহিনীর চলচ্চিত্রের মধ্যে যেমন প্রডিউসারের খেয়াল ও রুচির জন্য হঠাৎ খেম্‌টাওয়ালীর 'বিবিজান'-গোছের নাচের দৃশ্য সংযোজন করে দিতে বাধ্য হন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও তেমনি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে পেট্রন কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যোগ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরী মশায় পরিহাস করে বলেছেন: 'কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না. কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত।' উদার ও মহানুভব পেট্রন হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের যতই খ্যাতি থাকুক না কেন, নবদ্বীপাধিপতির রাজসভার নৈতিক পরিবেশ যে কতখানি কদর্য ছিল, তার কিছু-কিছু আভাস দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনচরিতে' পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। কৃষ্ণনগরের রাজসভার এক রাত্রির বিবরণ দিচ্ছি:

'এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে এই রমণী সুন্দর খ্যাম্‌টা নাচিতে পারে। তখন সুরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্লিত ছিল; সুতরাং

এ-প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। ঐ সুন্দরী যখন পেশওয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন, এইরূপ দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা আপন-আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঐ সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাঁহার পদও শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন।'[১২]

এই যখন রাজসভার পরিবেশ, তখন রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান এমন সরস ভঙ্গিতে যোজনা করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।* ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্ কবিকেও এইভাবে পেট্রনযুগের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হয়েছে। পেট্রনযুগের এই ঐতিহাসিক নিয়মের ব্যতিক্রম যেমন কোনো কবির ক্ষেত্রেই ঘটে নি, তেমনি 'অন্নদামঙ্গলের' কবির ক্ষেত্রেও ঘটে নি। পরবর্তীযুগের কবিয়ালদেরও ঐ একই ট্রাজিক ইতিহাস। এইবার তাঁদের কথা বলব।

সপ্তম প্রস্তাব

'ইংরেজদের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না। কবির দল তাহাদের এই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল।' রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যবান উক্তি থেকে বাংলায় কবিয়ালদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। হাণ্টার সাহেব বলেছেন যে ১৭৭০ সালের পর থেকে বাংলা দেশের প্রাচীন বনেদী জমিদারবংশের প্রায় তিনভাগের দু'ভাগ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনভাগের

১২ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত, পৃ ১১০-১১১

* পরবর্তীকালের রাজসভার বর্ণনা হলেও, কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এর চেয়ে বেশি উন্নত পরিবেশ ছিল না।

একভাগ কৃষক নির্বংশ হয়ে যায়।[১৩] এই সময় নতুন যুগের বিকৃতরুচি হঠাৎ-অভিজাতরাই (ব্রিটিশ আমলের) শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পেট্রনরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁদের কুরুচি ও কুশিক্ষার হাঁড়িকাঠে প্রথম যাঁরা আত্মবলি দেন, তাঁরাই হলেন বাংলা দেশের কবিয়াল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় একশতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত বাংলার কবিয়ালদের ইতিহাস। এইসময় ইংরেজের প্রয়োজনে বাংলার নতুন রাজধানীরূপে কলকাতা শহর গড়ে উঠছে। তার সঙ্গে ইংরেজের অনুগ্রহে নতুন একশ্রেণীর বাঙালী ধনিক বাংলার সমাজে দেখা দিচ্ছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি' নন। আসলে 'সর্বসাধারণ' তখনও সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চের অন্তরালেই বিরাজ করছে। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক পাঠক বা শ্রোতারূপে তখনও সর্বসাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নি। পেট্রনের যুগ তখন অস্তাচলে গেলেও একেবারে অস্ত যায় নি। প্রাচীন অভিজাত পেট্রনগোষ্ঠী অর্থাৎ রাজা-বাদশাহ ও জমিদার-জায়গীরদাররা তখন ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতির চাপে প্রায় নির্মূল হয়ে গেছেন। তাঁদের বদলে নতুন এক শ্রেণীর ধনিক বাংলার সমাজে পেট্রনরূপে দেখা দিয়েছেন। তাঁরা ইংরেজের কৃপাজীবী দালাল গোমস্তা বেনিয়ান মুৎসদ্দী মুনশী ইত্যাদি। লাটে-ওঠা জমিদারী কিনে তাঁরা নব্যযুগের অভিজাতশ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন। এক বিচিত্র শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে বাংলার সমাজে, পুরাতন শ্রেণীবিন্যাসকে ভেঙেচুরে দিয়ে। ধীরে-ধীরে হলেও, বাংলার সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছে। অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত ইংরেজ প্রভুদের আচার-ব্যবহার, রুচি-নীতির সঙ্গে এদেশী ঐতিহ্যের যা কিছু কদর্য তলানি তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে আত্মসাৎ করলেন তাঁরা। নব্যযুগের প্রথম পর্বের বাঙালী মধ্যবিত্তের এই হল অন্যতম চারিত্রিক বিশেষত্ব। তখনও প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয় নি। প্রকৃত সামাজিক আদর্শ একটা সুসমন্বিত রূপ ধারণ করে নি। নতুন যুগের বিকট নতুনত্ব তখন চারিদিক থেকে কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। বাঙালী কবিয়ালরা কিছুটা পরিমাণে প্রথম পর্বের এই উদীয়মান ছিন্নমূল মধ্যবিত্তশ্রেণীর অপরিণত অশিক্ষিত ও অমার্জিত মনের খোরাক যুগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের ঠিক 'সর্বসাধারণের' কোঠায় ফেলা যায় না।

১৩ "Before the commencement of 1771, one-third of a generation of peasants had been swept from the face of the earth and a whole generation of once rich families had been reduced to indigence.... From the year 1770 the ruin of two-thirds of the old aristocracy of lower Bengal dates." W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, London 1868, pp. 56-57

তাঁরা সর্বসাধারণ নন। এ-যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপুল কলেবর ও বিচিত্র রুচি দেখে সে-যুগের মুষ্টিমেয় অর্ধশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত স্থূলরুচি মধ্যবিত্তের স্বরূপ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা বাস্তবিকই কঠিন। এই মুষ্টিমেয় স্থূলরুচি মধ্যবিত্তশ্রেণী তখনও ঠিক একটা সামাজিক শ্রেণীরূপে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নি। সে-রকম ঐতিহাসিক চেতনাও তার তখন ছিল না, অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। নতুন অভিজাতশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য লেজুড়ের মতো ছিলেন তাঁরা। নতুন অভিজাত ধনিকরা পুরাতন রাজা নন, হঠাৎ-রাজা। তাঁদের কোনো বনেদী ঐতিহ্য নেই। কোনো শিক্ষাদীক্ষা, কোনো নীতি বা রুচির বালাই নেই। ভুঁইফোড় অভিজাতদের থাকেও না কোনদিন। এই ভুঁইফোড় বাঙালী হঠাৎ-রাজারাই হলেন সেকাল-একালের সন্ধিক্ষণের পেট্রন। বাংলার কবিয়ালরা প্রধানত তাঁদেরই অনুগ্রহজীবী ছিলেন।

সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কবি হলেন কবিয়ালরা। এই কবিয়ালদের কবিসঙ্গীতের ধারাতেই বাংলার সন্ধিক্ষণের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্যের আসরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। এইসময় কবিয়ালরাই সাহিত্যের ফাঁকা আসর জাঁকিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিভার চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি কেউ। সুশীলকুমার দে তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে এই কবিয়ালদের ভূমিকার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন [১৪]

> Between the death of Bharatchandra in 1760 and the first appearance of Iswar Gupta in 'Sambadprabhakar' of 1830, there came an interregnum of more than half a century during which there was no man who had been strong enough to seize the unclaimed sceptre. The only Pretenders were the Kabiwallahs, but they never rose to that level of artistic merit and sustained literary composition which would have enabled them to strike a commanding figure on the empty stage. Who would think of placing Haru Thakur or Ram Basu side by side with Bharatchandra or Ramprasad ?

১৪ **S. K. Dey :** *History of Bengali Literature in the Nineteeth Century*, p. 38

কবিয়ালদের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ যে আদৌ ছিল না তা নয়। কবিত্বশক্তিসম্পন্ন কবিয়াল অনেকে ছিলেন। হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা প্রভৃতির স্বাভাবিক কাব্যশক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু নব্যযুগের হঠাৎ-রাজাদের কুরুচি চরিতার্থ করার জন্যই প্রধানত তাঁরা তাঁদের স্বকীয় প্রতিভা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষারও তাঁদের অভাব ছিল। তাই কেউ তেমনভাবে নিজের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

> তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু স্বরে উচ্চৈস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

গুণীদের গানের সঙ্গে অনেকটা জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মেশাতে কবিয়ালরা বাধ্য হয়েছিলেন, বাঙালী হঠাৎ-রাজাদের মেজাজ ও রুচি পরিতৃপ্তির জন্য। হঠাৎ-রাজারাই ছিলেন নব্যযুগের প্রধান পেট্রন। প্রাচীন বনেদী রাজদের সভাকবিরা যেমনভাবে তাঁদের পেট্রনদের বাসনা ও কামনা চরিতার্থ করতেন, হুকুম মাফিক কাব্য রচনা করে, নব্যযুগের কবিয়ালরাও তাই করতেন হঠাৎ-রাজাদের খুশি করবার জন্য। প্রাচীন রাজসভার আশ্রয় অনেক বেশি আরামের ছিল। নিশ্চিন্ততাও ছিল সভাকবির অনেক বেশি। কিন্তু হঠাৎ-রাজাদের সেরকম কোনো রাজসভা ছিল না। মহারাজা নবকৃষ্ণের মতো দু'একজনের রাজসভা ছিল অবশ্য এবং তাঁরা হরু ঠাকুরের মতো দু'এক-জন কবিয়ালকে পোষণও করতেন। কিন্তু সকলের রাজসভা ছিল না মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো, কোচবিহারের রাজার মতো, বর্ধমানের মহারাজার মতো, বিষ্ণুপুরের রাজার মতো অথবা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার মতো। সুতরাং ধোয়ী বা উমাপতি ধরের মতো, বা ভারতচন্দ্রের মতো, এমনকি মুকুন্দরামের মতো কবিয়ালদের সকলের ভাগ্যে রাজামহারাজা অথবা ভূস্বামী পেট্রন জোটে নি। তাঁরা নব্যযুগের ধনিক বাবুদের এক বৈঠকখানা থেকে অন্য বৈঠকখানায়, এক বারোয়ারীতলা থেকে অন্য বারোয়ারীতলায় ভেলার মতো ভেসে-ভেসে বেড়িয়েছেন, কোনো রাজসভার স্থায়ী পোষকতা পান নি। বাবুদের বিচিত্র মর্জি, নানারকমের রুচি ও কুরুচির খোরাক যুগিয়েছেন তাঁরা। দরজায়-দরজায় কাব্যের পসরা নিয়ে তাঁদের ফিরি করে বেড়াতে হয়েছে। বড়-বড় রাজা-মহারাজারা নবকৃষ্ণের মতো পূজা-পার্বণে, বিবাহে, উৎসবে, শ্রাদ্ধে, অন্নপ্রাশনে নিজেদের গৃহে এই কবিয়ালদের ডেকে কবির গান শুনতেন। হুকুম দিয়ে নিজেদের রুচি মাফিক গান রচনা করতে বলতেন তাঁদের অধিকাংশ সময়।

গানের শেষে তাঁদের দক্ষিণা ও পারিতোষিক দিয়ে বিদায় করতেন। এইভাবে অধিকাংশ কবিয়ালের জীবিকা অর্জন করতে হত। একজন প্রভুর আশ্রয়ে থেকে অথবা একজন ধনিক পেট্রনের রুচি পরিতৃপ্ত করে তাঁদের দিন কাটত না। বাংলার কবিয়ালরা ছিলেন কাব্যের ফিরিওয়ালা। এইদিক থেকে বিচার করলে কবিয়ালদের ইতিহাস সত্যিই যুগান্তকারী ইতিহাস। তাঁরা সাহিত্যের এক নবযুগের প্রবর্তক অথবা এক অভিনব নবযুগের প্রতিনিধি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁদের নিয়েই সুরু। আমরা আধুনিক প্রকাশক ও সাধারণ পাঠকযুগের সাহিত্যিকরা বাংলার এই কবিয়ালদেরই বংশধর। প্রাচীন পেট্রনযুগের রাজসভা আর নেই। প্রাচীনযুগের সভাকবির নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পর্বও শেষ হয়েছে বলা চলে। ইংরেজ আমলে আধুনিকযুগের সূত্রপাত হয়েছে—আধুনিক পেট্রনের যুগ অর্থাৎ নতুন ধনিক-শ্রেণীর ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগ। একজন রাজা নয়, একাধিক রাজা ও পেট্রনগোষ্ঠীর যুগ, রাজসভার বদলে জনসভার যুগ। রাজসভা থেকে জনসভায় যাত্রাকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা এই বাঙালী কবিয়ালদের দেখতে পাই। যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিনিধিরূপে কবিয়ালরা তাই স্মরণীয়।

পেট্রনের যুগ থেকে প্রকাশক ও পাঠকের যুগে আমরা অবতীর্ণ হচ্ছি। তারই সন্ধিক্ষণে এই কবিয়ালদের আবিভাব হল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। নবযুগের হঠাৎ-রাজাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করেছেন কবিয়ালরা ঠিকই, কিন্তু কোনো রাজার কেনা গোলাম যে তাঁরা নন তাও তাঁরা প্রমাণ করেছেন। ধনিক সৌখীন বাবুরা সখের কবিদল, যাত্রার দল, আখড়াই গানের দল ইত্যাদি গঠন করেছেন ঠিকই এবং এ-রকম অনেক দলের পোষকতাও যে করেছেন তাতেও কোনো ভুল নেই। দু'একজন হঠাৎ-রাজা সখ করে কবিয়াল পোষণও করতেন শোভাবাজারের রাজাদের মতো। এ সবই সত্য। কিন্তু সব সত্যের মধ্যেও সবচেয়ে বড় সত্য হল এই যে, প্রাচীন রাজসভার সভাকবিদের মতো কবিয়ালরা তাঁদের পেট্রনদের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁরা কারো আশ্রিত বা কারো পোষা ক্রীতদাস ছিলেন না। হঠাৎ-রাজার রুচি চরিতার্থ করলেও তাঁর স্তাবকতা করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। কবিয়ালদের একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তাও ছিল। এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। সেই স্বাতন্ত্র্য যে সবসময় তাঁরা জলাঞ্জলি দিতেন, তাও সত্য নয়। নব্যযুগের হঠাৎ-রাজাদের ও ধনিক বাবুদের কুরুচি তাঁরা যেমন চরিতার্থ করেছেন, তেমনি আবার তীব্র বিদ্রূপবাণে তাঁরা তাঁদের আচার-ব্যবহার, রুচি-নীতিকে জর্জরিতও করেছেন। কোনো রাজসভার আশ্রিত কবির কোনকালেই তা করার সাহস হত না। ধোয়ী, উমাপতি থেকে

ভারতচন্দ্র পর্যন্ত কেউ করবার সাহস পান নি। অথচ কাব্য-প্রতিভা তাঁদের অনেক বেশি ছিল, যথেষ্ট শক্তিশালী কবিও ছিলেন তাঁরা। কিন্তু কবির আত্মমর্যাদাবোধ তাঁদের ছিল না, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও ছিল না। কবিয়ালরা তাঁদের তুলনায় নিকৃষ্ট-প্রতিভা ঠিকই, কিন্তু এইদিক থেকে তাঁরা নব্যযুগের পথ-প্রদর্শক। নব্যযুগের ধর্ম যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, তা কবিয়ালরা প্রথম উপলব্ধি করে তাঁদের কাব্যজীবনে তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ভোলা ময়রাদের প্রতিভার তুলনা হয় না ঠিকই, কিন্তু ভোলা ময়রাদের সৎসাহস ও স্বাতন্ত্র্যবোধের শতাংশের একাংশও ভারতচন্দ্রের ছিল না। ভোলা ময়রা ও তাঁর সমসাময়িক কবিয়ালরাই এই কারণে আধুনিকযুগের প্রবর্তক, ভারতচন্দ্র নন। কবিয়ালদের প্রসঙ্গে এইটুকু স্বীকার না করলে ইতিহাসকে বিকৃত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয় এবং কবিয়ালদের প্রতিও অবিচার করা হয়।

কবিয়ালদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। উত্তর-মেদিনীপুরে জাড়া গ্রামের জমিদারবাবুদের বাড়ি উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে প্রায় কবিগান হত। একবার এক গানের আসরে বাবুদের পোষ্য কবি জাড়াগ্রামটিকে গোলকবৃন্দাবন বলে বর্ণনা করেন। উত্তরে প্রতিপক্ষ কবি বলেন

কেমন ক'রে বললি জগা,
জাড়া গো॰কবৃন্দাবন !
ওরে বেটা কবি গাবি, পয়সা লবি,
খোশামদি কি কারণ ?

উত্তরটি কেবল কবিগানের ঢঙ নয়, পরিহাসও নয়। 'কবি গাবি, পয়সা লবি, খোশামদি কি কারণ'—এই কথার মধ্যে কবিগায়ক নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি ব্যক্ত করেছেন। বোঝা যায়, যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রা করার পথে এ এক নতুন পর্ব। এই সন্ধিক্ষণে কবিগান গেয়ে কতকটা স্বাধীনভাবে পয়সা রোজগার করা সম্ভব হয়েছে এবং কবিগায়করা বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে কেবল বড়লোকের খোশা-মোদি না করলেও তাঁদের চলতে পারে। এ-চেতনা ঐতিহাসিক চেতনা। রাজসভা থেকে জনসভার দিকে সবেমাত্র যাত্রা শুরু হয়েছে। দ্বিধাশঙ্কা নিয়ে সেই পথের প্রথম যাত্রী হয়েছেন বাংলার কবিয়ালরা। তাঁদের ভিতর থেকেই আমরা কবি 'ঈশ্বর গুপ্তকে' পেয়েছি। কবিয়াল থেকে তিনিই প্রথম স্বাধীন কবি ও সাংবাদিক হয়ে উঠেছেন। নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তিনি অবাধে প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যে এবং নিজের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে সমসাময়িক সমাজের সমালোচনা করেছেন তাঁর সংবাদপত্রে (সংবাদ প্রভাকর)। ভারতচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয় নি। ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার

প্রথম কবি যিনি রাজসভার পোষকতার মোহ ত্যাগ করে, জনসভার দিকে সাহস করে পা বাড়িয়েছিলেন। নতুন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ও বাবুসমাজ নিয়ে সেই জনসভা গঠিত ছিল। হয়ত খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক রুচি তাঁর ছিল না, বিচারবুদ্ধিও ছিল না। তা না থাক, তবু একজন রাজার রাজসভা থেকে বহুজন হঠাৎ-রাজাদের দিকে এগিয়ে যাওয়াই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। সাহিত্যের ইতিহাসে এটা অগ্রগতি।

রাজসভা থেকে জনসভা

মুদ্রক প্রকাশক লেখক

প্রথম প্রস্তাব

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল 'পেট্রন ও লেখকের' ইতিহাস। আধুনিক-যুগের ইতিহাস হল 'প্রকাশক ও লেখকের' ইতিহাস। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই পেট্রনযুগের অবসান এবং প্রকাশকযুগের আবির্ভাব সম্ভব হয়। মুদ্রকই সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিকযুগের প্রবর্তন করেন। পেট্রনযুগে ছিলেন লিপিকার, প্রকাশকযুগে এলেন মুদ্রক। প্রকাশকের ইতিহাসের সঙ্গে তাই মুদ্রকের কাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

সাহিত্যের ইতিহাস আমরা পড়েছি, কিন্তু প্রকাশকের ইতিহাস পড়ি নি। সাহিত্যিকের ইতিবৃত্তও জানি, কিন্তু মুদ্রকের কথা কিছুই জানি না। অথচ সাহিত্যের বাস্তব পশ্চাদ্‌ভূমি হল মুদ্রক ও প্রকাশকদের ইতিহাস। দেহ বাদ দিয়ে যেমন মুণ্ডের ইতিহাস রচনা করা অর্থহীন, প্রকাশককে বাদ দিয়ে তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যুক্তিহীন। ইতিহাস তাতে সম্পূর্ণ হয় না, তার অঙ্গহানি হয়। মস্তিষ্কের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসই প্রধানত মানুষের ইতিহাস, কিন্তু দেহকাণ্ডটিকে বাদ দিয়ে মস্তিষ্কটি স্কন্ধের উপর হঠাৎ বৌদ্ধস্তূপের মতো গজিয়ে ওঠে নি। সাহিত্যের ইতিহাসও তাই। কাব্য নাটক উপন্যাসের ইতিহাসই প্রধানত সাহিত্যের ইতিহাস, অন্তত যে-ইতিহাস আমরা এতদিন পড়েছি। কিন্তু কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক এই ইতিহাস হঠাৎ আকাশ থেকে রচনা করে যান নি। তাঁরা এই সমাজেই রচনা করেছেন এবং প্রকাশকরা সেই রচনা প্রকাশ করেছেন ও প্রচার করেছেন বলেই সামাজিক জীব হিসেবে পাঠকরা সেগুলি পাঠ করার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং প্রকাশকের সঙ্গে সাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। প্রকাশক যে-রচনা নির্বাচন করেছেন, সেই রচনাই পাঠক-সমাজে পরিবেশিত হয়েছে এবং তিনিই লেখক ও সাহিত্যিক বলে পরিচিত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাহলে প্রকাশকের নির্বাচনের, বিচারবুদ্ধির ও রুচির, সহানুভূতির ও পৃষ্ঠপোষকতার যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে সাহিত্যের ইতিহাসে, তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। প্রকাশকের পোষকতা থেকে বঞ্চিত আধুনিকযুগের কত সাহিত্য-প্রতিভা যে অনাদৃত ও অবজ্ঞাত অবস্থায় অপমৃত্যু বরণ

করে নিয়েছে লোকসমাজের অগোচরে, কোনো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আজ পর্যন্ত তার সংখ্যা গণনা করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। অথচ খ্যাত-অখ্যাত সকল সাহিত্যিকই হাড়ে-হাড়ে জানেন যে, প্রকাশকের পোষকতা তাঁদের জীবনে কতখানি প্রয়োজন হয়েছে, সেই পোষকতার অভাবে পদে-পদে কত লাঞ্ছনা তাঁরা ভোগ করেছেন এবং তার প্রাচুর্য কিভাবে তাঁদের সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করেছে। তাই যদি হয়, তাহলে প্রকাশককে বাদ দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস-রচনা সম্পূর্ণ হয় কি করে? দেহ বাদ দিয়ে মুণ্ডের ইতিহাস লেখা হয় না কি তাহলে? সাহিত্যের ধারা সাহিত্যিকরাই সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাই তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু প্রকাশককে পাশ কাটিয়ে নয়। পাশ কাটাবার কোনো উপায় নেই। সাহিত্যের ধারা প্রকাশকরাও অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, বিভিন্ন পথে পরিচালনা করেছেন। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশকদের দান আছে। সেই দান অস্বীকার করে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা যায় না। সাহিত্যিকরা যদি সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আধুনিকযুগে প্রকাশকরা সৃষ্টি করেছেন সাহিত্যিকদের—একথা বললে বিশেষ ভুল বলা হয় না। প্রকাশকদের ইতিহাস তাই জানা দরকার—সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে।

প্রকাশকের ইতিহাস জানতে হলে আগে মুদ্রকের ইতিহাস জানা দরকার, কারণ সাহিত্যের ইতিহাসে মুদ্রকের অনুগমন করেছেন প্রকাশক। মুদ্রক না থাকলে, ছাপাখানা না থাকলে প্রকাশকের অস্তিত্ব থাকত না। 'প্রকাশক' কথার অর্থ যিনি প্রকাশ করেন। ইংরেজি 'পাবলিশার' কথার অর্থও তাই, যিনি পাবলিশ করেন। কি প্রকাশ করেন, কি পাবলিশ করেন? লেখকদের লেখা নানারকমের বই। বই কিভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর? হাতে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 'প্রকাশ' করার অর্থও তা নয়। বহু লোকের কাছে প্রকাশ করাই হল প্রকাশকের কাজ। হাতে লিখে কোনো বই লোকের কাছে প্রকাশ করা যায় না। একেবারে যায় না যে তা নয়। দু'দশ-পঞ্চাশ কপি হয়ত বা যায়, কিন্তু তাকে প্রকাশ করা বলে না। সুতরাং বই প্রকাশ করার আগে ছাপাখানা চাই, মুদ্রক চাই, তবেই বই প্রকাশ করা এবং প্রকাশক হওয়া সম্ভবপর। প্রকাশকের আগে ছাপাখানা ও মুদ্রক। ছাপাখানা যখন ছিল না তখন প্রকাশক ছিলেন না, পেট্রন ছিলেন। মুদ্রক যখন ছিলেন না, পেশাদার লিপিকর ছিলেন। মধ্যযুগের সায়াহ্নে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে লিপিকর বা 'কপিস্ট' বিদায় নিলেন, মুদ্রক আবির্ভূত হলেন। প্রকাশক এলেন প্রায় মুদ্রকের সঙ্গেই। লিপিকরের সঙ্গে তাঁদের পেট্রনরাও বিদায় নিলেন। মধ্যযুগের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ মায়ার্স ছাপাখানা ও মুদ্রকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন

The Invention of printing meant that there was far more reading matter than there had ever been before, and though it was not at first unorthodox it helped to form a lay public opinion not dependent for its information on the pulpit and cloister .. A revolutionary influence in religion and education was the art of printing, which made it possible to multiply books with a speed, an accuracy, and a cheapness hitherto inconceivable.[১]

ছাপিয়ে প্রকাশ করা যদি ছাপানো হয় (আধুনিক শাড়ী ছাপানোর মতো) তাহলে ছাপানো বইয়ের ইতিহাস ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়েছে বলতে হয়। কাঠে খোদাই করা অক্ষরের উপর কালি লাগিয়ে ছাপ দিলেই ছাপানো হতে পারে। কিন্তু এইভাবে ছাপানোর জন্যও দু'টি জিনিস চাই। প্রথমত চাই কাগজ, দ্বিতীয়ত চাই ছাপার কালি। কাগজ, ছাপার কালি ও প্রিন্টিং কোনটাই কিন্তু ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হয় নি প্রথমে, এসিয়ায় হয়েছে। চীনদেশই এসবের আদি জন্মস্থান। কাগজ তৈরি হয়েছে ১০৫ খ্রীস্টাব্দে, ছাপার কালি হয়েছে ৪০০ খ্রীস্টাব্দে এবং ছাপা হয়েছে ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে। চীনদেশে হয়েছে, ইংলণ্ডে বা জার্মানিতে নয়। চৈনিক তথা এসিয়াতিক সভ্যতা সম্বন্ধে ইয়োরোপের তখন কোনো ধারণাই ছিল না। ইয়োরোপবাসী যে কতখানি অজ্ঞ ছিল তা মার্কো পোলোর কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। মার্কো পোলোর বিবরণ কেউ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন নি।

যাই হোক্, ইয়োরোপে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয় চীনের ছাপাখানার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। ঐতিহাসিকরা অন্তত তাই বলেন। ইয়োরোপীয়রা চীনের ছাপাখানার প্রাচীনত্বের ইতিহাসটুকুও সেদিন পর্যন্ত জানতেন না। কিছু না জেনেই তাঁরা নতুন করে আধুনিক ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিলেন। কে করেছিলেন এবং কোথায় করেছিলেন তাই নিয়ে মতভেদ আছে। সাধারণত দু'জন ছাপাখানার আবিষ্কর্তা বলে দাবি করেন। একজন কস্টার (Coster), আর-একজন গুটেনবার্গ (Gutenberg)। কস্টার হলেন ডাচ্, গুটেনবার্গ জার্মান। ঐতিহাসিকরা সাধারণত গুটেনবার্গকেই ছাপাখানার আবিষ্কর্তার সম্মান দিয়ে থাকেন এবং কস্টারের দাবিকে মিথ্যা রূপকথা বলে উপহাস করে থাকেন।

১ A. R. Myers: *England in the Late Middle Ages*, London, 1952, p. 226, 232

কিন্তু হালে কেউ-কেউ কস্টারের দাবিকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে রাজী নন দেখা যায়। সুতরাং ছাপাখানার আবিষ্কার নিয়ে হল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। দ্বন্দ্বের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনরকম রায় না দিয়েই বলা যায় যে, দু'জনেই ছাপাখানার আবিষ্কর্তা হতে পারেন। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে যে, বড়-বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হঠাৎ কোনো মহাপুরুষ রাতারাতি করেন নি। যা-কিছু আবিষ্কার করা হয়েছে, প্রথমে তার একটা সামাজিক প্রয়োজন ও তাগিদ এসেছে মানুষের মধ্যে। সেই সামাজিক তাগিদ সকলে অনুভব করেছেন, অন্তত একাধিক ব্যক্তি যে করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। সেই একাধিক ব্যক্তি প্রত্যেকে তাই নিয়ে চিন্তা করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন এবং তারপর হয়ত একাধিক আবিষ্কর্তা যুগপৎ সেটা আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগে যা আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে তা দুশো বছর আগে সম্ভব হয় নি কেন? তখন করা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন বর্তমানের প্রয়োজনবোধ বা তাগিদ ছিল না। সুতরাং আবিষ্কারের আগে সামাজিক প্রয়োজনবোধ ও তাগিদ চাই। তাগিদের চাপে একাধিক ব্যক্তি যুগপৎ কোনো নতুন যন্ত্র বা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন। ছাপাখানাও হয়ত সেইভাবেই গুটেনবার্গ ও কস্টার যুগপৎ আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু আধুনিক ছাপাখানা আবিষ্কারের পিছনে সামাজিক তাগিদটা কী ছিল? সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জন-স্পৃহার তাগিদ। তার আগে ধর্মযাজক পাদরি মোল্লা ও পুরোহিতরা সেটা একচেটিয়া করে রেখেছিলেন। ধর্মই অবশ্য তখন জ্ঞানের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু ধর্ম তখন যাজক ও পুরোহিতদের মুখ থেকে শুনে শিখতে হত। কোনো ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পড়বার অধিকার ছিল না। যাজক ও পুরোহিতদের রক্ষক ও আশ্রয়দাতা পেট্রনরা শুধু পড়বার সুযোগ পেতেন মধ্যে-মধ্যে। তবে তাঁদের সেই সুযোগের বিশেষ দরকার হত না, কারণ মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহরা নিজেরা বিশেষ ধার্মিক ছিলেন না কেউ এবং ধর্মাচরণ করার জন্য উদ্‌গ্রীবও ছিলেন না। ছাপাখানার প্রথম যুগে দেখা যায় যে, ধর্মগ্রন্থই বেশি ছাপা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ধর্মযাজক, পুরোহিত ও তাঁদের পেট্রনরা 'সর্বনাশ হয়ে গেল' বলে হৈ-চৈ করেছেন। সব জেনে ফেলবে লোকে, এই হল তাঁদের আতঙ্ক। এতদিন হাতে-লেখা পুঁথির পাতায় বাইবেল বেদ উপনিষদ গীতা কোরানের বাণী বন্দী হয়ে ছিল। লিপিকররা নিভৃতে পুরোহিতের বা পেট্রনের পক্ষপুটে বসে সেগুলি কপি করতেন এবং পুঁথির মালিকরা সেইসব পুঁথি চালের বাতায়, সিন্দুকে, মন্দিরে, গির্জায় ও মসজিদের কোণে লুকিয়ে রাখতেন। বাইবেলের ব্যাখ্যা যাজকে যা করতেন তাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হত। 'সকলের

পিতা যীশু' কী বলেছেন না-বলেছেন তা বাইবেল পাঠ করে জানবার উপায় ছিল না। মোল্লার মুখেই আল্লার বাণী শুনে নাচতে হত। 'সবই ব্যাদে আছে' বলে পুরোহিতরা যা ব্যাখ্যা করতেন তাই ভক্তিভরে কানে শুনে ঘরে ফিরতে হত। 'গীতা'র ব্যাখ্যা বা টীকা করারও অধিকার ছিল না কারও।

পেট্রন ও পুরোহিত-যাজক-মোল্লা শ্রেণীর এই মনোপলির বিরুদ্ধে বৃহত্তর লোকসমাজে একটা বিক্ষোভ অনেককাল ধরে যে ধূমায়িত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ একটা নিদারুণ অভাব মর্মে-মর্মে অনুভব করছিলেন। জ্ঞানার্জনের সুযোগের অভাব। লিপিকরের লেখা পুঁথিতে সেই অভাব কোনমতেই মিটছিল না। একখানি আসল পুঁথির কত কপি কতজন লিপিকর দিয়ে নকল করানো সম্ভবপর, তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্যেক পাঠক যদি লিপিকর হন নিজে, তাহলে তাঁর নিজের লেখা পুঁথি তিনি নিজে পাঠ করার সুযোগ পেতে পারেন। সুতরাং মুদ্রক ও ছাপাখানা ছাড়া সত্যকারের জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মুদ্রকই জ্ঞানের অধিকার ও শিক্ষার অধিকার সর্বসাধারণের অধিকারে পরিণত করলেন। শত-শত, হাজার-হাজার বই ছেপে প্রকাশ করে অনেক অল্প মূল্যে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করা ও পরিবেশন করা হল। গির্জার গণ্ডি থেকে, মসজিদের কার্নিস থেকে, মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে হাতে-লেখা পুঁথি কারামুক্ত হয়ে যখন মুদ্রিত পুস্তকে পরিণত হল, তখন এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে গেল পৃথিবীতে। ছাপাখানাই হল এই বিপ্লবের অগ্রদূত। যাজক-মোল্লা ও পুরোহিতের দেওয়া ঠুলি চোখে পরে আর জীবন ও সমাজকে দেখতে হবে না। পুরোহিতের মুখে বেদের বা গীতার ব্যাখ্যা শুনে আর নিশ্চিন্ত থাকতে হবে না। সেদিন চলে গেছে, যেদিন থেকে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মুদ্রক বই ছাপতে আরম্ভ করেছেন। পৃথিবীতে অনেক যন্ত্র অনেক বিপ্লব এনেছে, কিন্তু ছাপাখানার মতো এ-রকম যুগান্তকারী বিপ্লব ইতিহাসে আর কোনো যন্ত্র এনেছে কি-না সন্দেহ। কিন্তু এ-হেন মুদ্রাযন্ত্রকেও ইয়োরোপের একদল পণ্ডিত বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলে মনে করেন নি। পণ্ডিতমণ্ডলী বলতে অবশ্য আমি তথাকথিত 'Brain Trust'-এর কথা বলছি।

বড়-বড় ব্রেন নিয়ে কিছুদিন আগে ইয়োরোপে একটি 'ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছিল অনেকেই জানেন। তাঁদের বলা হয়েছিল, ইতিহাসে যে-সব আবিষ্কার বৈপ্লবিক যুগান্তর এনেছে, তাদের নাম করতে। তাঁরা একটি বিরাট তালিকা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ছাপাখানার নাম ছিল না। তাতে অবশ্য 'ব্রেন ট্রাস্ট' যে আসলে কতখানি 'ব্রেনলেস্', সেই কথাই সকলে বুঝেছেন। ছাপাখানা, প্রকাশক ও পুস্তকের ইতিহাস-

রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম মুইর (P. H. Muir) তাঁর *Book-Collecting* বইয়ে এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন[২]

When the Brains Trust was recently asked to name inventions that had most affected the history of the human race, it struck me as odd that, although nearly all the members were authors, not one of them mentioned printing. And yet there are few inventions that have more radically affected the outlook and the daily lives of every one of us, and almost every invention since owes a great deal to printing....

তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অদ্বিতীয় পণ্ডিতরা মধ্যে-মধ্যে অদ্বিতীয় মূর্খদের মতো কথাবার্তা বলেন। তাঁদের অভিমতের জন্য ছাপাখানার ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক গুরুত্ব কমে যায় নি। ছাপাখানা ও মুদ্রক বর্তমানযুগে প্রকাশক বা পাবলিশারের আবির্ভাবের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

Printing was from the beginning a completely mechanical achievement. Not merely that : it was the type for all future instruments of reproduction : for the printed sheet, even before the military uniform, was the first completely standardised product, manufactured in series, and the movable types themselves were the first example of completely standardised and interchangeable parts. Truly a revolutionary invention in every department. — Lewis Mumford.

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে চমৎকার কথা বলেছেন। বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার 'ইউনিফর্মিটি' ও 'স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন।' বাইরে সেনাবাহিনীর সাজসজ্জায় কারখানার পণ্যদ্রব্যের একরকমের স্ট্যাণ্ডার্ড চেহারায়, যন্ত্রসভ্যতার এই রূপ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের আগে যন্ত্রসভ্যতার

২ P. H. Muir: *Book-Collecting*, London, 1945, pp. 81-82

এই ইউনিফর্ম রূপ সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হয় ছাপাখানার মুদ্রিত পৃষ্ঠায়, মুদ্রিত সারিবদ্ধ অক্ষরের মধ্যে।[৩] সেনাবাহিনীর সাজসজ্জায় যান্ত্রিক রূপান্তর তখনও হয় নি। কলকারখানার স্ট্যাণ্ডার্ড একছাঁচের পণ্যদ্রব্য তখনও তৈরি হয় নি। তার আগে মুদ্রণের টাইপ বা অক্ষর তৈরি হয়েছে এবং মুদ্রিত পৃষ্ঠার সুন্দর অক্ষরবিন্যাসের মধ্যে যন্ত্রসভ্যতার ছাঁচেঢালা রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। এইজন্য ছাপাখানাকে বাস্তবিকই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অগ্রদূত বলা যায়। মুদ্রকের চোখেই প্রথম বর্তমান সভ্যতার আসল রূপটি ভেসে ওঠে, যখন তিনি প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার কোনো ছোট ছাপাখানায় বসে একটি পৃষ্ঠায় টাইপ সেট করেছিলেন এবং মুদ্রণযন্ত্রে সেটি ছাপিয়ে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছিলেন। হাতেলেখা পুঁথিরও একটা সুদৃশ্য রূপবিন্যাস আছে। বিশেষ করে যে লিপিকররা পুঁথিলেখা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন তাঁদের লেখা বেশ সুদৃশ্য। কিন্তু তবু হাতের লেখার তারতম্য থাকতে বাধ্য এবং হাতে লেখা দুটি অক্ষরের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। যন্ত্রের লেখা অর্থাৎ ছাপা আর পাণ্ডুলিপির ইউনিফর্মিটি এক নয়। অক্ষরের ছাঁদ, অক্ষরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা 'পয়েন্ট' সর্বাঙ্গসুন্দর পাণ্ডুলিপিতেও একরকম হয় না, হতে পারে না।

এ-হেন ছাপাখানার বৈপ্লবিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে যদি 'ব্রেন ট্রাস্টে'র সভ্যরা ভুলে যান, তাহলে সেটা আফশোসের কথা। মুইর সাহেব দুঃখ করে লিখেছেন যে, অধিকাংশ সভ্য নিজেরা লেখক হওয়া সত্ত্বেও ছাপাখানার কথা উল্লেখ করেন নি। দুঃখের কথা ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লেখকরা সব দেশেরই প্রায় সমান দেখা যায়। লেখকদের কৌলীন্যবোধ এত উগ্র যে তাঁরা মুদ্রকদের মনে-মনে অবজ্ঞা করেন এবং তাঁদের পেট্রন-প্রকাশকদেরও অর্থলোলুপ ব্যবসাদার ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। এমন অনেক লেখক আজও আছেন, রীতিমত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু গ্রন্থের লেখক, যিনি বই কি করে ছাপা হয় জানেন না। আমাদের দেশে তো আছেনই, ওদেশেও দু'চারজন নেই যে তা নয়। বই লেখা লেখকের কর্তব্য, তিনি পাণ্ডুলিপির মালিক, কিন্তু মুদ্রিত বইয়ের মালিক যেহেতু প্রকাশক, সেইহেতু বই ছাপার সমস্ত দায়িত্ব প্রকাশকের উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। কি ছাপা হল, কেমন করে ছাপা হল তা জানবার দরকার হয় না তাঁর। এমন লেখকও দেখেছি, যিনি তাঁর নিজেরই ছাপা বই কোনদিন আর পড়বার প্রয়োজনবোধ করেন নি। অসংখ্য ছাপার ভুলের কথা, এমন কি পাণ্ডুলিপির দু'একপৃষ্ঠা বা অনুচ্ছেদ বাদ চলে যাওয়ার কথাও তিনি অনেক সময় জানেন না,

৩ Lewis Mumford : *Technics and Civilisation*, London, 1934, p. 135

জানতেও পারেন না। ছাপাখানার টাইপ, বিভিন্ন টাইপের নাম বা 'পয়েণ্ট' ইত্যাদি সম্বন্ধে চলনসই ধারণা আছে, এ-রকম লেখকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। ছাপানো অক্ষর কি করে সংশোধন করতে হয় বা কিভাবে 'প্রুফ' দেখতে হয়, তাও বহু লেখকের জানা নেই। ছাপানোর টেকনিকের কথা না তোলাই ভাল। কি করে ভাল ছাপা হয়, দু'তিনরকমের রঙিন কালিতে ছাপা হয়, ছবি ছাপা হয়, ব্লক করা হয়, 'ষ্টিরিও' বা 'ম্যাট' করে লক্ষ-লক্ষ কপি ছাপা হয়, এত সব কথা লেখকদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা দিশাহারা হয়ে বলবেন, 'আমরা প্রিণ্টার নই, পাবলিশারও নই, লেখক। ওসব ব্যাপার আমাদের জানার দরকার নেই।' এই যখন লেখকদের অবস্থা তখন 'ব্রেন ট্রাস্টের' লেখকসদস্যরাও যে ছাপাখানার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করবেন না, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছাপাখানা কি বস্তু তাই যখন তাঁরা জানেন না, তখন তার গুরুত্ব বুঝবেন কি করে? অধিকাংশ লেখকদের কাছে ছাপাখানাও যা, মুদিখানাও তাই। অন্তত সেদিন পর্যন্ত তাই ছিল।

লেখকরা অনেকে ছাপাখানার ইতিহাস জানেন না বলে ছাপাখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কমে যায় নি। এখানে অবশ্য সে ইতিহাস আলোচনা করব না। তবু টমাস কার্টার তাঁর *The Invention of Printing in China and its Spread Westward* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ছাপাখানার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের যে তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছেন, তা থেকে সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত না করে পারছি না। কার্টার বলেছেন[৪]

> Of all the world's great inventions that of printing is the most cosmopolitan and international. China invented paper and first experimented with block-printing and movable type. Japan produced the earliest block prints that are now extant. Korea first printed with type of metal, cast from a mould. India furnished the language and religion of the earliest block prints.

এই কথা বলে কার্টার বলেছেন যে, আরবরা কাগজ তৈরির ব্যাপার চীন থেকে ইয়োরোপে নিয়ে যায়। ইয়োরোপে ফ্লোরেন্স ও ইটালিতে প্রথম কাগজ তৈরি হয়। ব্লক প্রিণ্টিং ইয়োরোপে প্রথম হয় রুশিয়ায় এবং ইটালিতে—হল্যাণ্ড ফ্রান্স ও জার্মানি প্রথমে টাইপ

৪ Lewis Mumford: ঐ, ১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

নিয়ে পরীক্ষা করে। জার্মানিতেই পরীক্ষা কৃতকার্য হয় এবং জার্মানি থেকেই টাইপে ছাপার রীতি সারা ইয়োরোপময় ছড়িয়ে পড়ে।

আজকের এই কাগজ-সভ্যতার দিনে, চারিদিকের কাগজের স্তূপের মধ্যে বসে, আমরা কাগজের মূল্য কি তা উপলব্ধি করতে পারি না। এক বিচিত্র কাগজের সভ্যতা আমরা সৃষ্টি করেছি। তাই কাগজের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা নিশ্চিন্তে ভুলে গেছি। শুধু ছাপাখানার জন্য জ্ঞানজগতের বিপ্লব সম্ভব হত না, যদি কাগজ না থাকত। মানুষের মুখোমুখী দেখা না হলে কোনো ভাবের আদান-প্রদান যখন সম্ভব ছিল না, তখন কাগজের আবিষ্কর্তা সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। কাগজের উপর লিখে মনের কথা অন্যকে জানানো যায়। 'স্মৃতি' ও 'প্রথা'র বদলে কাগজে লেখা 'ডকুমেন্টে'র ও 'রেকর্ডের' যুগ এল। ফিউডালযুগের সবচেয়ে মজবুত স্তম্ভটি তার ফলে অনেকটা শিথিল হয়ে গেল। বাকি যেটুকু ছিল তা মুদ্রক এসে অপসারিত করে দিলেন। কাগজের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাটি সুন্দর ভাষায় মামফোর্ড ব্যাখ্যা করেছেন[৫]

> Paper removed the necessity for face to face contact : debts, deeds, contracts, news, were all committed to paper, so that while feudal society existed by virtue of customs that were rigorously maintained from generation to generation, the last elements of feudal society were abolished in England by the simple device of asking peasants who had always had a customary share in the common lands for some documentary proof that they had ever owned it. Custom and memory now played second fiddle to the written word : reality meant 'established on paper' A paper world came into existence, and putting a thing on paper became the first stage in thought and action : unfortunately also often the last.

এত সুন্দর ভাষায় কাগজের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আর কেউ ব্যাখ্যা করেছেন কি-না আমার জানা নেই। কাগজ ও মুদ্রণের আবিষ্কারের জন্যই জ্ঞানজগতের বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। ধীরে-ধীরে তার ফলে একটা সামাজিক বিপ্লবের পথও সুগম হয়েছে।

৫ Mumford : ঐ, ১৩৭ পৃষ্ঠা

ছাপাখানার আগে লিপিকররা পাণ্ডুলিপি নকল করতেন এবং শিল্পীরা তার রূপসজ্জা করতেন। তার খরচ পড়ত অনেক বেশি। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের যাজক চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মসংহিতা কিনেছিলেন, হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি। তার মূল্য ছিল ৩৫ পাউণ্ড। বর্তমান পাউণ্ডের অর্থমূল্যে প্রায় ৫০০ পাউণ্ডের সমান। ৩৫ পাউণ্ডের মধ্যে চিত্রকরদের রূপায়নের জন্য মজুরী দিতে হয়েছিল ২২ পাউণ্ড এবং লিপিকরদের নকল করার জন্য ১৩ পাউণ্ড। আমাদের বাংলা দেশেও যে পুঁথি নকল করার পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশি ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা রেভারেণ্ড ওয়ার্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা উল্লেখ করে গেছেন। বত্রিশ হাজার অক্ষর নকল করার মজুরী ছিল প্রায় এক টাকা। তাহলে মহাভারত কি রামায়ণের মতো বিশাল গ্রন্থ নকল করতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়া সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়। এসিয়াটিক সোসাইটির (বাংলা দেশের) ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের কার্যবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তখন কপি করার হার ছিল প্রতি হাজার শ্লোক চার টাকা। এই পারিশ্রমিকের কথা সেকালের অনেক পুঁথিতে লিপিকররা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন ১১২৪ বঙ্গাব্দে নকল-করা মহাভারতের কোনো লিপিকর লিখেছেন[৬]

ইহার দক্ষিণা সামান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হইয়া সশ্রদ্ধা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল।

প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা। লিপিকররা তখন নগদ দক্ষিণা ও ভাতা তো পেতেনই, সারাজীবনের জন্য বৃত্তিও পেতেন। লিপিকর দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার ১১৩৫ সনে চারকাণ্ড রামায়ণ নকল করে কিরকম পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথির শেষে লিপিবদ্ধ করে গেছেন[৭]

সেইমত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে।
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে॥
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা।
সেইমত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা॥
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার।
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্মকার॥

৬ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠার টীকা

৭ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: ৫৭ বর্ষ

কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া।
পুস্তকসাজতে বাবু দিবেন বস্ত্র যোয়া॥
আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুষি।
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি॥
বালিট্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ।
চারিকাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ "চিত্তরঞ্জন সংগ্রহ" পুঁথি ৩০৩)

সভাকবিরা যেমন রাজার গুণগান করা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন, লিপিকররাও তেমনি পুঁথির মালিকের গুণগান বা মঙ্গল কামনা না করে পুঁথি নকল করতেন না। পেট্রনের যুগে পেট্রন ছাড়া একপাও নড়বার উপায় ছিল না। কবির কাব্যরচনা যেমন পেট্রনের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই কাব্যের পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্যও লিপিকরদের তেমনি ধনী ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। মুদ্রকের যুগে তা হয় না। মুদ্রক ও লিপিকরের সামাজিক অবস্থার মধ্যে আকাশ-মাটি ব্যবধান। লিপিকরের নিজেদের এইসব স্বীকারোক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, লিপিকররা সকলে প্রায় সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিদের অনুগ্রহজীবী ছিলেন। ধনীরা পুঁথি নিজেরা সংগ্রহ করতেন অন্যান্য নানাজিনিসের মতো, অথবা পুণ্য অর্জনের জন্য পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের দানও করতেন। তার জন্য তাঁরা অর্থ ব্যয় করে পুঁথি নকল করাতেন এবং লিপিকর নিয়োগ করতেন। সাধারণ লোকের দ্বারা পুঁথি নকল করানো বা লিপিকর নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। পুঁথির যুগে লিপিকর ও পেট্রনের যুগে পাঠকগোষ্ঠী বলে বিশেষ কিছু ছিল না। একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। দু'একজন ধনী জমিদার বা ব্যবসাদার যাঁরা লিপিকর রেখে পুঁথি কপি করাতেন, তাঁদের জ্ঞানার্জনস্পৃহার চেয়ে পুণ্যার্জনস্পৃহাই প্রবল ছিল। বিদ্যার চর্চা বা শিক্ষার প্রসার হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে কখনো হতে পারে না। মুষ্টিমেয় রাজপুত্র বা জমিদারনন্দন কয়েকজন গুরুগৃহে বা আশ্রমে থেকে যে বিদ্যাভ্যাস করতেন, তাকে ফলাও করে সেকালের শিক্ষার মাহাত্ম্য বা ব্যাপকতা প্রচার করা হাস্যকর। বৌদ্ধযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাসও তাই। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র বা সামন্তনন্দন ছাড়া কোনো বিদ্যালয়েই কারও স্থান হত না। তার অন্যতম কারণ, পণ্ডিতরাই বিদ্যার ব্যাপক প্রসারের বিরোধী ছিলেন। সমস্ত জ্ঞানবিদ্যাকে তাঁরা নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চাইতেন এবং পাণ্ডুলিপির যুগে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। ছাপাখানার যুগে জ্ঞানবিদ্যাকে কোনো সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হল না। তাই ছাপাখানার বিরুদ্ধে সেকালের ধনিক ও পণ্ডিত-পুরোহিত অনেকেই বিষোদ্গার করেছেন দেখা যায়।

প্রকাশক বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, তা হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির যুগে ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। পেশাদার লিপিকরদের মধ্যে এমন অনেকে হয়ত ছিলেন, যাঁরা নিজেরা কালি-কাগজ সংগ্রহ করে, একাধিক পুঁথি নকল করে, বাজারে-বাজারে ও মেলায়-মেলায় ঘুরে বিক্রি করতেন। কয়েকজন লিপিকর মিলিত হয়ে একটি 'গিল্ড' জাতীয় কিছু গঠন করে, হাতেলেখা পুঁথির ব্যবসা যে করতেন না এমন কথা বলা যায় না। মেলায়-মেলায় ঘুরে এই জাতীয় পুঁথি সাজিয়ে বিক্রি করাও আশ্চর্য নয়। কল্পনার রঙ চড়িয়ে এরকম পুঁথির দোকানের কথাও ভাবা যেতে পারে। কিন্তু অতদূর হয়ত কল্পনা করা সঙ্গত হবে না। কারণ বিক্রির প্রশ্ন ওঠে চাহিদা বা 'ডিমাণ্ড' থেকে। লিপিকররা ব্যক্তিগতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পুঁথির ব্যবসা করতে পারতেন, যদি পুঁথি পড়ার লোক থাকত সমাজে এবং পুঁথির চাহিদা থাকত। মাত্র একশো বছর আগেও যেদেশে শতকরা একজন লোকেরও অক্ষর পরিচয় ছিল না, সেদেশে পুঁথির যুগে যে পাঠকসংখ্যা কিরকম ছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। পুঁথি পড়ার আগ্রহ এবং কিনে পড়ার আগ্রহ একলক্ষের মধ্যেও একজনের ছিল কি-না সন্দেহ। ছাপাখানা ও প্রকাশকের যুগে সেদিন পর্যন্ত বই পড়ার আগ্রহই বা ক'জনের ছিল? সুতরাং পুঁথির ব্যবসাদার পাণ্ডুলিপির যুগে 'থিয়োরেটিকালি' থাকা সম্ভব হলেও 'প্রাকটিকালি' ছিল কি-না সন্দেহ। তবু 'থিয়োরেটিকালি'ই এই পুঁথির ব্যবসাদার ও লিপিকর ব্যবসায়ীদেরই আধুনিক প্রকাশকদের পূর্বপুরুষ বলা যায়।*

কিন্তু আধুনিক প্রকাশকরা সত্যিই এক বৈপ্লবিক যুগের প্রবর্তক। তাঁদের সঙ্গে সেকালের পুঁথি-বিক্রেতা বা লিপিকর ব্যবসায়ীদের কোনো তুলনাই হয় না। আধুনিক প্রকাশকদের ইতিহাস খুব বেশি হলেও তিনশো কি সাড়ে-তিনশো বছরের ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সেই ইতিহাসের সূচনা, প্রকাশকযুগের বৈপ্লবিক ইতিহাসের। মুইর সেইজন্যই বলেছেন[৮]

> But the greatest revolution in book history in the Seventeenth Century, the one entirely new feature that was to affect it fundamentally, was the emergence of the publisher.

* বিনয় ঘোষ: কলকাতা কালচার, 'পাণ্ডুলিপির রোমান্স' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮ *Book Collecting*, p. 88

বইয়ের ইতিহাসে প্রকাশকরা হলেন মুদ্রকদের অনুগামী। মুদ্রকরা অন্তত আরও দুশো বছর আগে (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, প্রকাশকরা সেই বিপ্লবকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন। বিপ্লবটা জ্ঞানজগতের ও গ্রন্থজগতের বিপ্লব।

তৃতীয় প্রস্তাব

> To the reader of our histories of literature it might well seem as if the works with which they deal automatically gained the eye and the ear of the public, as if they took the place in public opinion that was due to them as a matter of course, much as the heir ascends the throne. But the cases in which a man has awakened one morning to find himself famous are few and far between. The mere admission for the first time past the guards at the entrance to the temple of literary fame is dependent on definite conditions. Such guards are theatrical directors and the publishers.
>
> – Schucking.

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং প্রকাশকদের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: 'সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা পড়েন তাঁরা হয়ত মনে করেন যে, সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থ সাধারণের দৃষ্টিগোচর ও কর্ণগোচর হয়েছে আপনা থেকেই। সাধারণ পাঠকের কাছে সেইসব রচনা নিজগুণেই প্রশংসা অর্জন করেছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্রাটের উত্তরাধিকারী যেমন স্বাভাবিকভাবেই সিংহাসনে বসেন, তেমনি লেখকের রচনাও নিজস্ব গুণে খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু সত্যকার ইতিহাস বাস্তবিক তা নয়। হঠাৎ একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজেকে স্বনামধন্য বলে আবিষ্কার করেছেন, এরকম ভাগ্যবান কেউ কোনদিন ছিলেন কিনা সন্দেহ। সাহিত্যিক খ্যাতির মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে দ্বারপথের প্রহরীর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়, তা তিনি যত বড় প্রতিভাবানই হন না কেন। এই দ্বারপথের প্রহরীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন থিয়েটারের পরিচালকরা এবং প্রকাশকরা।'[১]

১ Schucking: *The Sociology of Literary Taste*, p. 42

স্ক্রশ্কিঙের এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল ফোটে বলে, দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে 'প্রতিভার' বিকাশ হয়, একথা যাঁরা বলেন তাঁদের কথার দার্শনিক মূল্য যাই থাকুক, ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ নেই। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও যাঁরা প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন সাহিত্যের ইতিহাসে, সুস্থ ও অনুকূল পরিবেশে মানুষ হলে তাঁরা আরও কত বেশি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন, সেকথা সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক ঐতিহাসিকদের বিবেচ্য নয়। একশ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁরা প্রতিভার অঙ্কুরে রসসঞ্চার করে বলে, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার রোমান্স রচনা করতে ভালবাসেন। তাঁরা জীবনের দার্শনিক নন, মৃত্যুর বিকারগ্রস্ত দার্শনিক। আমরা যে-সব সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থ পড়ি তা কেবল 'সাহিত্যের' ইতিহাস, 'সাহিত্যিকের' ইতিহাস নয়, অথবা 'গ্রন্থেরও' ইতিহাস নয়। সাহিত্যিকের জীবনেতিহাস এবং তাঁর গ্রন্থ-রচনার ও গ্রন্থ-প্রকাশের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য হওয়া উচিত। তা হয় না বলে অধিকাংশ সাহিত্যের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয় না। একজন বিরাট প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক প্রথম জীবনে কিভাবে সাহিত্যের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পান, কেমন করে ধীরে-ধীরে অথবা হঠাৎ লাফ দিয়ে-দিয়ে খ্যাতির ও স্বীকৃতির সোপানগুলি উত্তীর্ণ হয়ে যান, তার ইতিহাস বাদ দিয়ে কেবল গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করে সারগর্ভ নিবন্ধ রচনা করলে ইতিহাস লেখা হয় না। অথচ সাহিত্যের ইতিহাস আজ পর্যন্ত সেইভাবেই লেখা হয়েছে, তাই তার মধ্যে প্রাণহীন অবাস্তব কৃত্রিমতার গন্ধ যত বেশি পাওয়া যায়, বাস্তবতার স্পর্শ বা প্রাণের স্পন্দন তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না।

কোনো সাহিত্যিককে যদি তাঁর সাহিত্যজীবনের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে তিনি যে ইতিহাস বলবেন, তা হল প্রকাশকের ইতিহাস অথবা থিয়েটারের পরিচালকের ইতিহাস। কেন বলবেন? যিনি কবিতা উপন্যাস ইতিহাস দর্শন সমালোচনা ইত্যাদি রচনা করেন, তিনি প্রধানত প্রকাশকের কাহিনী বলবেন এবং যিনি নাট্যকার, তিনি বলবেন মঞ্চ-পরিচালকের কাহিনী। কারণ প্রকাশকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না পেলে কবি ও সাহিত্যিকরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতেন। প্রকাশকই তাঁদের গ্রন্থ নির্বাচন করে প্রকাশ করেন এবং বাইরের বৃহত্তর পাঠক-সমাজের কাছে বিচারের জন্য পৌঁছে দেন। খ্যাতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা লেখকের পক্ষে তার পরেই সম্ভব হয়, তার আগে নয়। তার আগে, অর্থাৎ প্রকাশকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হওয়ার আগে পর্যন্ত লেখকরা পাণ্ডুলিপির অন্ধকার রাজ্যেই বাস করেন। তবু তাকে আসল পাণ্ডুলিপির যুগের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ পাণ্ডুলিপির যুগে

পেট্রনরা ছিলেন, তাঁদের রাজসভা ছিল এবং সভাকবিরা তখন রাজসভায় অন্তত সম্মান পেতেন। খ্যাতি তখন রাজসভার বাইরে রাজার অনুগ্রহের জোরে কিছুটা অন্তত জনসভায় ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেত। সেটা ছিল দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজা ও নিরীহ প্রজার যুগ। রাজা ছিলেন সাহিত্যের প্রধান পেট্রন। সুতরাং সভাকবিরা সেই রাজপোষকতার জোরেই কিছুটা খ্যাতি অর্জন করতেন। যে-যুগে রাজার বদলে প্রকাশক পেট্রন হলেন, সে-যুগের সামাজিক রূপ অন্যরকম হয়ে গেল। সভাকবি হবার সুযোগ আর রইল না, এবং রাজা-রাজড়ার অনুগ্রহলাভেই খ্যাতির পথ পরিষ্কার হল না। অনুগ্রহ এখন প্রকাশকের কাছ থেকেই লাভ করতে হবে। অনুগ্রহই বলা চলে, কারণ সাহিত্যিকের প্রথম জীবনে কোনো লোকখ্যাতি যখন থাকে না, প্রকাশকের তরফ থেকেও তখন সেই খ্যাতির বেসাতি করে অর্থোপার্জন করার সুযোগ থাকে না। সুতরাং প্রকাশক লেখকের দ্বারস্থ হন না, লেখকরাই প্রকাশকের দ্বারস্থ হন। সাহিত্যের পণ্য তাঁরা প্রকাশকের দরজায়-দরজায় ফিরি করে বেড়ান। প্রকাশকদের যদি অনুগ্রহ হয় তাহলে দরদস্তুর করে তাঁরা তা কেনেন এবং প্রকাশ করেন। যেমন পণ্য, অর্থাৎ বাজারে যেমন তার চাহিদা ও কাটতি, তেমনি তার দাম। এইভাবে প্রকাশক যখন বই প্রকাশ করেন, লেখকও তখন অজ্ঞাত অখ্যাত পাণ্ডুলিপির জগৎ থেকে বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রিণ্টার ও প্রকাশক ভিন্ন বর্তমান যুগে লেখকের আত্মপ্রকাশের কোনো সুযোগ বা পন্থা নেই এবং আত্মপ্রকাশ ভিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি অর্জন সম্ভবপর নয়। আধুনিক ধনিক বণিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগে রাজসভা নেই, ড্রয়িংরুম আছে, আর আছে কফিহাউস সঙ্ঘ সমিতি ইত্যাদি। ড্রয়িংরুমের গুঞ্জন, পোষকতা বা স্তাবকতা যতই অভিজাত হোক না কেন, 'এলিটগন্ধী' হোক না কেন, তার কোনো মূল্য নেই বাইরের লোকসমাজে। সেখানে মূল্য পেতে হলে পাঠকের কাছে যাচাইয়ের জন্য উপস্থিত হতে হবে। উপস্থিত হতে হলে প্রকাশকের অথবা মঞ্চাধ্যক্ষের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই। গুশ্‌কিঙের কথার তাৎপর্য তাই।

একথা অস্বীকার করবেন, এমন কোনো লেখক বা পাঠক নেই বলেই মনে হয়। এ-যুগের পেট্রন যে প্রকাশক, একথা স্বীকার না করার অর্থ, সাহিত্যের ইতিহাসকে অস্বীকার করা। প্রকাশকের পোষকতা ভিন্ন এ যুগের লোকসমাজে বা পাঠকসমাজে স্বীকৃতিলাভের কোনো উপায় নেই। প্রকাশকরা প্রধানত যে ব্যবসায়ী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যবসায়েরও তারতম্য আছে, ইতরবিশেষ আছে। মুদিখানার দোকান চালান যিনি তিনিও ব্যবসায়ী। বইয়ের দোকান চালান যিনি তিনিও ব্যবসায়ী। মূল উদ্দেশ্য যে মুনাফালাভ, তা উভয়েরই এক। সাধারণ ব্যবসায়ীর মতো নিছক ব্যবসায়ী-প্রকাশক

যে নেই তা নয়, অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন প্রকাশক থাকেন যাঁরা গ্রন্থ-নির্বাচনের জন্য প্রকাশনক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। কেউ কাব্যগ্রন্থে, কেউ গল্প-উপন্যাসে, কেউ দর্শন-ইতিহাস-সমালোচনায়, সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। গ্রন্থ নির্বাচনে তাঁরা যে নিরপেক্ষ সাহিত্যিক. সুবিচারবোধ ও সুরুচির পরিচয় দেন, তাতে তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রমে-ক্রমে পাঠকদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে এবং সমালোচকের প্রশস্তির লেবেল আঁটার তাঁদের প্রয়োজন হয় না। প্রকাশকরাই অনেকটা সমালোচকের কাজ করেন। এই শ্রেণীর প্রকাশকদের সাহিত্যক্ষেত্রে ও পাঠক-সমাজে রীতিমত প্রতিপত্তি থাকে, কারণ তাঁরা শুধু ব্যবসায়ী বলে নন, সাহিত্যের বিচারক বলেও লোকসমাজে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শুশ্‌কিং এই কথাটি পরিষ্কার করে বলেছেন

> Historically regarded, the publisher begins to play a part at the stage at which the patron disappears, in the eighteenth century. Who could conceive the English literature of that century without a Dodsley, or the German of the following century without a Cotta ? Such publishing firms gradually become a sort of authority.[১০]

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বলা চলে, পেট্রনরা যখন অন্তর্ধান করলেন তখন প্রকাশকদের আবির্ভাব হল সাহিত্যক্ষেত্রে এবং প্রকাশকরাই পেট্রনদের স্থান দখল করলেন। ডড্‌সলের মতো প্রকাশক না থাকলে ইংরেজি সাহিত্যের অবস্থা তখন কি হত বলা যায় না। আর কোট্টার মতো প্রকাশক না থাকলে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসও হয়ত অন্যরকম হত। শুশ্‌কিং ইংরেজি সাহিত্য প্রসঙ্গে ডড্‌সলে এবং জার্মান সাহিত্য প্রসঙ্গে কোট্টার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, Such publishing firms gradually become a sort of authority. এইধরনের প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানই ধীরে-ধীরে সাহিত্যের 'বিচারক' বলে গণ্য হয়। কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন জার্মান প্রকাশক 'কোট্টার' কথাই বলা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান প্রকাশকদের মধ্যে 'কোট্টার' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোট্টার বৈশিষ্ট্য ছিল 'ক্লাসিক' গ্রন্থ প্রকাশে। এই বিশিষ্টতা এমনভাবে কোট্টা অর্জন করেছিল যে, প্রত্যেক 'ক্লাসিক' লেখক কোট্টা থেকে বই প্রকাশ করতে চাইতেন। যত বড় লেখকই হন না কেন,

১০ শুশ্‌কিং : ঐ, ৪২ পৃষ্ঠা

অন্তত একখানা বই কোট্টার শীলমোহরসহ প্রকাশিত না হলে তিনি পাঠকগোষ্ঠীর কাছে যোগ্য মর্যাদা পেতেন না এবং তাঁর নিজেরও বাসনা চরিতার্থ হত না। এইরকম সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল কোট্টার এবং পাঠকদের বিশ্বাস ছিল কোট্টার উপর অগাধ। গ্রন্থ সুনির্বাচনের জন্য এবং সেই নির্বাচনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোট্টা এই খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করেছিল।

এ-রকম প্রকাশকের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম, আমাদের দেশে একেবারে নগণ্য বলা চলে। ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রকাশকরা দীর্ঘকাল কোনো আদর্শ বা নির্বাচন-পদ্ধতির ধারা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন না। তবু দেখা যায়, এই ব্যবসা ও মুনাফার যুগেও যে-সব প্রকাশকের নিজেদের একটা প্রকাশন-নীতি, আদর্শ বা মতামত আছে, তাঁরা পাঠক-সমাজের একটা বিশেষ অংশের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। একালের রাজনৈতিক গ্রন্থের অথবা বিশেষ ভাবাদর্শের প্রকাশকরা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। দু'চারজন তথাকথিত 'অভিজাত' প্রকাশকও পাঠকগোষ্ঠীর একাংশের উপর এইরকম প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। ডুশ্‌কিং তাই বলেছেন[১১]

> Publishers with pronounced views of their own still exert real influence over the taste of the day. Past successes have brought these latter firms into the confidence of the public, which in taking new works from them feels a certain guarantee of their literary merit.

এই প্রকাশকদের প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক বলা যায়। এই প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকরা তাঁদের গ্রন্থনির্বাচনের অতীত সাফল্যের জন্য ক্রমে পাঠক-সমাজের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। প্রতিষ্ঠান হলেও এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পাঠক ও লেখক উভয়েরই কাছ থেকে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা পান। সেটা সাহিত্য-বিচারকের মর্যাদা। আমাদের বাংলা দেশে এই শ্রেণীর প্রকাশক সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন বলা চলে। যতদিন না এই জাতীয় প্রকাশকের সংখ্যা বাড়বে, ততদিন বাংলা সাহিত্যের যুগোপযোগী সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রসার ও প্রচার সম্ভব হবে না। তার কারণ, পাঠক ও লেখকরা মনে করেন যে, এইসব প্রকাশকের সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি আছে এবং তাঁরা যে-সব বই প্রকাশ করেন তারও একটা ন্যূনতম সাহিত্যিক মূল্য আছে। এইজন্য এই শ্রেণীর প্রকাশকরা একেবারে নতুন শক্তিশালী লেখকদের বই প্রকাশ করতে পারেন

১১ ডুশ্‌কিং: ঐ, ৪৩ পৃষ্ঠা

এবং করলে নতুন লেখকরাও সহজে পাঠকসমাজে পরিচিত হন ও স্বীকৃতি পান। অর্থাৎ প্রকাশকের সাহিত্যিক মর্যাদা ও খ্যাতি নতুন লেখকরা লাভ করে নিজেরা খ্যাতিমান হন, অন্তত খ্যাত হবার সুযোগ পান। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশকদের এই দান নিশ্চয় স্মরণীয়। কোনো সাহিত্যের ইতিহাসই প্রকাশকদের এই ইতিহাস বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বই-প্রকাশের আদিপর্ব

প্রথম প্রস্তাব

Ten ordinary histories of Kings and Courtiers were well exchanged against the tenth part of one good history of Booksellers.
—Carlyle.

পাণ্ডুলিপির যুগের প্রাচীন পুঁথির 'কোলোফোন' এবং ছাপাখানার যুগের ছাপা বইয়ের টাইটেল-পৃষ্ঠার উদ্দেশ্য একই। আধুনিক যুগের টাইটেল-পৃষ্ঠার আবির্ভাব হয় ১৪৭০ সালে সর্বপ্রথম, অর্থাৎ পাঁচশো বছর আগে। তারপর বইয়ের পাতার (leaf) নম্বর ও পৃষ্ঠার (page) নম্বর ছাপা হয়। বড়-বড় ফোলিও আকারের ছাপা বই আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন বইয়ের আকার ধারণ করে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে। সর্বক্ষণ ব্যবহারের উপযোগী ক্ষুদ্রাকারের বই ছাপানো ও প্রকাশ করা সম্ভব হয় প্রধানত ছাপার হরফ সংস্কারের ফলে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে মুদ্রকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়!

এই কারণে ষোড়শ শতাব্দীকে প্রধানত মুদ্রকের যুগ বলা যায়। 'প্রকাশক' বলতে আমরা আজকাল যা-বুঝি তখনও তার আবির্ভাব হয় নি। আধুনিকযুগের মুদ্রক ও প্রকাশক সাধারণত এক ব্যক্তি নন। মুদ্রক বলে ছাপা বইয়ে আজকাল যাঁদের নাম থাকে, টাইটেল-পৃষ্ঠার পিছনে, তাঁরা অধিকাংশই আবার ছাপাখানার মালিক নন, মজুর মাত্র। ছাপাখানার মালিক, মুদ্রক ও প্রকাশকের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীকালে। প্রকাশন ও মুদ্রণের প্রথমযুগে এ-রকম কোনো ব্যবধান বিশেষ ছিল না। যিনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করতেন তিনিই মুদ্রক হতেন এবং এই মুদ্রকরাই ছিলেন প্রথম-যুগের প্রকাশক। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রক ও প্রকাশকের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরে। যিনি ছাপাখানার কাজ করেন, কাজ বোঝেন এবং ছাপাই যাঁর ব্যবসা, তিনি মুদ্রক। প্রকাশক কেবল বই-প্রকাশের ব্যবসা করেন এবং তার জন্য খরচ দিয়ে প্রেস থেকে বই ছাপিয়ে নেন। আধুনিকযুগে মুদ্রকও ব্যবসায়ী এবং প্রকাশকও ব্যবসায়ী। দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, এবং দু'জনেই স্বতন্ত্রভাবে বড় ব্যবসায়ী হতে পারেন। তবে অনেক বড়-বড় প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের নিজেদের ছাপাখানা

থাকে। সেখানেও 'মুদ্রক' বলে যাঁর নাম থাকে তিনি প্রিন্টার মাত্র। 'প্রকাশক' বলে নাম থাকে অন্যের। প্রকাশকরা ব্যবসায়ীশ্রেণী হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কৌলীন্য বজায় রাখতে বেশ সচেতন বলেই মনে হয়। আর্থিক স্বার্থ ছাড়াও এই মনোভাবের সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বার্থও যে জড়িত আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বড়-বড় প্রকাশকদের মতো বড়-বড় মুদ্রকরাও তাঁদের বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক বিশেষত্ব স্বতন্ত্রভাবে বজায় রাখতে চান। আধুনিক ফিনান্স ক্যাপিটালিজম ও টেকনোলজির যুগে এই বাণিজ্যিক শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক পরিণতি। যুগশক্তির প্রভাবে প্রকাশক ও মুদ্রক একসঙ্গে ইতিহাসের রাজপথে যাত্রা করেও পরে দুই পথে দু'জন এগিয়ে গেছেন। একজন (প্রকাশক) গেছেন 'কালচারের' পথে, অন্তত সেই ধারণা নিয়ে, আর-একজন (মুদ্রক) গেছেন 'টেকনিকের' পথে। দু'জনেই মূলত ব্যবসাদার, তবে একজনের মনে 'কালচারাল' আভিজাত্যের ভাব, আর-একজনের মনে 'টেকনিক্যাল' আভিজাত্যের।

জার্মানিতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন যিনি, তাঁর নাম উইলিয়ম ক্যাক্সটন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ছাপাখানায় ছাপা আরম্ভ হয় জার্মানিতে। ক্যাক্সটন প্রথমে ইয়োরোপেই ছাপাখানার কাজ শেখেন, কলোনে। ১৪৭২ সালে তিনি কলোন থেকে একখানি বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে সাহায্য করেন। তারপর ইংলণ্ডে এসে ১৪৭৬ সালে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডে ছাপাখানার প্রবর্তক বলে ক্যাক্সটনের নামই স্মরণীয় হয়ে আছে।

ক্যাক্সটন পেশাদার লিপিকরও ছিলেন না, হিউম্যানিস্টও ছিলেন না। অথচ সমসাময়িক সাহিত্যিক রুচি সম্বন্ধে তাঁর বেশ চেতনা ও জ্ঞান ছিল। বই ছাপানোর খেয়াল তাঁর মাথায় আসে যখন তিনি ফ্ল্যাণ্ডার্সে ছিলেন তখন। ইংলণ্ডে এসে যেখানে তিনি প্রথম ছাপাখানা করেন, সেই স্থানটিও উল্লেখযোগ্য। ক্যাক্সটন প্রথমে একটি গির্জার সীমানার মধ্যেই তাঁর ছাপাখানা গড়ে তোলেন। গির্জার নাম 'ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে।' পেট্রনদের যুগ অস্তাচলে গেলেও তখনও পেট্রনরা সাহিত্যের অভিজাত মঞ্চ থেকে একেবারে পর্দার অন্তরালে চলে যান নি। লিপিকর-মুদ্রক, পেট্রন-প্রকাশকের যুগসন্ধিক্ষণের গোধূলি অন্ধকারে তখনও তাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চে আনাগোনা করছিলেন এবং হোমরা-চোমরা লর্ডদের মতো রীতিমত থিয়েটারী ভঙ্গিতে। ছাপাখানার প্রথমযুগেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই পেট্রনরূপে অবতীর্ণ হলেন। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে ইতিহাসের যোগসূত্র ও প্রবাহ এইভাবেই অবিচ্ছিন্ন থাকে।

ক্যাক্সটন যখন গির্জা-প্রাঙ্গণে ইংলণ্ডের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং পুঁথি-পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এল, তখন

তিনিও সেকালের লিপিকরদের মতো, রাজসভার কবি ও পণ্ডিতদের মতো পেট্রনের মুখাপেক্ষী হলেন। রাজা-রাজড়া ও লর্ডদের মধ্যে অনেকে তাঁর পেট্রন হলেন। ক্যাক্সটনের পেট্রনদের মধ্যে প্রধান হলেন চতুর্থ এডওয়ার্ড, আর্ল রিভার্স, আর্ল এরানডেল প্রভৃতি। লক্ষণীয় হল, প্রিণ্টার বা পেট্রন বা তাঁদের যে নতুন পাঠকগোষ্ঠী তাঁরা কেউ বিশেষ রিনেস্থান্সযুগের আদর্শানুরাগী ছিলেন না। হাতেলেখা পুঁথি-পাণ্ডুলিপিতে যে-পাঠ্যবস্তু পরিবেশন করা সম্ভবপর, তার চেয়ে বেশি পাঠ্যবস্তুর একটা চাহিদা ছিল এবং চাহিদা ক্রমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছিল। প্রথমযুগের মুদ্রক-প্রকাশক ও তাঁদের পেট্রনরা শুধু এইটুকুই বুঝেছিলেন। গ্রীক ও লাতিন ক্লাসিক সাহিত্যের মুষ্টিমেয় পাঠকরা তাঁদের বাসনা চরিতার্থ করতেন তখন প্রধানত ফরাসী ও ইটালিয় প্রেস থেকে। ক্যাক্সটন ও তাঁর পেট্রনরা তা জানতেন। তাই রিনেস্থান্সযুগের আদর্শ অনুযায়ী তাঁরা ক্লাসিক-সাহিত্য ছেপে প্রকাশ করার দিকে দৃষ্টি দেন নি প্রথমে। আদর্শের চেয়ে ব্যবসাটাই তাঁরা ভাল করে বুঝেছিলেন। ক্যাক্সটন তাই প্রথমে অনুবাদ গ্রন্থ ছাপতে আরম্ভ করেন। নানাবিষয়ের বই তিনি প্রধানত ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। আদর্শের দিকে নজর রেখে নয়, সমসাময়িক পাঠকগোষ্ঠীর রুচির দিকে নজর রেখে। পাঠকদের সমসাময়িক সাহিত্যিক রুচিই ছিল ক্যাক্সটনের বই-প্রকাশের প্রধান প্রেরণা ও মানদণ্ড। পাঠক-সাধারণ যে রিনেস্থান্সযুগের রুচিপ্রিয় বা আদর্শানুরাগী ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড বা ইয়োরোপের সাধারণ পাঠকরা ছিলেন প্রধানত ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্রগ্রন্থ ও নীতিগ্রন্থের পাঠক। ধর্ম ও নীতির আদর্শই ছিল তাঁদের জীবনের প্রধান আদর্শ। নবযুগের 'হিউম্যানিজমের' আদর্শ তখনও তাঁদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। ক্যাক্সটন তাই প্রথমে যে-সব বই ছেপে প্রকাশ করেন তা সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ বা উপদেশপ্রধান নীতিগ্রন্থ। তার মধ্যে 'গোল্ডেন লেজেণ্ড' বইখানির নাম উল্লেখযোগ্য। 'লেজেণ্ড অফ্ সেণ্টস্' গ্রন্থের মধ্যে ক্যাক্সটন নিজে মুদ্রক-প্রকাশকরূপে তাঁর অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলেছেন। তাঁর ভাষাতেই বক্তব্যটুকু উদ্ধৃত করছি[১]

> I have submysed (submitted) myself to translate into English the 'Legend of Saints', called 'Legenda Aurea' in Latin, and William, Earl of 'Arundel, desired me—and promised to take a reasonable quantity of them and sent me

১ Frank Mumby : *Publishing and Bookselling*, London, 1949 p 38

a worshipful gentleman promising that my said Lord should during my life give and grant me a yearly fee ...

ক্যাক্সটনের এই স্বীকারোক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। প্রধানত তিনি যে তাঁর পেট্রন আর্ল উইলিয়মের ইচ্ছাক্রমেই 'লেজেণ্ড অফ্ সেণ্টস্' ছাপতে আরম্ভ করেন, সেকথা ক্যাক্সটন স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন যে তাঁর পেট্রন promised to take a reasonable quantity of them—অর্থাৎ আর্ল উইলিয়ম একথাও তাঁকে বলেছিলেন যে, বই ছাপা হলে তিনি নিজে বেশ কিছু বই কিনবেন। পেট্রনের এই প্রতিশ্রুতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—একাধিক কারণে। পেট্রনের ইচ্ছাতে প্রিণ্টার বই ছাপলেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছাতেই ছাপা সম্ভব হত না, যদি-না পেট্রন বেশ-কিছু ছাপা-বই নিজে কেনার প্রতিশ্রুতি দিতেন। প্রতিশ্রুতি দেবার কারণ কি, এবং প্রিণ্টার ক্যাক্সটনের এই প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল কেন? কারণ বই ছাপার খরচ তখন বেশি ছিল এবং ছাপা বই কিনে পড়ার মতো পাঠকও তখন তৈরি হয় নি। ধর্মকথা ও নীতিকথা তাঁরা ধর্মযাজক ও কথকদের মুখে শুনেই তৃপ্ত হতেন। ধর্মগ্রন্থ হলেও তা পয়সা দিয়ে কিনে পড়বার মতো মনোভাব তাঁদের তখন ছিল না। তাছাড়া পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না, বিশেষ করে সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে। প্রধানত রাজা-রাজড়া, আর্ল-কাউণ্ট, ডিউক-ডাচেস্, লর্ড-লেডীরাই ছাপা বইয়ের পাঠক ছিলেন। ছাপানো বই কিনে পড়াটা প্রথমযুগে রীতিমত বিলাসিতারই নামান্তর ছিল। সুতরাং লর্ড-লেডী তথা পেট্রনদের বই-কেনার প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল। পেট্রনরা এইসব কিনে পার্শ্বচর ও বন্ধু-বান্ধবদের বিতরণ করতেন, উপহার দিতেন। তার জন্য মুদ্রক-প্রকাশকদের তাঁরা পুরস্কৃত করতেন। ক্যাক্সটন নিজে লেজেণ্ড ছাপার জন্য তাঁর পেট্রনের কাছ থেকে বছরে একটি করে হরিণ এবং একটি করে হরিণী পেতেন বলে স্বীকার করেছেন। বেশ বোঝা যায়, আধুনিক ছাপাখানার যুগে প্রকাশক-মুদ্রকরা প্রথমে পুঁথি-পাণ্ডুলিপি-পেট্রনের যুগের সমস্ত উত্তরাধিকার নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। সংস্কৃতির ইতিহাসে জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম এইভাবেই কাজ করে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বই-প্রকাশের আদিপর্ব সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করা কর্তব্য। কারণ মুদ্রক প্রকাশক ও লেখকদের স্বাতন্ত্র্য কখনও গ্রন্থজগতে প্রকাশ পায় নি। প্রথমযুগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রিণ্টার বা মুদ্রকই প্রকাশক ছিলেন, এবং কেবল মুদ্রক-প্রকাশক হয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, লেখকও হয়েছিলেন। অর্থাৎ মুদ্রক-প্রকাশক-লেখক প্রকাশনের আদিপর্বে অনেক ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিই ছিলেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বইয়ের ইতিহাস অনেকটা তাই। বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। সেকথা পরে বলব।

ইংলণ্ডে ছাপাখানার প্রবর্তক, আদিমুদ্রক উইলিয়ম ক্যাক্সটন নিজেই তাই ছিলেন। ক্যাক্সটন একাই ছিলেন তিনজন। তিনি প্রিণ্টার বা মুদ্রক ছিলেন, প্রকাশক ছিলেন এবং লেখকও ছিলেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁর যথেষ্ট ছিল, তাই তদানীন্তন সঙ্কীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর রুচিমাফিক তিনি বই ছাপতে আরম্ভ করেছিলেন, ইংলণ্ডের লর্ড-লেডীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। জনপ্রিয় হয় এইরকম বইই বেশি প্রকাশ করেছিলেন ক্যাক্সটন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কবি চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স - প্রায় ৩৭৪ পৃষ্ঠার বিশাল একখানি বই – ছাপা হয় ১৪৭৮ সালে। ক্যাক্সটন পরে চসারের অন্যান্য আরও কয়েকখানি বই প্রকাশ করেছিলেন। চসারের বই ছাড়া মেলোরীর মর্ট-ডার্থারও ক্যাক্সটনের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ক্যাক্সটন হিউম্যানিস্ট ছিলেন না, রিনেস্যান্সের নবীন আদর্শে উদ্বুদ্ধও হন নি। একথা পূর্বে বলেছি। মধ্যযুগীয় লোকরুচি চরিতার্থ করার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। সেইজন্য ক্যাক্সটনকে প্রগতিশীল প্রকাশক বা মুদ্রক বলা যায় না। তিনি এমন সব বই প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে নবযুগের নবীন আদর্শের কোনো পরিচয় ছিল না। মধ্যযুগীয় রুচি ও ভাবধারাকে এইভাবে তিনি অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করেছিলেন বলা চলে। তা হলেও, প্রথম-মুদ্রক-প্রকাশকরূপে ইংরেজি সাহিত্যে ক্যাক্সটনের যে বিশেষ দান আছে, তা অস্বীকার করা অন্যায়। প্রায় একশত বই ক্যাক্সটন ছেপেছিলেন, তার মধ্যে প্রায় কুড়িখানা বইয়ের অনুবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন। নিজের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে ধৈর্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তিনি, তা ইংলণ্ডের বই-প্রকাশের আদিপর্বে বিশেষ স্মরণীয়। অনুবাদকালে তিনি ইংরেজি ভাষার সংস্কারও করেছেন। ইনীড্‌স (ইনীড) নামক অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এ-সম্বন্ধে নিজের ভাষায়

যা বলেছেন তা লক্ষণীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজি ভাষা ও বানান উপেক্ষা করে কৌতূহলীরা ক্যাক্সটনের বক্তব্যটুকু পাঠ করবেন[২]

> I confess me not lerned not knowing the arte of retharyke, ne of suche gaye termes...And when I had advysed me in this sayd boke, I delybered & concluded to translate it in to Englysshe. And forthwyth toke a penne & ynke and wrote a leef or twenye, whyche I oversawe agayn to correcte it. And when I sawe the fayr and straunge termes therein I doubted that it sholde not please some gentylmen whiche late blamed me, . & desired me to use olde and homely termes . and so to do toke an olde boke and redde therin, and certaynle the Englysshe was so rude and broad that I coude not wele understande it.

ক্যাক্সটনের এই বক্তব্য পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি ভাষার সংস্কারের জন্য রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন করেছিলেন। অনুবাদে পুরানো ইংরেজি ভাষা ও ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করার জন্য অনেকেই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা রক্ষা করেন নি, কারণ তিনি নিজে পুরানো ভাষায় লেখা বই পড়ে দেখেছিলেন যে তা দুর্বোধ্য। সেইজন্য তিনি ভাষাকে ক্রমে আধুনিক সহজবোধ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং...Certaynly it is harde to playse every man bycause of dyversite & chunge of langage—এই কথা বলে তিনি শেষ পর্যন্ত পুরানো ভাষা-প্রয়োগের স্বপক্ষে যুক্তি বর্জন করেছিলেন। ক্যাক্সটনের মতো ইংলণ্ডের এ-কজন সাধারণ প্রিণ্টার-প্রকাশকের পক্ষে (আদি-প্রিণ্টার হলেও), ভাষা সম্বন্ধে এ রকম উদার-পন্থী হওয়া নিশ্চয় প্রশংসনীয়। এই হল ক্যাক্সটনের শ্রেষ্ঠ দান। ম্যাক্‌মুর্ত্রি বলেছেন যে, মুদ্রকরূপে ক্যাক্সটন খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি, মুদ্রণ-কলায় বা প্রকাশন-শিল্পে তাঁর দানও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ম্যাক্‌মুর্ত্রি তাই মন্তব্য করেছেন যে, 'Caxton could not by any stretch of the imagination be regarded as a fine printer.' মুদ্রণ-জগতের তুলনায় সাহিত্য-জগতে ক্যাক্সটনের দান অনেক বেশি।[৩]

২ **Douglas C. McMurtrie :** *The Book*, **p. 226**

৩ **McMurtrie :** *Ibid*, **p. 222**

ক্যাক্সটনের পর উইনকিন্ ডি ওয়ার্ড (Wynkyn de Worde) প্রিন্টার হন। ক্যাক্সটনের ফোরম্যান ছিলেন ওয়ার্ড এবং ১৪৯১ সালে ক্যাক্সটনের মৃত্যুর পর তিনি বই-প্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের তৈরি কাগজে প্রথম বই ছাপেন ওয়ার্ড এবং ইংলণ্ডে প্রথম কাগজ তৈরি করেন জন টেট (John Tate)। পরে ইনি লণ্ডনের লর্ড মেয়র হন। ইংলণ্ডের তৈরি কাগজে প্রথম যে বই ছাপা হয় তার নাম *De Proprietatibus Rerum*, ১৪৯৫-৯৬ সালে ছাপা হয়। জন টেটের নাম এই বইতেই প্রকাশিত হয় এবং তিনি যে ইংলণ্ডে প্রথম কাগজ তৈরি করেছিলেন, সেকথাও স্বীকার করা হয় এইভাবে

And John Tate the younger,
Joy mote he broke,
Which late hath in England
Doo make this paper thynne
That now in owre Englisshe
This boke is prynted Lnne.

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্যাক্সটন ও ওয়ার্ড ছাড়া আরও কয়েকজন মুদ্রক-প্রকাশক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তেমন খ্যাতিমান কেউ নন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে আরও বিখ্যাত কয়েকজন প্রিন্টার-প্রকাশকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের কথা পরে বলব।

বই-প্রকাশের আদিপর্বের ইতিহাস-প্রসঙ্গে অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের কথা না বললেও, ইটালির কথা বলতেই হয়, বিশেষ করে ভেনিসের প্রিন্টারদের কথা। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, এইসময় রিনেশ্যান্স (Renaissance) আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ইটালি, বিশেষ করে ভেনিস। নবযুগের ও নবজীবনের আদর্শ, হিউম্যানিজমের আদর্শ যে-দেশে জন্মলাভ ও পুষ্টিলাভ করেছে, সেই দেশে ছাপাখানার ও বই-ছাপার মূল্যবোধ ও প্রয়োজনবোধ সবচেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক নবযুগের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের মধ্যে ছাপাখানার বৈপ্লবিক গুরুত্ব যে কত বেশি, তা বাস্তবিকই ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নতুন আদর্শ, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাচার সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়া বা পৌছে দেওয়া ও প্রচার করা সম্ভব হত না, যদি-না ছাপাখানার আবিষ্কার হত এবং গ্রন্থাকারে ছেপে তা প্রকাশ ও প্রচার করা হত। ইটালিতে তাই আদিযুগের মুদ্রক-প্রকাশকরা, ঐতিহাসিক কারণেই ছাপাখানার গুরুত্ব বোধহয় সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন। লিপিকরের হাতেলেখা কথার চেয়ে যে মুদ্রকের মুদ্রিত কথার হাজারগুণ, লক্ষগুণ শক্তি

ও গতি বেশি, একথা ইটালির মুদ্রক-প্রকাশকরা যেভাবে বুঝেছিলেন এবং বুঝে তাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন, বোধহয় আর কোনো দেশের মুদ্রকরা তা করেন নি।

আদিযুগের অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালির মুদ্রক-প্রকাশকদের মধ্যে নিকলাস জেনসন (Nicolas Jenson) ও অলডাস ম্যান্যুটিয়াস (Aldus Manutius) অন্যতম। শুধু ইটালির বা ইয়োরোপের নয়, পৃথিবীর মুদ্রণেতিহাসে জেনসন ও অলডাসের নাম জার্মানির গুটেনবার্গের মতো চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। একাধিক কারণে এই দু'জন মুদ্রণ-জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নবযুগের আদর্শ অনুযায়ী জেনসন অক্ষরের সংস্কার করেছিলেন এবং জেনসন যে ছাপার হরফ নির্মাণ করেছিলেন, নবযুগের উপযোগী বলে তার নামই হয়েছিল—'*humanistic script*'। নবযুগের পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজ গথিক অক্ষরকে বর্বর ও কদর্য বলে বর্জন করেছিলেন এবং জেনসনের হরফকে নবযুগের সুসভ্য হরফ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তখন এমন একটা রীতিরই প্রবর্তন হয়েছিল যে, লাতিন ক্লাসিক সাহিত্য, কাব্য বা রম্যরচনা নতুন হরফে ছাপা হত এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি ছাপা হত গথিক হরফে। জেনসন শুধু মুদ্রক বা হরফ-নির্মাতা ছিলেন না, প্রকাশকও ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি অনেক ভাল-ভাল বই সম্পাদনা করিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। নতুন যুগের আদর্শ, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী রিনেস্যান্স আন্দোলনের প্রতি পর্বের মানসিক খোরাক যুগিয়েছিলেন জেনসন। ক্যাক্সটনের সঙ্গে জেনসনের পার্থক্য এইখানে এবং বিরাট পার্থক্য।

অলডাস ম্যান্যুটিয়াস নিজে ছিলেন পণ্ডিত, তাই ছাপাখানাকে তিনি নবযুগের আদর্শ সাধনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন গোড়া থেকে। লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে প্রকাশন ও মুদ্রণক্ষেত্রে তখনকার কালে অলডাসের মতো আর কেউ অবতীর্ণ হয়েছিলেন কি-না সন্দেহ। নবযুগের আদর্শের তিনি একজন অনুরাগী ধারক বাহক ও প্রচারক ছিলেন। নতুন আদর্শের প্রতি এই অনুরাগের জন্য তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুদ্রিত বই যদি সাধারণের ক্রয়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য না হয়, তাহলে মুদ্রণের যে যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভূমিকা তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তিনি অক্ষর সংস্কারের দিকেও মন দিয়েছিলেন, শুধু ছাপা বা বই প্রকাশের দিকে নয়। অলডাসই ছোট ছাপার হরফ এবং ইটালিক বা বাঁকানো হরফের প্রবর্তক। এই ছাপার হরফে তিনি পাঠকের ব্যবহারযোগ্য বই প্রথম প্রকাশ করেন এবং অনেক সুলভ মূল্যে তা বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হোক, বইয়ের বহুল প্রচার হোক, এই ছিল অলডাসের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আজও

ক'জন প্রকাশক এই লক্ষ্য নিয়ে বইয়ের ব্যবসা করেন, বলা কঠিন। কিন্তু পাঁচশো বছর আগে, ছাপা বই-প্রকাশের আদিযুগে, ইটালির মুদ্রক-প্রকাশক-পণ্ডিত অলডাস এই মহান আদর্শ নিয়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখনকার যুগাদর্শ ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আজকের দিনেও ক'জন প্রকাশকের আছে? বইয়ের জগতে অলডাস তাই অদ্বিতীয় আসন অধিকার করে আছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব

During the reign of Elizabeth it was still considered beneath the dignity of an English gentleman to have commercial dealings with a publisher, and it was customary for courtiers to circulate manuscript copies of their works among their friends. —Norman E. Binns.

ইংলণ্ডে এলিজাবেথের রাজত্বকালেও ইংরেজ ভদ্রলোক সাহিত্যিকরা মনে করতেন যে প্রকাশকের সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে বাণিজ্যিক লেনদেন করলে তাঁদের মর্যাদার হানি হবে। সেইজন্য তাঁরা পাণ্ডুলিপি নকল করিয়ে নিজেদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করতেন, তবু বই ছাপিয়ে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না।[৪] ছাপাখানা ও ছাপা বই সম্বন্ধে ইংরেজদের মনোভাব গোড়ার দিকে ইটালিয় ও জার্মানদের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল। নবযুগের রিনেস্যান্স আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ইটালিতে ছাপাখানার ও ছাপা বইয়ের যেরকম সমাদর হয়েছিল গোড়াতে, ইংলণ্ডে বা অন্য কোথাও তেমন হয় নি, এমনকি জার্মানিতেও না। তার প্রধান কারণ, নবযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জ্ঞানার্জনস্পৃহা ইটালিতে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জীবনের প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, জার্মানিতে বা ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপের অন্য কোথাও তা করে নি। অন্তত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তো নয়ই। একমাত্র সংস্কারমুক্ত বাধাবন্ধহীন পরিবেশের মধ্যেই তখনকার দিনে ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের প্রসার ও প্রচার সম্ভব ছিল। এখনও কি তাই নয়? ইংলণ্ডে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সেরকম মুক্ত সামাজিক পরিবেশের অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, প্রথমযুগের

৪ Norman E. Binns: *An Introduction to Historical Bibliography*, London, 1953, p. 321

মুদ্রক ও প্রকাশকদের। ইটালিতে তা হয় নি। ইংরেজরা স্বভাবতই রক্ষণশীল।[৫] ধীরেসুস্থে বিচার-বিবেচনা করে নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হল ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ এক-ধাক্কায় কোনো কিছু বর্জন করা বা গ্রহণ করা তাঁদের স্বভাব নয়। সেইজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয় কেবল, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইংরেজরা পৃথিবীর মধ্যে এ-রকম প্রতিপত্তিশালী হতে পেরেছেন।

নবযুগের রিনেসাঁসের আদর্শ ইটালিকে যেমন নাড়া দিয়েছিল, ইংলণ্ডকে তেমন দেয় নি, বা দিতে পারে নি। ইংলণ্ডে তাই ছাপাখানার বা ছাপা বইয়ের তেমন কদর হয় নি প্রথমযুগে, যেমন ভেনিসে ও ফ্লাণ্ডার্সে হয়েছিল। ইংলণ্ডের ক্যাক্সটন আর ইটালির জেনসন ও অলডাসের মধ্যে মুদ্রণ-প্রকাশনক্ষেত্রে তাই এতটা আদর্শের ব্যবধান দেখা যায়। ইটালির এলিটগোষ্ঠী যখন ছাপা হরফের ছিমছাম সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও আধুনিকতা নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তখনও ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীরা হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির রোমান্টিক মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সুধীসমাজ মনে করতেন, ছাপা বইয়ের তুলনায় হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির আভিজাত্য বেশি, এমনকি লেখকরাও তাই ভাবতেন। লিপিকরকে দিয়ে পাণ্ডুলিপি নকল করিয়ে তাঁরা মোসাহেব-মহলে বিতরণ করে গর্ব অনুভব করতেন। বই ছাপানোর জন্য বা ছাপিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। মুদ্রণ ব্যাপারটাকেই তাঁরা তাঁদের শ্রেণীগত কৌলীন্যের বিরোধী বলে মনে করতেন। এরকম বন্ধ্যা মানসক্ষেত্রে কখন মুদ্রণ বা প্রকাশন-শিল্পের বিকাশ হতে পারে না। ইটালিতে হয়েছিল, কারণ সমাজমানসের প্রসারতা ছিল সেখানে। ইটালিতে যখন অলডাস ভাবছেন, কি করে ছোট হরফে ও আকারে সুদৃশ্য বই ছেপে সুলভে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায়, ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা তখন পাণ্ডিত্যের অভিমানে অন্ধ হয়ে পাণ্ডুলিপি আঁকড়ে ধরে আছেন এবং ক্যাক্সটন ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা কদাকার দুর্বোধ্য হরফে কিছু-কিছু অনুবাদগ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করছেন। তাঁদের ছাপার হরফও যেমন বিসদৃশ, ছাপা বইও তেমনি কদাকার।

সামাজিক মনোভাবের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় মনোভাবও ছাপাখানার প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ইটালিতে ও ফ্রান্সে, প্রথমযুগের মুদ্রক-প্রকাশকরা যেরকম রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও প্রেরণা পেয়েছিলেন, ইংলণ্ডের মুদ্রক বা প্রকাশকরা তা পান নি।

৫ Havelock Ellis: *The Genius of Europe*, London, 1950. এই গ্রন্থের 'The Genius of England' অধ্যায়ে এলিস ইংরেজদের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ভিন্ন প্রথমযুগে মুদ্রণ ও প্রকাশনের প্রসারতা যে কোনমতেই সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্বন্ধে এমন সব আইনকানুন পাশ করা হয়, যার ফলে তার স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি রীতিমত ব্যাহত হয়। ক্রমান্বয়ে ঘোষিত একাধিক বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে জড়িত হয়ে ইংলণ্ডের মুদ্রক-প্রকাশকরা আত্মপ্রসারের সমস্ত প্রেরণা ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং গ্রন্থজগতে অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে থাকেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, ১৪৮৪ সালে এ্যাক্ট পাশ করে বিদেশীদের বইয়ের ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয় ইলংণ্ডে, কয়েকটি শর্তে। শর্তগুলি তেমন কঠোর ছিল না বলে বিদেশীরা অনেকে ইংলণ্ডে বইয়ের ব্যবসা করতে আসেন। ১৫২০ সালের মধ্যে দেখা যায়, ইংলণ্ডের মোট বই-ব্যবসায়ীর মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যাই প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগ। প্রকাশনক্ষেত্রে বিদেশীদের এই আধিপত্যের ফলে স্বভাবতই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। প্রতিযোগিতায় পদে-পদে পরাজিত হয়ে তাঁরা এই বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের ফলে সম্রাট অষ্টম হেনরী কয়েকটি আইন পাশ করে দেশীয় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আশ্রয় ও উৎসাহ দেন। ১৫২৩ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের ইংরেজ শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করতে বাধ্য করা হয়, কোনো বিদেশীকে দু'জনার বেশি মজুর নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় না। 'স্টেশনার্স কোম্পানী'র (Stationer's Company) ওয়ার্ডেনদের উপর মুদ্রণ-ব্যবসায়ীদের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। ১৫২৯ সালে আর একটি এ্যাক্ট পাশ করে মুদ্রণ-প্রকাশনের স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার অনেকটা কেড়ে নেওয়া হয়। ১৫৩৪ সালে আবার আইন জারী করে অবাধ বাণিজ্য একরকম প্রায় বন্ধই করে দেওয়া হয় এবং বইয়ের ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চালু করার চেষ্টা হয়।

যে 'স্টেশনার্স কোম্পানী'র কথা বলা হয়েছে এখানে, তার সঠিক উৎপত্তির ইতিহাস আজও ঠিক বলা যায় না, তবে ইংলণ্ডের বইয়ের ইতিহাসে এই কোম্পানীর যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। মনে হয়, চতুর্দশ শতাব্দীর কোনো সময় এই কোম্পানীর প্রথম গোড়াপত্তন হয়। তখন এটা অনেকটা লিপিকরদের গিল্ডের মতো ছিল। ছাপাখানা প্রবর্তিত হবার প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ইংলণ্ডে এই কোম্পানীটি যে গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াতে ১৪০৩ সালের সনদ অনুযায়ী এই কোম্পানীর নামকরণ হয়—'স্টেশনার্স কোম্পানী' এবং তার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান খোলা হয় লণ্ডনের 'স্টেশনার্স হলে।' ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ১৫৫৭ সালের সনদ অনুযায়ী এই কোম্পানীর সদস্যদেরই কেবল

মুদ্রণ-প্রকাশনের অধিকার দেওয়া হয় ইংলণ্ডে। কোম্পানীর সদস্য ছাড়া অন্য কারও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার বা বই ছাপার ক্ষমতা ছিল না তখন শুধু তাই নয়, স্টেশনার্স কোম্পানীর 'মাস্টার' ও 'ওয়ার্ডেনদের' মুদ্রণজগতের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। যে-কোনো প্রিণ্টার ও বই-ব্যবসায়ীর অফিস ও দোকান তাঁরা তল্লাশ করতে পারবেন, এবং অপাঠ্য মনে হলে যে-কোনো ছাপা বই ও কাগজ-পত্র তাঁরা পুড়িয়ে ফেলতে পারবেন। গোঁড়া ক্যাথলিক টমাস (Thomas Dockwray) হন কোম্পানীর প্রথম 'মাস্টার' এবং ক্যাথলিক উদ্যমে তিনি তাঁর ক্ষমতার প্রয়োগ করেন। ১৫৮৬ সালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা হয়। বই ছাপার অধিকার একরকম অন্য সকলের কাছ থেকে অপহরণ করে কেবল লণ্ডনের মধ্যে এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অর্থাৎ মুদ্রণ ও প্রকাশনের আঞ্চলিক সীমারেখাও টেনে দেওয়া হয় ইংলণ্ডে। লণ্ডন শহরের বাইরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও বই ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেবল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকার দেওয়া হয় বই ছাপার।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর এই ইতিহাস থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে, এই সঙ্কুচিত পরিবেশে কখনও ছাপাখানার বা বই ছাপার সুস্থ বিকাশ হতে পারে না। ইয়োরোপের অন্য কোনো দেশে, বিশেষ করে ইটালীতে ও ফ্রান্সে মুদ্রক ও প্রকাশকদের এ-রকম রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে বন্দী করা হয় নি। এর চেয়ে অনেক বেশি মুক্ত পরিবেশের মধ্যে ইটালি ও ফ্রান্সে বই প্রকাশের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। মুদ্রক ও প্রকাশকরাও সেখানে অনেক আগে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন। স্বাধীনভাবে বই প্রকাশ করার জন্য উদ্‌যোগী হয়েছিলেন প্রকাশকরা, একাধারে নিজেরা মুদ্রক না হয়েও। বইয়ের জগতে প্রকাশকরা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে তা হতে অনেক দেরি হয়েছিল। মুদ্রক ও প্রকাশক স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি, ছাপা বইয়ের তেমন মর্যাদা ছিল না বলে, এবং বই বা ছাপাখানা কোনটাই তেমন রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পায় নি বলে। বইয়ের ইতিহাসে এটা বিশেষ লক্ষণীয় ঘটনা—প্রকাশক ও মুদ্রকের ব্যবসায়ীরূপে স্বাতন্ত্র্য অর্জন। ছাপা বইয়ের লোকপ্রিয়তা বাড়লে বইয়ের চাহিদা বাড়ে, পাঠকের সংখ্যা বাড়ে এবং বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। তার ফলে ধীরে-ধীরে বই প্রকাশ করা একটা স্বতন্ত্র ব্যবসা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ হয়। মুদ্রক না হয়েও, ছাপাখানার টেকনিকাল বিদ্যায় পারদর্শী না হয়েও অনেকে বই প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং মুদ্রণ-প্রকাশনের প্রথম পর্বের শেষে মুদ্রণের অগ্রগতির ফলে, ছাপা বইয়ের প্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্যই প্রকাশ করা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন। প্রথমযুগের অভিন্ন

প্রিণ্টার-পাবলিশার, দ্বিতীয়যুগের প্রিণ্টার ও পাবলিশার হিসেবে ভিন্ন হয়ে যান। বইয়ের যুগের অগ্রগতির ফলেই এই বিচ্ছেদ ঘটে। অনেকটা পথ হাত ধরাধরি করে এসে তাঁরা দু'জন দু'পথে চলে যান। ইটালি ও ফ্রান্সে অনেক আগেই যান, নবযুগের আদর্শের প্রবল টানে, বইয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জোরে। ইংলণ্ডে তাঁরা পৃথক হন অনেক পরে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে প্রায়।

মুদ্রক ও প্রকাশকদের আদিপর্বের এই ইতিহাস থেকে একটি বিষয় বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানজগতে যে যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে নবজাগরণের কলরব শোনা গিয়েছিল, আদিযুগের পাইওনিয়ার প্রিণ্টার বা মুদ্রকরা সকলেই প্রায় তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিস্ময়কর হল, লেখকরা পর্যন্ত যখন মধ্যযুগের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ত্যাগ করতে পারেন নি, রাজা-মহারাজার পোষকতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, মিথ্যা কৌলীন্যবোধে অন্ধ হয়ে হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির সীমাবদ্ধ প্রচারেই সন্তুষ্ট ছিলেন— তখন আদিপর্বের মুদ্রকরা সকলেই প্রায় নবযুগের প্রগতিশীল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্ঞানমন্দিরের রুদ্ধদ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সনাতন-পন্থীদের ছাপাখানার বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত তাঁরা ব্যর্থ করেছিলেন। ছাপার হরফ সংস্কার করে, মুদ্রিত বইয়ের আকার সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী করেছিলেন তাঁরা। নবযুগের মানবাদর্শের উপযোগী হরফ বলে, তার নাম হয়েছিল হিউম্যানিস্টিক স্ক্রিপ্‌ট। যুগোপযোগী ভাষারও সংস্কার করেছিলেন তাঁরা। প্রথম পর্বে শুধু মুদ্রক নয়, তাঁদের প্রকাশকও হতে হয়েছিল। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁরা লেখকও হয়েছিলেন। কতকটা নিরুপায় হয়েই তাঁরা লেখক হয়েছিলেন। কারণ লেখকরা তখনও পাণ্ডু-লিপির পক্ষপাতী। প্রকাশক ও মুদ্রকরা তাঁদের লেখা ছেপে প্রকাশ করুন এবং মুদ্রিত লেখা বহুজনের পাঠ্য হোক, এ তাঁরা চাইতেন না। তাঁদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত বই ছাপাতে। সুতরাং আদিপর্বের মুদ্রকরা বইও লিখেছিলেন। লেখক ও প্রকাশক, একজনই ছিলেন তিনজন। মানবসভ্যতার এক বৈপ্লবিক যুগসন্ধিক্ষণে—যাঁরা এইভাবে ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে বহন করে নবযুগের জয়যাত্রার পথ সুগম করেছেন, আজ তাঁরা সামাজিক বিধির চক্রান্তে (নিয়তির চক্রান্তে নয়) সাধারণ মজুরশ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। যা কিছু সামাজিক মর্যাদা তার প্রধান অংশীদার হয়েছেন লেখকেরা এবং কিছুটা প্রকাশকরা। নবযুগের আদর্শসৌধের বনিয়াদ গড়েছেন যাঁরা, তাঁরা আজ উপেক্ষিত ও অনাদৃত। এমনকি, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পর্যন্ত তাঁদের যোগ্য ও প্রাপ্য স্থানটুকু দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই।

জনসভার সাহিত্য

প্রকাশকের যুগ

প্রথম প্রস্তাব

ষোড়শ শতাব্দী ছিল প্রধানত মুদ্রকের যুগ। প্রকাশক তাঁরাই ছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে লেখকও। মুদ্রকরাই নানারকমের হরফ তৈরি করেছেন, বই ছেপেছেন, প্রকাশ করেছেন, বই বিক্রি করেছেন, লিখিয়েছেন এবং মধ্যে-মধ্যে নিজেরাও লিখেছেন। প্রকাশক বা পাবলিশার নামে আজকাল যে স্বতন্ত্র বই-ব্যবসায়ীদের দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের বিশেষ কোনো অস্তিত্ব ছিল না বলা চলে। থাকলেও তা গণ্য করার মতো নয়। সপ্তদশ শতকে প্রকাশকদের আবির্ভাব হল গ্রন্থজগতে। বৈপ্লবিক আবির্ভাব। বইয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় ও যুগান্তকারী।

ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক বড়-বড় মুদ্রক জন্মেছিলেন। তার পরেও অবশ্য অনেক মুদ্রক জন্মেছেন এবং মুদ্রণকলার নানাদিকে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বইয়ের ইতিহাস প্রধানত যাঁদের কেন্দ্র করে রোমাঞ্চকর কাহিনী হয়ে উঠেছে, তাঁরা হলেন প্রকাশক। নবযুগের নায়কদের মধ্যে প্রকাশকরাও অন্যতম। আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রকাশকরা মুদ্রকদের সঙ্গে বিরাট একটি অধ্যায় জুড়ে আছেন, অথচ ইতিহাস-লেখকরা তাঁদের সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন। আশ্চর্য মনে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানারকমের উৎপাদনযন্ত্র যে বিপ্লব এনেছে, সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে প্রধানত মুদ্রণযন্ত্র, মুদ্রক ও প্রকাশকদের মাধ্যমে। সংস্কৃতির সর্বোচ্চ উপরতলায় যে বৈপ্লবিক আলোড়ন হয়েছে নতুন বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের যুগে, তা ছাপাখানা ও ছাপা বই না থাকলে সহজে হত না এবং আদৌ হত কি-না সন্দেহ। নতুনযুগে বৈপ্লবিক বাণী যাঁরা মানুষের কানে পৌঁছে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের দিকে যাঁরা মানুষকে চোখ মেলে দেখতে সাহায্য করেছেন, নতুন যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে যাঁরা মানুষকে মধ্যযুগের কূপমণ্ডূক সমাজের হাজার রকমের কুসংস্কার, জড়তা ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন—এককথায় যাঁরা মানুষের মুখে কথা ফুটিয়েছেন, স্বাধীনভাবে মানুষের মতো মানুষকে চিন্তা করতে

শিখিয়েছেন, তাঁরাই হলেন মুদ্রক ও প্রকাশক। কে না জানেন যে গোলাবারুদ কামানের চেয়ে হাজারগুণ শক্তিশালী হল মুদ্রিত কথা (printed word)। মুক্ত বিহঙ্গের মতো মুদ্রিত কথা হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষের কাছে অনায়াসে পৌঁছায়, তার ঘাত-প্রতিঘাতে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মনে, দেশ থেকে দেশান্তরে, চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গোলাবারুদের শক্তি স্থানকালপাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, মুদ্রিত কথার কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই। সুতরাং কথাকে যাঁরা মুদ্রিত রূপ দেন, সেই মুদ্রকরা এবং মুদ্রিত কথাকে যাঁরা স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার পথ পরিষ্কার করে দেন, সেই প্রকাশকরা, আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন, তা কল্পনা করা যায় না। অথচ সংস্কৃতির ইতিহাসে মুদ্রক ও প্রকাশকদের তেমন উল্লেখযোগ্য বা যথাযোগ্য স্থান কোনো ঐতিহাসিকই দেন নি। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং খুব সঙ্গতভাবেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদের আবির্ভাব ও বিকাশের পথ যাঁরা তৈরি করেছেন, সেই মুদ্রক ও প্রকাশকদের অপাংক্তেয় বলে অবহেলা করা হয়েছে। কারিগর ও কারুশিল্পীরা যেমন বিনা অপরাধে চিত্রশিল্পীদের (পেইণ্টার) তুলনায় সামাজিক মর্যাদার অনেক নিম্নস্তরে নেমে এসেছেন, মুদ্রক ও প্রকাশকরাও তেমনি সাহিত্যিকদের মর্যাদার স্তরে পৌঁছতে পারেন নি। ধনতান্ত্রিকযুগে প্রতিভার সংজ্ঞা বদলেছে এবং প্রতিভা অহমসর্বস্ব হয়েছে। নবযুগের সংস্কৃতির প্রধান আর্কিটেক্টদের তাই আমরা আজও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হই। ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আমাদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই তার জন্য দায়ী। দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত না হলে সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেকটা অংশ মুদ্রক ও প্রকাশকরা যে দখল করতেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

যাই হোক্, ষোড়শ শতাব্দীতে শুধু ইংলণ্ডে বা ইটালিতে নয়, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং তার বাইরেও অনেক বিখ্যাত মুদ্রকের আবির্ভাব হয়েছিল। ফ্রান্সে জিওফ্রে টোরি (Geoffrey Tory) ছিলেন সে-যুগের খ্যাতনামা মুদ্রক। তিনি প্রথম থেকেই মুদ্রিত গ্রন্থকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করেছিলেন। মুদ্রণ প্রকাশনের ইতিহাসে নেদারল্যাণ্ডের নামও উল্লেখযোগ্য। নেদারল্যাণ্ডের এলজেভির (Elzevir)-পরিবার ও ক্রাইস্টোফার প্ল্যান্টিনের কথা ভুলবার নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এলজেভিররা মুদ্রিত বইয়ের পকেট সংস্করণের (Pocket Edition) প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কথা বুঝেছিলেন। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগের কথা। ক্রাইস্টোফার প্ল্যান্টিনের (Christopher Plantin) নাম প্রথমযুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রক বলে ইতিহাসে খোদাই

করা রয়েছে। জার্মান গুটেনবার্গ ও ইটালিয়ান অলডাস মানুটিয়াসের সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডের প্ল্যান্টিনের নাম মুদ্রণ-জগতে সমানভাবে স্মরণীয়। প্ল্যান্টিন একজন ফরাসী হলেও ফ্রান্স ছেড়ে তিনি আন্তওয়ার্পে (Antwerp) গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানেই মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজ আরম্ভ করেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি খুব ছোট একটি ছাপাখানায় বই ছাপতে শুরু করে মাত্র পনের বছরের মধ্যে তখনকার দিনের বৃহত্তম মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানের মালিক হন। ম্যাক্‌মূর্ত্রি বলেছেন

> Plantin's ambition was to make his the greatest printing office in the world, and he certainly realised his ambition. By 1570 the institution was one of the show places of Europe. Twenty two presses were working continually and – as one writer recorded with considerable awe – 2,200 crowns daily were paid as wages to the workmen. The plant outgrew the four houses it occupied . .

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, এই ছিল প্ল্যান্টিনের লক্ষ্য। লক্ষ্যে তিনি পৌঁছেছিলেন এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে। আজকের দিনে অনেকে কল্পনা করতেও পারবেন না। মাত্র পনের বছরের মধ্যে প্ল্যান্টিনের মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান সারা ইয়োরোপের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানরূপে গণ্য হয়। দেশ-বিদেশ থেকে অনেকে প্ল্যান্টিনের ছাপাখানা দেখতে যেতেন। বাইশটা ছাপাখানার কাজ তিনি একসঙ্গে চালাতেন। ছাপাখানার কর্মীদের ২২০০ ক্রাউন করে প্রতিদিন মজুরী দিতেন। প্রতিষ্ঠানটি কত বড় হতে পারে তা দৈনন্দিন মজুরীর এই পরিমাণ থেকে বোঝা যায়। চারটি বড়-বড় বাড়ি নিয়ে ছিল তাঁর ছাপাখানা। তাতেও স্থান সঙ্কুলান হত না। নতুন বাড়ি ও সম্পত্তি কিনেছিলেন প্ল্যান্টিন তাঁর ছাপাখানার জন্য। তাঁর সেই বাড়িতে এখন প্ল্যান্টিন-মোরটাস মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – প্রাচীন ছাপাখানা ও ছাপার সাজসরঞ্জামাদির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইয়োরোপীয় মিউজিয়াম। পৃথিবীর প্রিন্টাররা এখন এই প্ল্যান্টিন মিউজিয়ামে প্রথমযুগের ছাপাখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল, হরফ মুদ্রণ ইত্যাদির নিদর্শন দেখবার জন্য যান। প্রথমযুগের ছাপাখানা সংক্রান্ত এ-রকম বিশাল মিউজিয়াম পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। প্রত্যেক বছর হাজার-হাজার দর্শক এই মিউজিয়াম দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে আসেন। ম্যাক্‌মূর্ত্রি প্ল্যান্টিন মিউজিয়াম সম্বন্ধে বলেছেন

To this museum printers from all over the world make pilgrimage, for nowhere else is to be seen so comprehensive an exhibit of early printing method. The museum is also visited annually by thousands of sightseers who find the ancient workrooms of compelling human interest.

ইয়োরোপের মধ্যে মুদ্রণের প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল না। অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নবাবিষ্কৃত মহাদেশেও ছাপাখানা পৌঁছেছিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই। স্পেনের বিখ্যাত প্রিণ্টার জুয়ান ক্রমবার্গার (Juan Cromberger) তাঁরই দেশের বাসিন্দা একজন ইটালিয়ান প্রিটার জুয়ান প্যাবলোকে মেক্সিকোতে পাঠিয়েছিলেন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৫৩৯ সালের কথা। মুদ্রক প্যাবলোর মহাসাগরপারে এই অভিযান কলম্বাসের অভিযানের তুলনায় কম যুগান্তকারী নয়। ইয়োরোপের মধ্যেই যখন সব দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তখন অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে মুদ্রণ-যন্ত্রের লটবহর নিয়ে সুদূর মেক্সিকোতে যাওয়া শুধু দুঃসাহসিক নয়, যুগান্তকারী ব্যাপার। মেক্সিকোর প্রথম মুদ্রক হয়ত মার্টিন নামে কোনো ব্যক্তি ছিলেন। কেউ-কেউ তাই অনুমান করেন। কিন্তু প্যাবলোক মেক্সিকোর প্রথমযুগের মুদ্রক হন বা নাই হন, তিনি যে প্রথমযুগের মুদ্রকদের মধ্যে প্রথম মিশনারী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাপাখানার ইতিহাসে তিনি একজন রোমাণ্টিক নায়ক হয়ে আছেন। হয়ত প্রথমে তিনি ধর্মপুস্তক ছাপতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তবু পাদ্রী সাহেবদের মতো বাইবেল হাতে করে তিনি বিদেশে সমুদ্রযাত্রা করেন নি। মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ বুকে জীবন বিপন্ন করে সপরিবারে প্যাবলো অনির্দিষ্ট অপরিচিত দেশের উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ছাপাখানার যন্ত্রপাতি নিয়ে। ছাপাখানার ইতিহাসে এ-রকম একাধিক রোমাণ্টিক নায়ক আছেন, যাঁরা কোনো উপন্যাসের বা কাব্যের নায়ক হন নি বিশেষ। তবু ইতিহাসে তাঁরা অবিস্মরণীয়। নবযুগের ইতিহাসের তাঁরাই রোমাণ্টিক নায়ক। ছাপাখানার আদিযুগের এই নায়করা মুদ্রক ও প্রকাশক দুই-ই। অন্তত ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তাই ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রকাশকরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়ে গ্রন্থ-জগতে পদার্পণ করেন। তার পরের ইতিহাস আরও রোমাণ্টিক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ষোড়শ শতাব্দী থেকে সাহিত্যিক ব্যবসায়ে প্রকাশকদের আবির্ভাবের পথ সুগম হচ্ছিল। বিখ্যাত মুদ্রকরা প্রায় প্রত্যেকেই বই প্রকাশ করে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছিলেন। মুদ্রণ ও প্রকাশনের বিকাশ হচ্ছিল পাশাপাশি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রকাশকরা স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। মুদ্রণের ইতিহাস মোটামুটি পাঁচশো বছর হলে, প্রকাশনের ইতিহাস প্রায় তিনশো বছরের ইতিহাস।

যুগটা ছিল নতুন বাণিজ্যিক অভিযানের যুগ, 'Commercial Piracy'র যুগ। সাহিত্যক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। প্রকাশকরা প্রথম স্বাধীন ব্যবসায়ীরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ব্যবসায়ের রূপ তখন অন্যরকম ছিল, এখনকার মতো ছিল না। আধুনিক ধনতান্ত্রিকযুগের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। তার জন্ম হচ্ছে বলা চলে। অভিযাত্রীর মনোভাব, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি (ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের মতো) তখন প্রবল ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো বণিক অভিযাত্রীদের যুগ। নিয়ম-নীতির বিশেষ বালাই ছিল না তখন, তার বিকাশও হয় নি বিশেষ। বিভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্যকে অভিযাত্রী বণিকরা লুটের মাল মনে করতেন। এই অর্থনৈতিক মনোবৃত্তির প্রভাব রীতিমত পড়েছিল সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রথমযুগের প্রকাশকদের উপর। প্রকাশকরাই সাহিত্যক্ষেত্রের নতুন ব্যবসায়ী, স্বাধীন ব্যবসায়ী। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের তাৎকালিক ব্যবসায়ীদের মতোই তাঁদের মনোবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কাঁচামালের সন্ধানে অবশ্য তাঁদের বিদেশযাত্রার প্রয়োজন হয় নি বিশেষ। কারণ প্রকাশকদের কাঁচামাল লেখক ও তাঁর পাণ্ডুলিপি এবং পণ্য হল বই। লেখকদের লুণ্ঠন করাই প্রথমযুগের প্রকাশকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য প্রকাশকদের প্রথমযুগটাকে অনেকে 'literary piracy'র যুগ বলেছেন। 'কমার্সিয়াল পাইরেসী'র মতো 'লিটারারি পাইরেসী' ছিল প্রকাশকদের নীতি। যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে প্রকাশকরা লেখকদের পাণ্ডুলিপির সর্বস্বত্ব কিনে নিতেন, 'লভ্যাংশ' বা 'রয়াল্‌টি' দিয়ে নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে-সব সাহিত্যিক এইভাবে প্রকাশকদের লুণ্ঠন-নীতির দৌরাত্ম্য সহ্য করেন, তাঁদের মধ্যে সেক্সপীয়রও ছিলেন। অনেক নাটক সেক্সপীয়র এইভাবে প্রকাশদের হাতে সমর্পণ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়েকজন প্রকাশক বইয়ের ব্যবসা করে নাম করেছিলেন ইংলণ্ডে, তাঁদের মধ্যে হামফ্রে মোসলের (Humphrey Mosley) নাম উল্লেখযোগ্য। ১৬৪৬ সালে মিল্টনের (Milton) প্রথম কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন মোসলে। শুধু মিল্টনের নয়, আরও অনেক নতুন সাহিত্যিক ও কবির বই তিনি প্রকাশ করেন। সাধারণত লেখকদের কাছ থেকে বইয়ের স্বত্ব কিনে নিয়ে তিনি প্রকাশ

করতেন। এইভাবে বইয়ের ব্যবসায়ে হামক্রে অনেক মুনাফা করেছেন। কিন্তু তাহলেও ইংরেজি সাহিত্যে হামক্রের বিশিষ্ট দান আছে। সাহিত্য বা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার দূরদর্শী ও সাহসী প্রকাশক তখন ইংলণ্ডে দু'চারজনও ছিলেন কি-না সন্দেহ। সেই অবস্থায় হামক্রে মোসলের মতো প্রকাশক না থাকলে ইংরেজ সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনার কোনো উৎসাহই হয়ত পেতেন না এবং ইংরেজি সাহিত্যের দারিদ্র্যও দূর হত কি-না সন্দেহ।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দু'একজন আরও দূরদর্শী ও বিচক্ষণ প্রকাশক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ বাইরের সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বইয়ের চাহিদা যেমন বাড়ছিল, পাঠকের সংখ্যা যেমন বাড়ছিল, তেমনি প্রকাশকদেরও পরিবর্তন হচ্ছিল। অবশ্য খুব দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে। এইসময় বইয়ের ব্যবসায় প্রকাশন-ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জেকব টনসনের (Jacob Tonson) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে, সাহিত্যিক না হয়েও, প্রকাশকরূপে জেকব টনসন একটা নির্দিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। দরিদ্র পিতার কাছ থেকে মাত্র ১০০ পাউণ্ড উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন টনসন। এই সামান্য পুঁজি ছাড়া বালক টনসনের আর কিছু সম্বল ছিল না, অথচ ছেলেবেলা থেকে তাঁর প্রকাশক হবার তীব্র বাসনা ছিল। ১৪ বছর বয়সে লণ্ডনের এক পুস্তক বিক্রেতার দোকানে টনসন শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। সাত বছর অন্যের বইয়ের দোকানে এইভাবে কাজ করার পর ১৬৭৭ সালে, ২১ বছর বয়সে টনসন নিজে নতুন বইয়ের দোকান খোলেন চ্যান্সারী লেনে, ঐ সামান্য ১০০ পাউণ্ড পুঁজি নিয়ে। প্রথমে তিনি পুরানো বই কিনে বিক্রি করতে আরম্ভ করেন এবং তার সঙ্গে ধীরে-ধীরে নতুন বইও বিক্রি করতে থাকেন। কিন্তু কেবল বই বিক্রি করে তাঁর আশ মিটল না। স্বাধীন প্রকাশক হবার ইচ্ছা ক্রমেই তাঁর মধ্যে প্রবল হচ্ছিল। অথচ প্রকাশন ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তবু অন্যের প্রকাশিত বই বিক্রি করেও তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না। সুতরাং সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে বই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করলেন। অটওয়ে ও টেটের (Otway & Tate) নাটক নিয়ে তিনি শুরু করলেন। তার চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নাটক প্রকাশ করে খুব লাভও হল না, লোকসানও হল না, কোনরকমে পুষিয়ে গেল। এমনসময়ে টনসন লোকমুখে কাণাঘুষা শুনলেন যে, কবি ড্রাইডেনের (Dryden) সঙ্গে তাঁর প্রকাশক হেরিংম্যানের কি গণ্ডগোল হয়েছে। শোনা মাত্রই তিনি দেরি না করে ড্রাইডেনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর পরবর্তী নাটক 'ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা'

(*Troilus and Cressida*) প্রকাশ করার জন্য চুক্তি করে ফেললেন। ড্রাইডেন ২০ পাউণ্ড দক্ষিণা চান তাঁর নাটকের জন্য। টনসনের দেবার মতো সঙ্গতি ছিল না তখন কুড়ি পাউণ্ড। তবু দিতেই হবে, কারণ ড্রাইডেনের মতো কবিকে তাঁর লেখক হিসেবে ছাড়তে তিনি কিছুতেই রাজী নন। নিরুপায় হয়ে টনসন অন্য একজন পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু টাকা নিলেন তাকে মুনাফায় ভাগ দেবার অঙ্গীকারে। ১৬৭৯ সালে ড্রাইডেনের বইটি ছাপা হল। তারপর থেকে সারাজীবন টনসনের সঙ্গে ড্রাইডেনের প্রকাশক-লেখকের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় ছিল, ১৭০০ সালে ড্রাইডেনের মৃত্যু পর্যন্ত। কোনদিন তাঁদের মধ্যে কোনো মতান্তর বা মনোমালিন্য হয় নি। ড্রাইডেনের অন্যতম প্রকাশকরূপে টনসন সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইংরেজ প্রকাশকদের মধ্যে টনসনই সর্বপ্রথম বিভিন্ন লেখকের রচনার সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর আগে আর কোনো প্রকাশক '*Literary Miscellany*' গ্রন্থের পরিকল্পনা করতে পারেন নি। ১৬৮৪ সালে টনসন যখন তাঁর সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখনকার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে, তখন পাঠক ও প্রকাশক উভয় মহলেই হৈ চৈ পড়ে যায়। তাঁর এই সঙ্কলনগ্রন্থের নাম ছিল : *Miscellany—Poems written by the most Eminent Hands* (1684)। সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন লেখকের রচনার এই প্রথম মুদ্রিত সঙ্কলনগ্রন্থ। টনসনই এর প্রবর্তক। এইভাবে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর এবং একাধিক লেখকের চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণ করার যে পন্থা থাকতে পারে, টনসনের আগে আর কোনো প্রকাশক তা চিন্তা করতে পারেন নি। ১৬৮৫ সালে, টনসন এই সঙ্কনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৬৯৩ সালে তৃতীয় খণ্ড। সঙ্কলনগ্রন্থের এই পরিকল্পনা ব্যবসায়ী পরিকল্পনারূপে আশাতীতভাবে সফল হয়। বহু বই বিক্রি হয়, বইয়ের চাহিদা বাড়ে এবং টনসন যথেষ্ট মুনাফাও করেন। অন্যান্য প্রকাশকরাও টনসনকে অনুকরণ করে সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সঙ্কলনের একটা ঢেউ এনে দেন সাহিত্যজগতে প্রকাশক টনসন। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে যে-সব লেখকের রচনা প্রকাশিত হয় নি, অথচ যাঁরা প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন হয়ত কয়েকটি মাত্র রচনায়, তাঁদের রচনাও যে এইভাবে গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করে পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা যায়, একথা সপ্তদশ শতাব্দীতে চিন্তা করা এবং তাকে কার্যে পরিণত করা, প্রকাশকের দিক থেকে যে কতটা অভিনব ছিল, আজ তা অনেকেই হয়ত কল্পনা করতে পারবেন না।

সালে টনসন ড্রাইডেনের ভার্জিল অনুবাদ প্রকাশ করে ইংরেজিভাষী

পাঠকদের উপহার দেন। গ্রন্থজগতে টনসনের নাম অমর হয়ে যায়। তিন বছর ধরে অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহ করে তিনি ভার্জিলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে বই বিক্রি হয়ে যায়।

প্রকাশক টনসনের নাম আরও একটি কারণে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। মিল্টনের বিশ্ববিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ প্যারাডাইজ লস্ট (*Paradise Lost*) টনসন প্রকাশ করেন। তাঁর আগে প্রকাশক সিমন্সের কাছে (Simmons) মিল্টন তাঁর 'প্যারাডাইজ লস্টের' সর্বস্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সিমন্স তাঁর স্বত্ব ২৫ পাউণ্ড মূল্যে অন্য একজনের (Brabazon Aylmer) কাছে বিক্রি করেন এবং তিনি টনসনকে বিক্রি করে দেন ১৬৮৩ সালে।

টনসন খুব হুঁশিয়ার প্রকাশক ছিলেন। তখন ড্রাইডেন জীবিত এবং টনসনের সঙ্গে ড্রাইডেনের প্রকাশক-লেখকের সম্পর্কও মধুর। বই-প্রকাশের ব্যাপারে টনসন পদে-পদে ড্রাইডেনের পরামর্শ নিতেন। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্টের' স্বত্ব কেনার সময় টনসন পরামর্শ করেন ড্রাইডেনের সঙ্গে। ড্রাইডেন মুক্তকণ্ঠে মিল্টনের এই মহাকাব্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, ইংরেজি সাহিত্যে এই কাব্য বিরাট অবদান বলে গ্রাহ্য হবে। টনসন উৎসাহিত হন এবং ১৬৮৩ সালে তিনি অর্ধেক স্বত্ব কিনে নেন। বাকি অর্ধেক কেনেন সাত বছর পরে। ১৬৮৮ সালে 'প্যারাডাইজ লস্ট' প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে, প্রকাশক টনসন। প্রকাশের পরই তার সুখ্যাতি হয়, বিক্রিও হয় যথেষ্ট! পর পর কয়েকটি সংস্করণ ছাপেন টনসন এবং এই একখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি কয়েক হাজার পাউণ্ড মুনাফা করেন। অবশ্য কবি মিল্টন তাতে বিশেষ লাভবান হন নি।

তারপর টনসন আর একটি বৃহৎ কাজে হাত দেন, সাত খণ্ডে সেক্সপীয়রের সচিত্র গ্রন্থাবলী তিনি প্রকাশ করেন। তিনিই সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর সচিত্র সংস্করণের প্রথম প্রকাশক। ১৭০৯-১৭১০ সালে প্রকাশিত হয়। এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌছেচি আমরা। বড়-বড় প্রকাশকদের যুগে।

তৃতীয় প্রস্তাব

সপ্তদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্রিটিশ প্রকাশক টনসনের কথা বলেছি। দূরদর্শী টনসন বইয়ের ব্যবসায়ে অনেক দিক থেকে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। বিভিন্ন লেখকের রচনার সংকলনগ্রন্থ তার মধ্যে অন্যতম। লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক যে সেকালের সাহিত্যিক

বোম্বেটেগিরির যুগেও কতখানি অন্তরঙ্গ হতে পারে, টনসন ও ড্রাইডেন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। লেখকরা যে কেবল উকিলদের ক্লায়েণ্টের মতো শোষণের মক্কেল নন, একথা প্রমাণ করা তখনকার দিনে সহজ ছিল না। ড্রাইডেনের প্রকাশক টনসন সম্পর্কে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টনসন আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে বুঝেছিলেন যে, সাহিত্যিকদের আড্ডায় যোগদান না করলে ভাল প্রকাশক হওয়া যায় না। এখনও যে ক'জন প্রকাশক একথা বোঝেন তা জানি না, বিশেষ করে আমাদের দেশে। এ-প্রসঙ্গ নিয়ে পরে সবিস্তারে আলোচনা করব। তখনকার দিনে ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত সাহিত্যিক চক্র বা আড্ডার নাম ছিল কিট-ক্যাট-ক্লাব (Kit-Kat Club)। সাহিত্যিক ও পাঠকদের এই বৈঠকী আড্ডায় টনসন নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন। সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিক সকলেই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। টনসন প্রকাশক হয়েও যে এই ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্র ছিল এই ক্লাব। টনসন তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে প্রায় তিন শতাব্দী আগে তিনি প্রকাশনক্ষেত্রে যে আশ্চর্য আর্থিক সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তা করা কোন-মতেই সম্ভব হত না। ১৭৩৬ সালে টনসনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বইয়ের ব্যবসায়ে প্রকাশকদের দ্রুত অগ্রগতি তিনি নিজের চোখে দেখে গিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রকাশকরা আরও অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। বইয়ের জগতে অনেক অভিনব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পেলেন তাঁরা। বই ছাপা, বই বাঁধাই, বই রূপায়ণ ইত্যাদির দ্রুত উন্নতি হল। ক্ষেত্র প্রস্তুত হল তার জন্য। মুদ্রণ জগতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে প্রকাশকদের সুবিধা হল। নতুন উপাদান, নতুন কলা-কৌশলের উদ্ভব হল; যেমন

১৭১৯ সালে রোমার (Reaumur) কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন;

১৭২২ সালে লা ব্লোঁ (Le Blon) কোলোরিটো (Colorito) নামে বই প্রকাশ করেন এবং তার মধ্যে রঙিন ছাপার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। নয়টি রঙিন মুদ্রণের প্রতিলিপি তাঁর বইতে ছিল;

১৭৩৪ সালে ক্যাসলন (Caslon) তাঁর বিখ্যাত মুদ্রণ-হরফের নমুনা প্রকাশ করেন,

১৭৩৯ সালে গেড (Ged) ষ্টিরিওটাইপের পরীক্ষায় কৃতকার্য হন;

১৭৪৪ সালে সোদ্‌বাই (Sotheby) তাঁর নিলাম-ঘর স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে সর্বপ্রথম কেবল বই বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন;

১৭৫৭ সালে বাস্কারভিল (Baskerville) তাঁর নতুন ছাপার হরফ তৈরি করেন; হোরেস ওয়ালপোল নিজের প্রাইভেট প্রেস স্থাপন করেন;

১৭৬৮ সালে পার্মার বোদোনি (Bodoni) বিখ্যাত 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' (*Encyclopaedia Brittanica*) প্রথম ছাপাতে আরম্ভ করেন এবং তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়;

১৭৬৯ সালে গ্র্যাংগারের *Biographical History of England* প্রকাশিত হয় এবং চিত্র বইয়ের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে;

১৭৭০ সালে রোজার পেইন (Roger Payne) বই বাঁধাই আরম্ভ করেন নতুনভাবে;

১৭৭৪ সালে শীল (Scheele) ন্যাকড়াকানি থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন;

১৭৮৪ সালে হউই (Hauy) অন্ধদের জন্য সর্বপ্রথম উঁচু অক্ষরে বই ছাপেন;

১৭৯৬ সালে সেনেফেল্ডার (Senefelder) লিথোগ্রাফির কৌশল উদ্ভাবন করে বই ছাপার ইতিহাসে যুগান্তর আনেন।

মুদ্রণ ও প্রকাশনক্ষেত্রে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এগুলি ঘটেছিল। বই বাঁধাই, বই ছাপা, রঙিন ছাপা, বই চিত্রণ, লিথোগ্রাফি ইত্যাদির আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে প্রকাশকরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। তার জন্যই তাঁরা প্রকাশিত বইয়ের চেহারা এক শতাব্দীর মধ্যে আমূল বদলে ফেলতে পেরেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের বড় প্রকাশকদের মধ্যে বার্ণার্ড লিন্‌টট্ (Bernard Lintot) ছিলেন অন্যতম। পোপের প্রকাশকরূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। লিন্‌টট্ যখন প্রকাশন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখনও টনসন জীবিত ছিলেন। টনসনের প্রকাশন-নীতি ও ধারা লিন্‌টট্‌কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। গোড়া থেকেই তিনি টনসনের পরীক্ষিত পথ ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিলেন। টনসনের মতো তিনি তখনকার সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঘুরে বেড়াতেন এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করতেন। লিন্‌টট্ প্রথমে একটি বইয়ের দোকান খোলেন এবং দোকানটিকে রীতিমত সাহিত্যিকদের আড্ডায় পরিণত করেন। এই আড্ডা থেকেই তাঁর প্রকাশক হবার সুযোগ হয়। বিনস বলেছেন (Norman E. Binns) লিন্‌টট্ সম্বন্ধে: 'He contrived to make his shop a meeting place for the leading writers of the day'। খ্যাতনামা সাহিত্যিক সকলেই প্রায় লিন্‌টটের দোকানে আড্ডা দিতে আসতেন। সেই সুযোগ পেয়েই টনসনের মতো তাঁর রচনা-সঙ্কলন প্রকাশ

করার ইচ্ছা হয়। প্রথমে তিনি টনসনের অনুসরণ করে বিভিন্ন লেখকদের লেখা নিয়ে সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৭১২ সালে তাঁর *Miscellany* প্রকাশিত হয় এবং তাতে গ্রের কবিতা (Gray), সুইফটের (Swift) রচনা এবং পোপের *Rape of the Lock* ছাপা হয়। সঙ্কলন প্রকাশিত হবার পর যথেষ্ট সুনাম হয় তাঁর এবং খ্যাতনামা লেখকদের কাছেও তাঁর মর্যাদা বাড়ে।

১৭১২ সালেই পোপ তাঁর হোমার অনুবাদ আরম্ভ করেন। বিরাট পরিকল্পনা। প্রকাশক পাওয়াও কঠিন। কিন্তু নতুন প্রকাশক হয়েও লিন্‌টট্ এই বিরাট কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে যান। প্রতি খণ্ড অনুবাদের জন্য তিনি পোপকে ২০০ পাউণ্ড করে পারিশ্রমিক দেবেন প্রতিশ্রুতি দেন। ছয়টি খণ্ডে অনুবাদ প্রকাশ করার কথা হয়, প্রতি খণ্ডের দাম ঠিক হয় এক গিনি করে। হোমারের অনুবাদ, কি হবে না হবে তার ঠিক নেই, বিক্রির কোনো নিশ্চয়তা নেই। তা সত্ত্বেও লিন্‌টট্ এইভাবে পোপের সঙ্গে বিরাট অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের চুক্তি করে ফেলেন এবং তাঁকে যে টাকা দিতে রাজী হন, তাও তখনকার দিনে যথেষ্ট। বিশেষ করে বই প্রকাশের আগেই অনুবাদের প্রতি খণ্ডের জন্য ২০০ পাউণ্ড করে দেবার অঙ্গীকার করা সহজ নয়। হোমার অনুবাদ করার জন্য পোপ মোট প্রায় ৫০০০ পাউণ্ড পেয়েছিলেন (প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

পোপের অনুবাদ প্রকাশ করার পরিকল্পনা যখন লিন্‌টট্ করেন, তখন টনসন বেঁচে ছিলেন। পোপের 'ইলিয়াডে'র অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর টনসন তিনদিনের মধ্যে অন্য একটি ইলিয়াডের অনুবাদ (টিকেলের) প্রকাশ করেন। লিনটট্ সঙ্কলন প্রকাশ করে টনসনের অনুকরণ করেছিলেন, টনসন শেষজীবনে তার জবাব দিলেন। প্রকাশকদের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি গোড়া থেকেই ছিল দেখা যায়। যাই হোক্, টনসনই ব্যর্থ হলেন, লিন্‌টটের প্রতিষ্ঠা হল।

১৭২৫ সালে 'ওডেসী'র অনুবাদ প্রকাশিত হল এবং পোপ প্রায় ৩০০০ পাউণ্ড পেলেন অনুবাদের জন্য। এইসময় প্রকাশক লিন্‌টটের সঙ্গে কবি পোপের মনান্তর ঘটল। যেভাবেই হোক্, প্রকাশকের ধারণা হল যে কবি পোপ তাঁর মেহনতের যে-মূল্য পাচ্ছেন, প্রকাশক তা পাচ্ছেন না। চুক্তির উদারতার জন্য লিন্‌টট্ বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। চুক্তির মধ্যে ত্রুটি সন্ধান করতে লাগলেন প্রকাশক। লিখিত চুক্তির মধ্যে খুঁজে-খুঁজে লিন্‌টট্ খুঁত বার করে কবি পোপের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করলেন। কবি হলেও পোপ ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনিও কোমর বেঁধে প্রকাশকের সঙ্গে আদালতে মোকদ্দমা লড়লেন। অবশেষে প্রকাশক লিন্‌টটের সঙ্গে কবি পোপের এই

মনোমালিন্যের ফলে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আদালতে নালিশ করলেও লিন্‌টট্‌ অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করে পোপের কল্যাণে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ১৭৩০ সালে লিন্‌টট্‌ প্রকাশকের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন এবং তার পাঁচ বছর পরে মারা যান। পোপ কিন্তু প্রকাশকের এই আচরণে রীতিমত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং তার জন্য লিন্‌টট্‌কে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। তিনি এ-ব্যাপারে রীতিমত প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন। পরে পোপ তাঁর *The Dunciad*-এর মধ্যে প্রকাশকের বিরুদ্ধে অনেক কটূক্তি করেছেন। প্রকাশক ও লেখকের ইতিহাসে পোপ ও লিন্‌টটের এই কাহিনী অনেক দিক থেকে মূল্যবান। এই কাহিনী থেকে আধুনিক প্রকাশক ও লেখকদেরও অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।

সেক্সপীয়রের প্রকাশক

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রকাশকদের কথা বলেছি। কিন্তু বলা সম্পূর্ণ হয় না, মহাকবি সেক্সপীয়রের প্রকাশকদের কথা কিছু না বললে। প্রত্যেক লেখক ও পাঠক নিশ্চয় অসীম আগ্রহ নিয়ে সেক্সপীয়র ও তাঁর প্রকাশকদের কথা জানতে চাইবেন। অতকাল আগে সেক্সপীয়র প্রকাশক পেলেন কেমন করে? প্রথমেই তো তিনি মহাকবির খ্যাতি অর্জন করেন নি! লেখার জন্য কত টাকা পেতেন সেক্সপীয়র? প্রকাশকরা কি-রকম ব্যবহার করতেন তাঁর সঙ্গে? লেখক ও প্রকাশক উভয়েরই এ-সব কথা জানা উচিত।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বইয়ের ব্যবসায় প্রকাশকদের আদৌ ভিড় ছিল না, প্রতিযোগিতার ঠেলাঠেলিও ছিল না তাঁদের মধ্যে। দু'চারজন, যাঁরা বইয়ের ব্যবসা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের পক্ষে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করা খুব কঠিন ছিল না তখন। ব্যবসাটা প্রায় একচেটে ছিল তাঁদের। সাধারণ লোক ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারত না। স্টার চেম্বার বা স্টেশনার্স কোম্পানীর শীলমোহর পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। দু'চারজন ভাগ্যবান মুদ্রক ও প্রকাশক পেতেন। সাধারণ কৌতূহলীরা দূর থেকে তাঁদের দেখতেন এবং নিশ্চয় মনে-মনে হিংসা করতেন। প্রকাশনের যখন এ-রকম অবস্থা, তখন সাধু উপায় ছেড়ে দিয়ে অসাধু উপায়ে, ছল-চাতুরীর সাহায্যে, কেউ-কেউ যে বই ছাপিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং না করাটাই অস্বাভাবিক। কোথা থেকে বই পেতেন তাঁরা? অবশ্যই লেখকদের কাছ থেকে। চুপিসাড়ে, গোপনে লেখকদের কাছে ঘুরে-ঘুরে, বাড়িতে ধর্ণা দিয়ে তাঁরা নতুন-নতুন অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন এবং ঠিক তেমনি চুপিসাড়ে কোনো ছাপাখানা থেকে ছেপে খুব সস্তা দামে সেগুলি বিক্রি করতেন। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই তাঁরা লেখকদের কাছ থেকে একসঙ্গে কিছু থোক টাকা দিয়ে কিনে নিতেন, কোনো শর্ত বা চুক্তির মধ্যে মাথা গলাতেন না। লেখকরাও তখন নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে খুব যে সচেতন ছিলেন তা নয়। সবেমাত্র পাণ্ডুলিপির অন্ধকার যুগ থেকে তাঁরা মুদ্রিত গ্রন্থের আলোকোজ্জ্বল যুগে পদার্পণ করছেন। বই ছাপা নিয়ে তাঁদের কথা। তাও আবার সকলে পছন্দ করতেন না। এমন অনেক লেখক ছিলেন (সেক্সপীয়রও তাঁদের মধ্যে একজন), যাঁদের হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির কৌলীন্য সম্পর্কে

একটা মিথ্যা ধারণা ছিল। সেক্সপীয়রেরও সেই ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলেই তার আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যায়। শুধু পাণ্ডুলিপির পেট্রনরা নন, লেখকরাও প্রথমে বই ছাপার বিরোধী ছিলেন। কথাটা লেখকদের কাছে আজ তাজ্জব মনে হবে নিশ্চয়। লেখকদেরই যখন এইরকম ধারণা ছিল, তখন যে-কোনো মূল্যে তাঁদের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি কেনাটা খুব কঠিন ছিল না। অনেকে তাই করতেন এবং সস্তায় ছোট-ছোট বই ছেপে বিক্রিও করতেন। এইসময় অশ্লীল যৌন-সাহিত্যেরও প্রচলন হয় খুব বেশি। গোপনে এই অশ্লীল বই ছেপে বিক্রি করে অনেক প্রকাশক পয়সা রোজগার করতেন। লেখকদের দিয়ে লিখিয়েও নিতেন। এঁই শ্রেণীর গ্রন্থ-ব্যবসায়ীদের 'pirate book-seller' বলা হত। পাইরেটই তো! কারণ এঁদের কোনো নীতির বালাই ছিল না, যা পেতেন তাই ছাপতেন এবং এইভাবে লুকিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা করতেন। বড় প্রকাশক বা লেখকদের বইয়ের সস্তা সংস্করণ লুকিয়ে ছেপে বিক্রি করতেও তাঁদের বাধত না। জেল-জরিমানা তাঁরা পরোয়া করতেন না। এই 'পাইরেট' বই-ব্যবসায়ীদের কথা আগেও উল্লেখ করেছি। এইরকম একজন দস্যু ব্যবসায়ীই মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক হয়েছিলেন। তাঁর নাম জন ড্যাণ্টার (John Danter) এবং ১৫৯৪ সালে তিনি প্রথমে সেক্সপীয়রের নাটক 'টাইটাস এ্যাণ্ড্রনিকাস' (*Titus Andronicus*) প্রকাশ করেন। ফ্রাঙ্ক মাম্বি বলেছেন

> It was a pirate, who in the year 1594, first paid Shakespeare the compliment of publishing one of his plays. The pirate was John Danter, the play *Titus Andronicus.* Three years later Danter followed this up with his surreptitious first edition of '*Romœo and Juliet*', printed in quarto from an Imperfect copy, and published anonymously.

১৫৯৪ সালে 'টাইটাস এ্যাণ্ড্রনিকাস' প্রকাশ করার পর পাইরেট ড্যাণ্টার ১৫৯৭ সালে গোপনে বিখ্যাত 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। মাম্বি মন্তব্য করেছেন : 'A more ignoble beginning to a series destined to immortality could scarcely be imagined'. বাস্তবিকই তাই—কল্পনা করা যায় না। রূপকথা মনে হয়, অথচ, বইয়ের কথা এবং সেক্সপীয়রের বইয়ের কথা। এই হল সাহিত্যের আসল ইতিহাস, যা সাহিত্যিকরা বা পাঠকরা জানেন না হয়ত। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা ও ইতিহাস পড়েও যদি সেক্সপীয়রের গ্রন্থের এই অন্তরালবর্তী ইতিহাসটুকু না জানা যায়, তাহলে সেক্সপীয়র ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান

অসম্পূর্ণ থাকে না কি? কুখ্যাত প্রকাশক জন ড্যাণ্টারের প্রতি পাঠকরা, বিশেষ করে লেখকরা, হয়ত ক্রুদ্ধ হবেন। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসে ড্যাণ্টার চিরদিন সেক্সপীয়রের প্রথম প্রকাশকরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সাহিত্যিক ও সাহিত্যের ছাত্রদের আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত। এলিজাবেথ ও প্রথম জেমসের যুগের ইংরেজি নাট্যসাহিত্য, যা বিশ্বসাহিত্যে যুগ-যুগ ধরে আদরণীয় হয়ে আছে—তার অধিকাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকত, যদি ড্যাণ্টার পাইরেটদের মতো ইংলণ্ডের বটতলার প্রকাশকরা না থাকতেন। নিজে কুখ্যাতি বরণ করেও ড্যাণ্টার সে-যুগে সেক্সপীয়রের মতো মহাকবির সুখ্যাতির পথ সুগম করেছিলেন। এর চেয়ে মহত্তর কর্তব্য প্রকাশকের আর কি থাকতে পারে?

শুধু ড্যাণ্টার নন সেক্সপীয়রের প্রকাশকদের মধ্যে অনেকেই ড্যাণ্টারের সমগোত্র ছিলেন। ড্যাণ্টারকে রঙ্গনাট্যে কুৎসিতরূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। 'দি রিটার্ন ফ্রম পার্নাসাস' নাটকে দেখা যায়, সেণ্ট পল গির্জা প্রাঙ্গণে ড্যাণ্টার একখানি অশ্লীল বই প্রকাশ করা সম্পর্কে ইন্‌জেনিওসো নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। ইন্‌জেনিওসো বইখানির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ড্যাণ্টারকে নগদ দক্ষিণায় গছিয়ে দিতে এসেছেন। ইংরেজি কথোপকথনের মর্মানুবাদ করে দিচ্ছি বাংলায়

ইন্‌জেনিওসো: খুব ভাল একখানা বই এনেছি ড্যাণ্টার। ছাপলেই একেবারে বাজার মাৎ হয়ে যাবে। বুঝলে? এতদিন যে সব বই ছেপেছ, সব কানা হয়ে যাবে।

ড্যাণ্টার: তাই নাকি? কিন্তু তোমার আগের বইটা ছেপে আমার লোকসান হয়ে গেছে। ছাপতে বিশেষ ভরসা হয় না আর, যদি অল্পেস্বল্পে দাও তো দেখতে পারি। গোটা চল্লিশ শিলিং নগদ পাবে, আর এক বোতল মদ। দেখ, রাজী আছ?

ইন্‌জেনিওসো: চল্লিশ শিলিং মাত্র? বলছ কি? কিছু বেশি দাও, অন্তত একটা নতুন 'সুট' কিনতে পারি যাতে।

ড্যাণ্টার: বইখানা কি?

ইন্‌জেনিওসো: 'এ ক্রণিকেল অফ কেম্ব্রিজ কাকোল্ডস্।'

ড্যাণ্টার: বেশ, বেশ! তাহলে রাজী আছি ছাপতে। যা চাও তুমি, তাই দেব। চলো, একটু বসে মদ্যপান করতে-করতে কথাবার্তা বলা যাবে। চলো, চলো!

ইন্‌জেনিওসো: চলো, মদে আপত্তি নেই—

ড্যাণ্টারকে এইভাবে সমসাময়িক সাহিত্যে চিত্রিত করা হয়েছে। কে বলবে এই ড্যাণ্টারই সেক্সপীয়রের আদি প্রকাশক ছিলেন?

তখনকার কালের অন্যান্য লেখকদের মতো বই ছাপা সম্বন্ধে সেক্সপীয়রেরও যথেষ্ট

আভিজাত্যবোধ ছিল। ছাপিয়ে বই প্রকাশ করা সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন না। তা ছাড়া, প্রথমে তিনি কবি বলেই পরিচিত ছিলেন। নাটকের আগে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ছাপা হয়। 'ভেনাস এ্যাণ্ড এডোনিস' ছাপা হয় ১৫৯৩ সালে। নাটক লেখার সময় রঙ্গমঞ্চের পরিচালকরাই তার স্বত্বাধিকারী হতেন। কারণ নাটক অভিনয় করার জন্যই প্রধানত লেখা হত এবং তার জন্য মঞ্চাধ্যক্ষদের দ্বারস্থ হতে হত সর্বাগ্রে, প্রকাশকদের নয়। একই নাটক মঞ্চাধ্যক্ষ ও প্রকাশক উভয়ের কাছে বিক্রি করা সম্ভব হত না, কেউ করতে সাহসও পেতেন না। করবার রীতিও ছিল না। তাহলে ড্যাণ্টারের মতো প্রকাশকরা নাটক ছাপতেন কি দেখে এবং কি ভাবে? চুরি করে, গোপনে। চুরি করে লুকিয়ে হয়ত নাটক বা যে-কোনো বই ছাপানো সম্ভবপর, কিন্তু 'কপি' কোথা থেকে পাওয়া যাবে? নাটক অভিনয় হত রঙ্গালয়ে, দর্শকরা দেখতে ও শুনতে যেতেন। পাইরেট প্রকাশকরা 'কপি' সংগ্রহ করার এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। দর্শকের টিকিট কেটে স্টেনোগ্রাফার পাঠিয়ে তাঁরা অভিনয়কালে নাটক লিখিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করেন। পাত্রপাত্রীরা যখন অভিনয় করতেন, প্রকাশকের স্টেনোগ্রাফাররা তখন তাঁদের কথোপকথন, দৃশ্যবর্ণনা সব লিখে নিতেন। এইভাবে লেখক নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষের অগোচরে ও অজ্ঞাতে নাটকের কপি সংগ্রহ করা শেষ হত। ভুলভ্রান্তি যাই থাকুক, সেই কপি থেকেই প্রকাশকরা বই ছাপতেন। এইভাবে কপি সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে নাট্যকার হেউড (Heywood) তাঁর 'কুইন এলিজাবেথ' নাটকের প্রস্তাবনায় বলেছেন

That some by stenography drew
The plot : put it in print :
Scarce one word trew.

সেক্সপীয়রের 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটক ড্যাণ্টার এইভাবে কপি সংগ্রহ করে ছেপে ছিলেন। পরে আর্থার জনসনও ঠিক ঐ একই পদ্ধতিতে 'দি মেরী ওয়াইভ্‌স্‌ অফ উইণ্ডসর' ছাপেন (১৬০২ সালে)। এ-সব নিয়ে প্রতিবাদ করতে লেখকদের আত্মমর্যাদায় বাধত তখন। সেক্সপীয়রও প্রতিবাদ করেন নি। পাইরেট প্রকাশকরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাতে সাহিত্যের কল্যাণ কি অকল্যাণ হয়েছিল, এককথায় বলা যায় না। মনে হয় কল্যাণই হয়েছিল।

জনসনের যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশকরা সাবালক হয়ে ওঠেন। তার আগে পর্যন্ত তাঁরা নাবালক ছিলেন বললে ভুল হয় না, কারণ সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পেট্রনরা তখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকাশকদের উপর কর্তৃত্ব করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যের সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর বিকাশ হয় এবং পাঠকরাই ক্রমে লেখক ও প্রকাশকদের পেট্রন হয়ে ওঠেন। প্রকাশকরা আত্মনির্ভর হয়ে পেট্রনদের প্রভাবমুক্ত হন এবং লেখকরাও ক্রমে তাঁদের রুজি-রোজগারের ব্যাপারে প্রকাশকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।

পেট্রন-প্রভাবমুক্ত প্রকাশক ও পাঠকগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে অলিভার গোল্ডস্মিথ এই সময় লেখেন

> At present the few poets of England no longer depend on the great Patrons for subsistence ; they have now no other patrons than the public.

ফ্রাঙ্ক মাম্বি কবি গোল্ডস্মিথের এই উক্তিপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'And the publisher, at the same time, had superseded the patron as the author's paymaster.' অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সত্যিকার প্রকাশকদের আবির্ভাব হল সাহিত্যক্ষেত্রে। এইসময় থেকেই পেট্রনরা একরকম বিদায় নিলেন। সাধারণ পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হল এবং তাঁরাই প্রকাশক ও লেখকদের পেট্রন হলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে বইয়ের ব্যবসায়ে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লাইসেন্স-প্রথা একরকম বাতিল হয়ে যাবার ফলে বইয়ের বাজারে মন্দা আসে। স্টেশনার্স রেজিস্টারে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়, বইয়ের বাজারে কতখানি মন্দা এসেছিল

১৭০১ সাল :	৩ খানা বই
১৭০২ সাল :	২ খানা বই
১৭০৩ সাল :	৪ খানা বই
১৭০৪ সাল :	৫ খানা বই

১৯০৫ সাল :	৫ খানা বই
১৯০৬ সাল :	২ খানা বই
১৯০৭ সাল :	৩ খানা বই
১৯০৮ সাল :	২ খানা বই

লণ্ডনের প্রকাশক ও বই-ব্যবসায়ীরা তাঁদের স্বার্থরক্ষার অন্য কোনো উপায় না দেখে ১৭০৩ সালে একবার, ১৭০৬ সালে দ্বিতীয়বার এবং ১৭০৯ সালে তৃতীয়বার পার্লামেন্টে আবেদন করেন লাইসেন্স এ্যাক্ট-এর জন্য। তৃতীয়বার তাঁদের আবেদনের ফলে রাণী এ্যানের বিখ্যাত কপিরাইট এ্যাক্ট (Copyright Act) ১৭০৯ সালে সর্বপ্রথম পাশ করা হয়। সাহিত্য-জগতে এই সর্বপ্রথম কপিরাইট আইন পাশ করা হল। লেখক বা প্রকাশকদের কি সুবিধা হল, না হল সেটা বড় কথা নয়। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থাকে মোটামুটি বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার চেষ্টা করা হল। তার আগে লেখক বা প্রকাশকের বিশেষ কোনো বিধিসম্মত পদমর্যাদাই ছিল না। অন্যান্য ব্যবসার মতো বইয়ের ব্যবসাও চলত এবং প্রকাশক ও লেখকের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক। প্রকাশকরা ছিলেন ক্রেতা আর লেখকরা ছিলেন বই বা পাণ্ডুলিপির বিক্রেতা। কপিরাইট আইনে লেখক প্রথমে লেখকের মর্যাদা পেলেন এবং প্রকাশক প্রকাশকের। লেখক হয়ত লাভবান হন নি, তাঁর স্বার্থের ক্ষতিই হয়েছিল। তবু লেখক যে কেবল পাণ্ডুলিপির ফিরিওয়ালা নন এবং পাণ্ডুলিপিটা যে রুটি-মাখনের মতো কোনো জিনিস নয়, একথা কপিরাইট আইনে প্রথম বুঝিয়ে দেওয়া হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বই-প্রকাশের চেষ্টা করা হয় প্রথম। প্রত্যেকটি বইয়ের জন্যে 'শেয়ার' বিক্রি করা হত এবং নিজেদের শেয়ার অনুযায়ী অংশীদাররাও প্রকাশের জন্য মূলধন যোগাতেন। বই প্রকাশিত হবার পর যা খরচ পড়ত, সেই দামে অংশীদারদের নিয়োজিত মূলধন অনুযায়ী বই দিয়ে দেওয়া হত। অথবা সেই দামে যত বই হয় তার বিক্রিত মূল্য মুনাফাসহ তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হত। এইভাবে জনসনের *Lives of the Poets* প্রথম প্রকাশিত হয়। চ্যাপ্টার কফি হাউস নামে একটি সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের ক্লাব থেকে এই কো-অপারেটিভ প্রকাশনের পরিকল্পনা হয় বলে, এই পদ্ধতিতে প্রকাশিত বইগুলিকে 'Chapter Books' বলা হত। পরবর্তীকালের 'Trade Books'-এর ইতিহাসও তাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বইয়ের ব্যবসায়ের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এক-একটি অঞ্চলে এক-এক বিষয়ের গ্রন্থ-ব্যবসায়ী কেন্দ্রীভূত হতে থাকেন। যেমন সমস্ত ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির ব্যবসাকেন্দ্র

হয় লিট্‌ল ব্রিটেন ও পেটারনস্টার রো ; ক্লাসিক ও ধর্মগ্রন্থের কেন্দ্র হয় সেণ্ট পল ক্যাথিড্রাল ; আইন, ইতিহাস ও নাট্যগ্রন্থের কেন্দ্র হয় টেম্পল বার ; এবং স্ট্রাণ্ডে ফরাসী ব্যবসায়ীরা দোকান খোলেন। কতকটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের আঞ্চলিক সমৃদ্ধির মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও গ্রন্থ-ব্যবসায়ের বিকাশ হতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা যায়, দুই শ্রেণীরই প্রকাশক ছিলেন ইংলণ্ডে। এক শ্রেণীর প্রকাশক পূর্বোক্ত পাইরেট প্রকাশকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছিলেন। তাঁদের বিবেক বা বিবেচনা বলে কোনো পদার্থ ছিল না, সাহিত্যানুরাগও বিশেষ ছিল না। দু' একজন ড্যাণ্টার দৈবাৎ সেক্সপীয়রের মতো প্রতিভাবান সাহিত্যিকের প্রকাশক হয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু সাধারণত সাহিত্যিকরা এই শ্রেণীর প্রকাশকদের কি চোখে দেখতেন তার আভাষ পাওয়া যায় এ্যাডিসনের (Addison) কঠোর মন্তব্য থেকে। এ্যাডিসন বলেছেন

> They were the set of wretches we authors call pirates who print any book, poem or sermon as soon as it appears in the world, in smaller volume, and sell it, as all other thieves do stolen goods, at a cheaper rate. —*Tatler*.

অন্য আর-এক শ্রেণীর প্রকাশক ছিলেন জেকব টনসন ও বার্নাড লিন্‌টটের মতো (আগে এঁদের কথা বলেছি), যাঁদের শ্রদ্ধা ছিল সাহিত্যিকদের প্রতি এবং বইয়ের ব্যবসাকে যাঁরা অন্যচোখে দেখতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরও কয়েকজন বিখ্যাত প্রকাশকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা সাহিত্য ভালবাসতেন এবং সাহিত্যিকের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধাও ছিল যথেষ্ট। এই প্রকাশকদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে রবার্ট ডড্‌স্‌লের (Robert Dodsley) নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বড়লোকের বাড়ির একজন নগণ্য ভৃত্য ছিলেন ডড্‌স্‌লে। লর্ড-লেডী যখন কোচগাড়িতে বেড়াতে বেরুতেন তখন তিনি তাঁদের গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়তেন। বাড়ি ফিরে আস্তাবলের ঘোড়া ও গাড়ির সেবাযত্ন করে তাঁর দিন কাটত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ছিল এবং কবিতা লিখতেন তিনি লুকিয়ে। আস্তাবলে বসে তিনি যে কাব্যরচনা করেন তা ১৭২৯ সালে *Servitude* নামে এবং ১৭৩২ সালে *The Footman's Miscellany* নামে প্রকাশিত হয়। বই প্রকাশিত হবার পর সমসাময়িক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়। যাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তাঁদের মধ্যে ডানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe) ও আলেকজাণ্ডার পোপ (Alexander Pope) অন্যতম। ডিফোর

বয়স তখন ৬৮ বছর। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ডড্‌স্‌লের কবিতা সংশোধন করে দিতেন এবং তাঁকে উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। নিজের লেখা বই থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করে এবং সহানুভূতিশীল সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য নিয়ে ডড্‌স্‌লে ক্রমে প্রকাশনের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা ডড্‌স্‌লেকে টাকা দিয়ে প্রথমে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে পোপ একজন। ১৭৩৫ সালে ডড্‌স্‌লে প্রকাশকের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং পল্‌মলে তাঁর দোকান খোলেন। পল্‌মলে ডড্‌স্‌লের এই বইয়ের দোকান অল্পদিনের মধ্যেই সমসাময়িক সাহিত্যিকদের আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রকাশক হিসেবে লেখকদের সঙ্গে ডড্‌স্‌লের যে কোনদিন কোনো কারণে মতান্তর ও মনান্তর হয় নি, তা নয়। অনেকবার হয়েছে, কিন্তু তবু তখনকার অন্যান্য প্রকাশকদের সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না। নিজে সাহিত্যিক হওয়ার জন্য ডড্‌স্‌লের যে সাহিত্য-প্রীতি ছিল তা খাঁটি, তার মধ্যে ব্যবসায়ীর চাল বা ভেজাল ছিল না। লেখকদের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কে মতান্তর হলেও, তিনি কোনদিন গভীর মনান্তরে তা পরিণত হতে দেন নি। ডড্‌স্‌লের বিশেষ বন্ধু ছিলেন হোরেস ওয়ালপোল (Horace Walpole)। একবার জর্জ মণ্টেগুকে একটি চিঠিতে ওয়ালপোল লিখেছিলেন ডড্‌স্‌লে সম্বন্ধে: 'You know how decent, humble, inoffensive a creature Dodsley is; how little apt to forget or disguise his having been a footman.' সত্যিই তাই। এইজন্যই ডড্‌স্‌লের চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রবীণ ও নবীন, সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক তাঁর কাছে যেতেন। রীতিমত সাহিত্যিকদের সমাবেশ হত তাঁর বইয়ের দোকানে। এইরকম সমাবেশে স্যামুয়েল জনসনও তখন যাতায়াত করতেন। কেউ তখন তাঁর নাম জানত না। বড়-বড় সাহিত্যিকদের আড্ডা হত ডড্‌স্‌লের দোকানে। জনসন তাতে যোগ দিতেন, রঙ্গরসিকতা করতেন, টিপ্পনি কাটতেন। জনসন নিজে ছিলেন পুস্তক-ব্যবসায়ীর সন্তান। তিনি জানতেন, বইয়ের ব্যবসায় দায়িত্ব কতখানি। তাই তাঁর 'লণ্ডন' রচনাটি নিয়ে তিনি ছদ্মবেশে ডড্‌স্‌লের কাছে প্রথমে যান, নিজের পরিচয় দেন নি। ডড্‌স্‌লে যখন রচনাটির বিলক্ষণ তারিফ করেন এবং খুশী হয়ে প্রকাশ করতে রাজী হন, তখন জনসনের আনন্দের আর সীমা রইল না। যাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি ডড্‌স্‌লের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি জানালেন

> I was today with Mr. Dodsley, who declares very warmly in favour of the paper you sent him, which he desires to have a share in ..

জনসনের 'লণ্ডন' প্রকাশ করে ডড্‌স্‌লে লাভবানই হয়েছিলেন। তারপর আর ন'দশ বছরের মধ্যে তিনি জনসনের কোনো বই প্রকাশ করেন নি। ডড্‌স্‌লের পরবর্তী কীর্তি হল জনসনকে দিয়ে 'ডিক্‌শনারী' লেখানো। বসওয়েল (Boswell) লিখেছেন যে, ডড্‌স্‌লে ১৫৭৫ পাউণ্ড দিয়ে জনসনের সঙ্গে 'ডিক্‌শনারী'র চুক্তি করেন। কিন্তু ১৫৭৫ পাউণ্ডও অভিধান রচনা শেষ হবার আগে জনসন খরচ করে ফেলেন। একবার বসওয়েল এ-সম্বন্ধে জনসনকে বলেন

I am sorry, sir, you did not get more for your *Dictionary*.

উত্তরে জনসন বলেন

I am sorry too. But it was very well. The book-sellers are generous, liberal-minded men.

বসওয়েল লিখেছেন যে জনসনের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল প্রকাশকদের উপর। নিজে পুস্তক-ব্যবসায়ীর পুত্র বলে নয়, ডড্‌স্‌লের মতো শ্রদ্ধেয় প্রকাশকদের সংস্পর্শে আসার জন্য তাঁর মনে এ ধারণা হয়েছিল। বসওয়েল বলেছেন জনসন সম্বন্ধে: 'He considered them (প্রকাশকদের) as the patrons of literature ; and indeed, although they have eventually been considerable gainers by his *Dictionary* it is to them that we owe its having been undeitaken and carried through at the risk of great expense.. '

'ডিক্‌শনারী' ছাড়াও ডড্‌স্‌লে জনসনের অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি করার সময় জনসন একটি বিচিত্র শর্ত সবসময় করে নিতেন চুক্তিপত্রে। তাঁর গ্রন্থের অন্তত একটি সংস্করণ প্রকাশের অধিকার তাঁর নিজের থাকবে এবং তিনি যে-কোনো সময় তা প্রকাশ করতে পারবেন। এ-সম্বন্ধে বসওয়েল মন্তব্য করেছেন যে, জনসনের ইচ্ছা ছিল, তাঁর সমস্ত গ্রন্থের একটি সংস্করণ নিজে প্রকাশ করে তার সম্পূর্ণ মুনাফাটি তিনি ভোগ করেন

It being his fixed intention to publish at some period, for his own profit, a complete collection of his works.

জনসনের গ্রন্থাবলী ছাড়াও ডড্‌স্‌লে অন্যান্য আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যে গ্রে'র *Elegy*, স্টার্নের (Sterne) *Tristram Shandy* ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়া ডড্‌স্‌লে সম্পূর্ণ একা পরিশ্রম করে দ্বাদশ খণ্ডে ইংরেজি *Old plays* এবং তিনখণ্ডে *Poems by Several Hands* প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই এই পনের খণ্ড বই সম্পাদন করেন। ইংরেজি সাহিত্যে কেবল জনসনের

অন্যতম প্রধান প্রকাশক হিসেবে নয়, এই কয়েকখণ্ড গ্রন্থের জন্তও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রকাশক যে সাহিত্যের উন্নতিসাধন কতখানি করতে পারেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ প্রকাশক ডড্‌স্‌লে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।*

*জনসনের যুগ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক G. M. Trevelyan-এর *English Social History* (1948, London) গ্রন্থের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় (*Dr. Johnson's England* I, II & III) এবং A. S Turberville-এ সম্পাদিত *Johnson's England:* An Account of the Life and Manners of his Age গ্রন্থ (দুই খণ্ড) পঠিতব্য। সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান সামাজিক উপকরণ এই বইগুলিতে আছে।

একটা যুগ শেষ হল

জনসনের যুগের পর বইয়ের ইতিহাসের একটা যুগ শেষ হয়ে গেল বলা চলে। ভাল-মন্দ মিশিয়ে একটা যুগ। পাইরেট প্রকাশকের যুগ, উদার সাহিত্যানুরাগী প্রকাশকের যুগ। ড্যাণ্টার ও ডড্সলের যুগ। ১৭৮৪ সালে জনসন যখন মারা গেলেন তখন একটা মন্দের ভাল যুগও অস্তাচলে গেল। মারি, কন্স্টেবল, লংম্যান প্রভৃতি বড়-বড় প্রকাশকদের যুগ হল উনবিংশ শতাব্দী। মধ্যে কিছু দিন আবার সেই মন্দার ইতিহাস।

বইয়ের জগতে লংম্যানরা (Longmans) তখনও প্রায় শিক্ষানবিশী করছেন। দ্বিতীয় জন মারি (John Murray), যিনি মারিদের গৌরব, তখন মাত্র ছ'বছরের শিশু, ব্যবসায়ের কিছুই জানেন না ও বোঝেন না। কবি বাইরন তখনও জন্মান নি। কন্স্টেবল (Archibald Constable) হয়ত তখন মারির চেয়ে বছর চারেকের বড় হবেন। একজন কবি শুধু দূরে পাহাড়ের কোলে বসে জীবনের কি গভীর তাৎপর্যের হদিশ পেয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। নিজেরই কল্পিত যন্ত্রণায় তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। প্রকাশকের সঙ্গে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করছিলেন, কবিখ্যাতি অর্জন করার জন্য নয়, বাইরে কোথাও চলে যাবার জন্য। প্রকাশক যদি সামান্য কিছু দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করেন, তাহলে তিনিও ভাগ্যের অন্বেষণে কোথাও বিদায় হতে পারেন, এই মনে করে কথাবার্তা চলছিল কবির সঙ্গে প্রকাশকের। প্রকাশক হলেন জন উইলসন (John Wilson), কবি হলেন রবার্ট বার্নস (Robert Burns)। কবি বার্নস মনস্থ করেছিলেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি যা দক্ষিণা পাবেন, তাই নিয়ে বুক-কিপারের চাকরি করতে চলে যাবেন। ১৮৭৬ সালে, তিন শিলিং করে চাঁদা নিয়ে তাঁর বই ছেপে বাজারে বেরুল। রবার্ট বার্নসের প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ। এ-বইয়ের একখানা কপিও আজও পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করতে পারেন নি। বার্নসের 'কটেজ মিউজিয়ামে'র (Cottage Museum) জন্য ট্রাষ্টিরা একটি কপি কোনো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিলেন, এক হাজার পাউণ্ড মূল্য দিয়ে। আর-একটি কপি ভাগ্যবান কোনো ব্যক্তি ১৯২৫ সালে কিনেছিলেন ১৭৫০ পাউণ্ড মূল্যে। প্রথম বইখানি ৬০০ কপি ছাপা হয়েছিল এবং খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বার্নস পেয়েছিলেন কুড়ি পাউণ্ড। তাতেই তিনি খুশী হয়েছিলেন। পরে তিনি এ-সম্বন্ধে লিখেছিলেন

I threw off six hundred copies for which I got subscriptions for about three hundred and tifty. My vanity was highly gratified by the reception I met with from the public ; and besides I pocketed, all expenses deducted, nearly twenty pounds. This came very seasonably, as I was thinking of indenting myself, for want of money to procure my passage. As soon as I was master of nine guineas, the price of wafting me to the torrid zonc, I took a steerage passage in the first ship that was to sail from the Clyde ; for

Hungry ruin had me in the win.

নয় গিনি পকেটে নিয়ে, কবিতা বেচে, বার্নস সাগর পাড়ি দিলেন। কিসের সন্ধানে? কাব্যের প্রেরণার সন্ধানে নয়, জীবিকার অন্বেষণে। এডিনবরায় গিয়ে বার্নস 'literary lion of the day' হলেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হল না। তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ শেষ হবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য তিনি যখন তাঁর প্রকাশক উইলসনকে অনুরোধ করলেন, তখন উইলসন তা পরোক্ষে প্রত্যাখ্যান করলেন। পরোক্ষে বলার কারণ, উইলসন বললেন যে, কবি বার্নস যদি তাঁর বইয়ের জন্য কাগজ কিনে দেন তাহলে কষ্ট করে ছেপে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন। বার্নসের টাকা ছিল না কাগজ কিনে দেওয়ার মতো। স্কটল্যাণ্ডের অন্য একজন প্রকাশক উইলিয়াম ক্রীচ (William Creech) রাজী হলেন বই ছাপতে, কিন্তু তাও চাঁদা তুলে। স্কটিশ অভিজাতশ্রেণীর উপর বার্নসের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। বড়-বড় লর্ডরা তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হলেন। লর্ড এগলিন্টন নিজে বিয়াল্লিশ কপি বই কিনতে স্বীকৃত হলেন। প্রকাশকের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বার্নস বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অনেক চিঠিপত্র লিখেছিলেন এইসময়। অবশেষে তিনি বইখানার লভ্যাংশ থেকে যখন ৫০০ পাউণ্ড পান তখন খুশী হন মোটামুটি।

সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে বার্নসকে। দারিদ্র্যের পীড়ন যত বেড়েছে, তত তাঁর জিদও বেড়েছে। দেশবাসী বা প্রকাশক কেউ তাঁর বিরাট প্রতিভার বিশেষ সমাদর করেন নি সেদিন। শেষে স্কটল্যাণ্ডবাসী তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ৭০০ পাউণ্ড চাঁদা তুলে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এইটাই তাঁদের ঔদাসীন্যের একমাত্র সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণ। তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে ১৮০০ সালে তিনি ১৪০০ পাউণ্ড পান।

বার্নস ছাড়াও আরও একজন কবি এইসময় তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটা দিন প্রকাশকের সন্ধানে কাটাচ্ছিলেন। তিনি উইলিয়াম কুপার (William Cowper)। খ্যাতনামা প্রকাশক জোসেফ জনসন ছিলেন কুপারের প্রকাশক। বার্নসের মতো কুপারের অদৃষ্ট অতটা মন্দ ছিল না। প্রকাশকের কাছ থেকে তিনি ততটা দুর্ব্যবহার পান নি, যতটা বার্নস পেয়েছিলেন। লেডী হেস্কেথকে (Lady Hesketh) একখানি পত্রে কুপার লিখেছিলেন

> Johnson behaves very handsomely in the affairs of my two volumes. He acts with a liberality not often found in person of his occupation, and to mention it when occasion calls me to it is a justice due to him.

সাহিত্যিক ও কবিমাত্রই একটু বেশি ভাবপ্রবণ। তাই সামান্য উপকৃত হলেই উচ্ছ্বাসের টানে তাঁরা অনেক কথা বলে ফেলেন। কুপারও তাই বলেছেন। তাই দিয়ে প্রকাশকের চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। জনসন বাজারের অনেক প্রকাশকের চেয়ে হয়ত সৎ ও উদার ছিলেন। তবে তার জন্য কুপারের স্তুতি তাঁর প্রাপ্য কি না বলা যায় না। স্তুতি উচ্চারিত হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই এই জনসনের সঙ্গে কুপারের বিরোধ বাধল হোমারের অনুবাদ নিয়ে। তারপর ঐ মহিলাকেই তিনি আবার জনসন সম্বন্ধে যা লেখেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কুপার লেখেন

> I am not much better pleased with the dealers in authors than yourself It would be calling Johnson a knave, and telling the public that I think him one. Now, though I do not perhaps think so highly of his liberality.. as I was once . disposed to think, yet I have no reason at present to charge him with dishonesty.. if I am wronged, must comfort myself with what somebody has said – that authors are the natural prey of booksellers.

কুপার অবশ্য পরে পোপের মতো টাকা-পয়সা ও নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে খুব বেশি মাত্রায় সজাগ হয়েছিলেন। সুতরাং গোড়াতে যে-দৃষ্টিতে তিনি তাঁর প্রকাশককে দেখতেন, পরে আর তা দেখতেন না। জনসন সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাও তেমন ছিল না পরে। জনসন হয়ত বিরাট আদর্শ-পুরুষ ছিলেন না ঠিকই। প্রকাশক হিসেবেও তিনি যে খুব উদার, মহানুভব ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন তা নয়। প্রধানত তিনি ব্যবসায়ীই ছিলেন।

কিন্তু তাহলেও প্রকাশক হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর দান অল্প নয়। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেক লেখকের লেখা তিনি সাহস করে প্রকাশ করেছিলেন তখন, যা অন্য অনেকে করেন নি। শুধু যে তিনি বই প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, নিজেও তিনি বিপ্লবীদের মতামত পোষণ করতেন। তার জন্য তিনি অনেক কষ্টও সহ্য করেছেন। গিলবার্ট ওয়েকফিল্ডের (Gilbert Wakefield) বই ছেপে জনসন ন'মাস কারাদণ্ডও ভোগ করেছিলেন। তখনকার দিনে এটা একটা রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ছাড়া, জনসনের সঙ্গে উইলিয়াম ব্লেকের (William Blake) সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। ব্লেকের *The French Revolution* বই তিনি প্রকাশ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের আর-একটি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'ক্যাডেল ও স্ট্রাহান্' (Cadell & Strahan)। 'ক্যাডেল ও স্ট্রাহান্' দু'জনেই জনসনের *Lives of the Poets*-এর অংশীদার প্রকাশক ছিলেন। পরে তাঁরা দু'জন লণ্ডনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রকাশক হয়েছিলেন। হিউম (Hume), গিবন (Gibbon), এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের বড়-বড় গ্রন্থ প্রকাশ করার দায়িত্ব তাঁরাই নিয়েছিলেন। সমগ্র ইংরেজ জাতি সেজন্য আজ তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রকাশক হিসেবে তাঁরা যে সুধী-সমাজে কতখানি শ্রদ্ধেয় ছিলেন তা দার্শনিক হিউমের একটি উক্তি থেকেই বোঝা যায়। গিবনের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *Decline and Fall of Roman Empire* প্রকাশিত হবার পর একটি কপি তাঁরা হিউমকে উপহার দেন। গিবনের বই পেয়ে প্রকাশককে হিউম লেখেন

> There will be no book of importance now printed in London, but through your hands and Mr. Cadell's.

গিবন, হিউম, এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থ প্রকাশ করে 'ক্যাডেল ও স্ট্রাহান্' অমর হয়ে আছেন। কি-রকম ব্যবহার করতেন তাঁরা লেখকদের সঙ্গে, গিবনের একটি দৃষ্টান্ত থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। গিবনের *Roman Empire* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় মাত্র একহাজার কপি। অল্পদিনের মধ্যে সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় দেড়হাজার কপি এবং তৃতীয় সংস্করণ আরও হাজার কপি। এই তৃতীয় সংস্করণের দেনা-পাওনার একটি হিসেব প্রকাশকদের পুরানো হিসেবপত্রের দপ্তরে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাই থেকে দেখা যায় যে লেখক অর্থাৎ গিবন নিজে মুনাফার তিনভাগের দুইভাগ নিয়েছিলেন এবং প্রকাশক দু'জন বাকি একভাগ দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। গিবনের *Decline and Fall of Roman Empire* (প্রথম খণ্ড, ৩য় সং) গ্রন্থের হিসেব এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি

ছাপা বাবদ :	১১৭ পাউণ্ড
১৮০ রীম কাগজ :	১৭১ পাউণ্ড
প্রুফ রীডার :	৫-৫-০ পাউণ্ড
বিজ্ঞাপন ইত্যাদি :	১৬-১৫-০ পাউণ্ড
মোট	=৩১০ পাউণ্ড
১৬ শিলিং মূল্যে একহাজার বই বিক্রি	=৮০০ পাউণ্ড
প্রকাশন-ব্যয়	=৩১০ পাউণ্ড
মুনাফা	=৪৯০ পাউণ্ড
লেখক গিবনের লভ্যাংশ (তিনভাগের দু'ভাগ)	=৩২৬-১৩-৪ পাউণ্ড
প্রকাশকদের লভ্যাংশ	=১৬৩-৬-৮ পাউণ্ড
	=৪৯০ পাউণ্ড

এই হিসাবটি সাহিত্যের ইতিহাসের একটি মূল্যবান 'ডকুমেণ্ট' হয়ে আছে। প্রকাশক যে কত উঁচুস্তরের হতে পারেন এটা তার ঐতিহাসিক প্রমাণ। ইতিহাসের বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে লেখক এই মুনাফা ভোগ করছেন এবং প্রকাশকরা বইয়ের লোকপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বেশি লাভ করতে চাইছেন না। হলেনই বা তিনি গিবন, তাতে ক্ষতি কি ? আমাদের দেশে কোনো গিবনের সে-রকম সৌভাগ্য হয় নি এবং কবে হবে তারও ঠিক নেই। ক্যাডেল ও স্ট্রাহানের মতো প্রকাশকের ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যায়, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজি সাহিত্য অকারণে এত বড় হয় নি। ইংরেজি সাহিত্যের বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রধান কারণ, যুগোপযোগী বড়-বড় প্রকাশকদের পোষকতা। রাজসভার পোষকতা না পেলে বহু রাজকবির প্রতিভার যেমন অকালমৃত্যু হত, দূরদর্শী ও উদ্যোগী প্রকাশকদের সহযোগিতা না পেলে তেমনি আধুনিক যুগের ইংরেজি সাহিত্যের অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিকের প্রতিভার সম্যক বিকাশ হত না।

স্বর্ণযুগের সূচনা

লেখক ও প্রকাশকের স্বর্ণযুগ বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীকে। ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র বাণী নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল লেখকদের মনে। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক পুনর্জীবনের মধ্যে সেই নতুন প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে-যুগের মুখপাত্র ছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট, বাইরন, শেলী, কীটস। লেখকদের মতো একই বিক্রেতার মতো ফিলিপসও তখনকার দিনে বইপত্রের সঙ্গে পেটেণ্ট ওষুধ ও সাহিত্যকে তাঁরা প্রকাশ করে প্রচার করেছিলেন।

মারি (Murray), কন্‌স্টেবল (Constable), লংম্যান (Longman) প্রভৃতি বড়-বড় প্রকাশকরা এইসময় বইয়ের জগতে যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁদের কথা বলার আগে একজন স্বল্পখ্যাত প্রকাশকের কথা সর্বাগ্রে বলতে হয়, তাঁর নাম রিচার্ড ফিলিপস (Richard Phillips)। অন্যান্য অনেক পুস্তকবিক্রেতার মতো ফিলিপসও তখনকার দিনে বইপত্রের সঙ্গে পেটেণ্ট ওষুধ ও নানারকম জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। ব্যবসা ছেড়ে তিনি সাহিত্যের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হলেন এবং 'লিসেষ্টার হেরাল্ড' পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। হোসিয়ারী, পেটেণ্ট ওষুধ ও সাহিত্যের ব্যবসায়ী হলেও, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য তিনি দুঃখও বরণ করেছেন যথেষ্ট। টম পেইনের *Rights of Man* বিক্রি করার জন্য ১৭৯২ সালে তিনি দেড়-বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রিষ্টলের সাহায্যে তিনি জেলখানা থেকেই 'হেরাল্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। পরে 'মিউজিয়াম' বলে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। ভাল-ভাল বই সুলভ মূল্যে প্রকাশ করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি ; কিন্তু প্রকাশক হিসেবে শেষ পর্যন্ত তিনি খুব কৃতকার্য হতে পারেন নি, তাঁর আদর্শপ্রীতির আতিশয্যের জন্য।

উনবিংশ শতাব্দী হল, মারি, লংম্যান ও কন্‌স্টেবলদের যুগ। মারিপরিবার প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকেই বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল তখন 'ম্যাক মারি' (MacMurry)। পরে তিনি 'ম্যাক' কথাটি বর্জন ক'রে শুধু 'মারি' হন এবং নৌ-বিভাগের চাকরি থেকে অর্ধেক বেতনে অবসর গ্রহণ করে ১৭৬৮ সালে ফ্লিট ষ্ট্রিটে 'উইলিয়াম স্যাণ্ডবির' পুরানো প্রতিষ্ঠানটি কিনে ফেলে ব্যবসা আরম্ভ করেন।

নৌ-বিভাগের 'চলন্ত জাহাজ' মারি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠাতা মারি ১৭৯৩ সালে যখন মারা যান, তখন তাঁর দোকানের সেলসম্যান স্যামুয়েল হাইলেকে (Samuel Highley) তিনি তাঁর উইলের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে যান। দ্বিতীয় জন মারি ফ্লিট স্ট্রিটে ব্যবসা আরম্ভ করেন এই অংশীদারকে নিয়ে।

হাইলে বই বিক্রির ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী ছিলেন, কারণ অন্যের প্রকাশিত বই বিক্রি করে কমিশন পাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ, তার মধ্যে কোনো দায়িত্ব নেই। দ্বিতীয় জন মারি তখন কিশোর বালক, তাই মনে-মনে ইচ্ছা থাকলেও তিনি হাইলের এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন নি। পরে তিনি যখন সাবালক হন, তখন ১৮০১ সালে তিনি এ-সম্বন্ধে একজন নাট্যকারকে লিখেছিলেন : 'The truth is that during my minority I have been shackled to a drone of a partner.'

দু'বছর পরে মারির সঙ্গে সেলসম্যান অংশীদার হাইলের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মারি ছিলেন রোমান্টিক যুগের আদর্শ প্রতিনিধি, অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও প্রগতিশীল। তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে, ইংলণ্ডের আদর্শ শ্রেষ্ঠ প্রকাশক হবেন এবং প্রতিভাবান লেখকরা তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেই পাঠকচিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। হাইলের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়া খুব স্বাভাবিক। মারি প্রকাশনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন বিরাট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পরে তাঁর উদ্দেশ্য যে কতখানি সার্থক হয় তা বাইরন ও স্কটের মন্তব্য থেকেই যে কেউ বুঝতে পারবেন। মারিদের সম্বন্ধে বাইরন বলেছিলেন, 'Anak of Publisher' এবং স্কট বলেছিলেন, 'Emperor of the West'। সত্যিই তাই।

লেখক ও প্রকাশকরা শুধু যে লণ্ডনেই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তা নয়। লণ্ডনই অবশ্য প্রধান কেন্দ্র ছিল ; কিন্তু এইসময় একজন প্রকাশক অন্তত লণ্ডন থেকে অনেক দূরে অন্য একটি কেন্দ্রে সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আর্কিবল্ড কনস্টেবল (Archibald Constable)। এডিনবারাতে কনস্টেবল ব্যবসা আরম্ভ করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে। লণ্ডনের একচেটিয়া আধিপত্য তিনিই প্রথম খর্ব করেন। মাম্বি বলেছেন কনস্টেবল সম্বন্ধে[১] : 'A man of rare sagaciy and enterprise, Constable gauged the public taste to a nicety, and paid generously for his books. Gradually collecting the best authors about him, he raised the prestige of the publishing trade throughout Scotland, and made

১ F. Mumby : *Publishing and Bookselling*, 254

Edinburgh a centre of scholarship and literature' ১৮০২ সালে কন্স্টেবল 'এডিনবারা রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং ওয়াল্টার স্কট ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্কটের *Sir Tristram* এবং *Lay of the Last Minstrel* প্রকাশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই কন্স্টেবল লণ্ডনের প্রকাশক-মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। লেখক মহলে তাঁর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সকলেই সজাগ হন। 'এডিনবারা পত্রিকা' বিক্রির জন্য লণ্ডনে লংম্যানরা (Longmans) দায়িত্ব নেন। কন্স্টেবলের সঙ্গে লংম্যানের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে মতভেদের জন্য তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং মারি হন 'এডিনবারা পত্রিকা'র লণ্ডন প্রকাশক। কিন্তু মারির সঙ্গেও পরে লংম্যানের মনোমালিন্য হয় এবং মারি স্বতন্ত্রভাবে *Quarterly* পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন।

লংম্যানের সঙ্গে কন্স্টেবলের যখন ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন টমাস নর্টন লংম্যান ব্যবসায়ের মালিক। তিনি হলেন দ্বিতীয় লংম্যান। ১৭৯৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয় লংম্যান প্রতিষ্ঠানের কর্তা হন। এই তৃতীয় টমাস লংম্যানই তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাহিত্যজগতে যে নতুন আদর্শ ও প্রেরণার সঞ্চার হয় ফরাসী বিপ্লবের পর, তার বিকাশ হয় প্রধানত ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যে। লংম্যান সেই কাব্য-সাহিত্য প্রকাশ করে যেমন ইংরেজি সাহিত্যের প্রগতির পথ পরিষ্কার করে দেন, তেমনি কবিদেরও আত্মপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। শুধু তাই নয় – ইংলণ্ডের পাঠকগোষ্ঠীর মনে তাঁরা নতুন সাহিত্যের রুচি জাগিয়ে তোলেন। শুধু বই প্রকাশ করা নয়, লেখক তৈরি করা এবং সুস্থ রুচিসম্পন্ন পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তোলা যে প্রকাশকদের অন্যতম কর্তব্য, একথা লংম্যান, মারি প্রভৃতি সকলেই জানতেন। প্রকাশকের সেই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। বাইরন, স্কট, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সকলের সঙ্গে গভীর সৌহার্দের সম্পর্ক লংম্যানরা স্বচ্ছন্দে স্থাপন করতে পারতেন যদি না তাঁরা *English Bards and Scotch Reviewers* গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে গররাজি হতেন। গররাজি হবার কারণ, বইখানির মধ্যে এমন কয়েকজন কবি সম্বন্ধে বাইরন কটু মন্তব্য করেছিলেন, যাঁদের সঙ্গে লংম্যানের সম্পর্ক ছিল। বাইরনের বদলে টম মুরের (Tom Moore) সঙ্গে লংম্যানের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং মুরের সমস্ত বই লংম্যান প্রকাশ করেন, কেবল বাইরনের জীবনী ছাড়া। মুরের বিখ্যাত *Lalla Rookh* গ্রন্থের জন্য লংম্যান ৩০০০ পাউণ্ড অগ্রিম দিয়ে চুক্তি করেন। বই লিখতে মুরের অনেক দেরি হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকাশকরা তাঁকে তার জন্য কোনদিন বিব্রত করেন নি। এ-সম্বন্ধে মুর নিজেই মন্তব্য করেছিলেন : 'There

has seldom occurred any transaction in which trade and poetry have shone so satisfactorily in each other's eyes.' ব্যবসা ও কবিতার এত সুন্দর যুগপৎ বিকাশ যে সম্ভবপর, মুরও তা কল্পনা করতে পারেন নি। তিনহাজার পাউণ্ড অগ্রিম দেওয়া এবং দিয়ে ধৈর্য ধরে পাণ্ডুলিপির প্রতীক্ষায় বসে থাকা, ক'জন প্রকাশকের পক্ষে সম্ভব, ভাববার কথা। সঙ্গতির দিক দিয়ে কেউ-কেউ পারলেও, সে-রকম মনোবৃত্তি ক'জনের থাকে? লংম্যানদের ছিল এবং তার জন্যই তাঁরা প্রকাশন-ক্ষেত্রে অত বড় হতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত জন মারিদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মারিরা পরে ফ্লিট স্ট্রিট থেকে আলবার মার্লে স্ট্রিটে চলে গিয়েছিলেন। মারি যৌবনে যে স্বপ্ন দেখে-ছিলেন, সেই স্বপ্নকে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন প্রকাশক-জীবনে। মারিদের মতো উদারচিত্ত, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী প্রকাশক তখনকার দিনে কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ। বাইরন স্কট প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রকাশক জন মারি।

১৮১২ সালে মারি বাইরনের 'চাইল্ড হেরল্ড' (*Childe Harold*) প্রকাশ করেন। আলবার স্ট্রিটে তাঁরা যখন উইলিয়াম মিলারের গৃহ কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন, তখন তার ড্রয়িংরুমটিকে তাঁরা সাহিত্যের বিখ্যাত আড্ডাখানা করে তোলেন। তখনকার দিনের অধিকাংশ খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের আড্ডাখানা ছিল প্রকাশক মারির এই ড্রয়িংরুমটি। সেখানে যাতায়াত ছিল না, এমন কোনো গণ্যমান্য সাহিত্যিক তখন ছিলেন না। বাইরন যেতেন, স্কট যেতেন, সাদে যেতেন, ক্যাম্পবেল যেতেন। প্রকাশক মারিও তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যের আড্ডায় যোগ দিতেন। এ-সম্বন্ধে জন মারি তাঁর এক আত্মীয়কে একবার লিখেছিলেন

> I am in the habit of seeing persons of the highest rank in literature and talent, such as Canning, Erere, Mackintosh, Southey, Campbell, Walter Scott, Madame Stael, Giffard, Croker, Barrow, Lord Byron and others; thus leading the most delightful life, with means of prosecuting my business in the highest honour and emolument.

মারির নিজের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশক ও লেখকের সম্পর্ক কত বদলে গিয়েছিল। সাহিত্যকেশরী যিনি, তাঁর পিছনে প্রকাশকরা এখন আর এজেন্টের মতো ঘুরে বেড়ান না। জনসনের যুগ পর্যন্ত সেইটাই অন্যতম

প্রথা ছিল। এখন প্রকাশকদের আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেড়েছে। তাঁরা কেবল ব্যবসায়ী নন, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও পরিবেশক। প্রকাশক ও লেখকের মর্যাদার কোনো পার্থক্য নেই। লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, প্রকাশক তার পোষকতা করেন সবদিক দিয়ে। তিনি সাহিত্যিকের বন্ধু ও সহযাত্রী। এই সহযাত্রিত্বের বোধ, প্রকাশক ও লেখকের মধ্যে আগে ছিল না। তাই প্রকাশকের ড্রয়িংরুমে এখন খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের আনাগোণা করতে বা আড্ডা দিতে বাধা নেই। মাম্বির ভাষায়: 'The Publisher's drawing-room was now the centre of an appreciative crowd of authors.'

ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও শিল্পবিপ্লবের গতিশীলতা একত্রে যুক্ত হয়ে, উনবিংশ শতাব্দীতে মানবসমাজে যখন নবজীবনের পথে জয়যাত্রা শুরু হল, তখন তারই পতাকা উড়িয়ে একসঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে লাগলেন লেখক ও প্রকাশক। জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত দরজা সর্বসাধারণের সামনে খুলে দেবার ব্রত গ্রহণ করলেন তাঁরা। রাজসভা থেকে এগিয়ে যাবার পথে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, দৃঢ়পদে ও স্থিরচিত্তে তাঁরা জনসভার দিকে অগ্রসর হলেন। বাইরের সমাজে যেমন, সাহিত্যেরও ইতিহাসেও তেমনি, এক নতুন স্বর্ণযুগের সূচনা হল।

এই স্বর্ণযুগই হল পাঠকের যুগ। ধীরে-ধীরে এই নতুন যুগের বিকাশ হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্র, এমনকি বাংলা দেশেও। প্রকাশকদের একচ্ছত্র সাহিত্য নিয়ন্ত্রণের যুগ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নি অবশ্য। সমাজের গড়ন বদলাবার আগে, তা হওয়াও সম্ভব নয়। তবু তাঁদের সর্বময় কর্তৃত্ব যে যুগ-সচেতন সুরুচিবান পাঠকগোষ্ঠী অনেকটা খর্ব করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সচেতন পাঠকগোষ্ঠী সাহিত্যক্ষেত্রে যে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজও রুচিবান বিচারশীল পাঠকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে নি বলে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত ডেমক্রাটিক স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তবে সূচনা যে হয়েছে এবং সাহিত্যের নিশ্চিত গতি যে সেইদিকে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

কবিতার বাজার মন্দা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য-জগতে স্বর্ণযুগের সূচনা হল বটে, কিন্তু তাই বলে তার সবটুকুই সোনা নয়। তা হয়ও না। অবিমিশ্র ভাল বা অবিমিশ্র মন্দ কোনো যুগই নয় ইতিহাসে। ভাল-মন্দ মিশিয়ে ইতিহাস। সাহিত্যিক ও প্রকাশকের স্বর্ণযুগের বা উনিশ শতকের ইতিহাসও তাই। প্রথমার্ধের 'রোমান্টিক পুনর্জীবনে'র যুগ মোটামুটি ভাল বলা চলে। দ্বিতীয়ার্ধে মন্দের ভাগ বেশি। মারি ও লংম্যানের মতো প্রকাশকরাও তখন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

প্রকাশকদের যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতককে নিঃসন্দেহে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এইসময় আদর্শ প্রকাশকরা সাহিত্য ব্যবসায় অবতীর্ণ হন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে প্রকাশনের ব্যবসা যে ভিন্ন জাতের, একথা তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়ী নীতির দ্বারা প্রমাণ করে দেন। তাহলেও সব পুস্তক ব্যবসায়ীই জন মারি বা লংম্যান, কনস্টেবলের মতো ছিলেন না। সাধারণ ব্যবসায়ীর মতো মুনাফালোভী গ্রন্থ-ব্যবসায়ীও অনেকে ছিলেন। অনেক সাহিত্যিককে তাঁরা বাজারের কাস্টমারের মতো শোষণ করেছিলেন। এইধরনের প্রকাশকদের লক্ষ্য করেই চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb) তাঁর বিখ্যাত কটূক্তি করেছিলেন মনে হয়। এক বন্ধুকে চার্লস ল্যাম্ব লিখেছিলেন

> Throw yourself rather, my dear sir, from the steep Tarpeian rock, slap-dash head-long upon iron spikes. If you had but five consolatory minutes between the desk and the bed, make much of them, and live a century in them, rather than turn slave to the booksellers. They are Turks Tartars when they have poor authors at their beck... You know not what a rapacious, dishonest set these booksellers are.

ল্যাম্বের এই স্বীকারোক্তি প্রকাশনের ইতিহাসে একটা দলিলের মতো রয়ে গেছে। এ-রকম বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ, এত তীব্র ভাষায়, প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আর কোনো গ্রন্থকার বোধহয় প্রকাশ করেন নি। তুর্কী ও তাতারদের মতো প্রকাশকরা সর্বগ্রাসী ও অত্যাচারী, একথা জন মারি ও লংম্যানের যুগে ল্যাম্বের মতো লেখকের পক্ষে বলা যে কতখানি

গুরুত্বপূর্ণ, তা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। ল্যাম্বের এই ঐতিহাসিক উক্তি থেকে এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, উনিশ শতকে প্রকাশন-জগতে স্বর্ণযুগের সূচনা হলেও, তার সবটাই সোনা ছিল না এবং সকলেই জন মারি বা লংম্যান ছিলেন না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুনর্জীবনের যে জোয়ার এসেছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাতে ভাটা পড়ল। কাব্যেরও যে আদর ছিল গোড়াতে তা আর রইল না। 'Poetry was out of fashion'। কাব্যের বাজারে এইসময় সবচেয়ে বেশি মন্দা দেখা দিল। কবিরা প্রথম জখম হলেন। এমনকি জন মারির মতো সংসাহসী বিচক্ষণ সাহিত্যরুচি-সম্পন্ন প্রকাশকও কবিতার বই প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। কাব্যের পাঠক ও প্রকাশক আমাদের দেশে নেই বলে আমরা অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করে থাকি এবং মন্তব্য করি যে, এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈশিষ্ট্যটা শুধু আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ বৈশিষ্ট্য ইংরেজি সাহিত্যের, ইংরেজ পাঠক ও প্রকাশকদেরও ছিল একসময়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের) Wordsworth) বা টেনিসনের (Tennyson) মতো কবিকেও একসময় কাব্যের পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দ্বারে-দ্বারে ধর্না দিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। জন মারির মতো প্রকাশকও কাব্য ও উপন্যাসের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। জর্জ প্যাস্টনের ভাষায়, 'to look with rather a jaundiced eye on poetry and fiction'। এইসময় মারির মতো প্রকাশকও শুধু কাব্যের নয়, উপন্যাসেরও সমস্ত পাণ্ডুলিপি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, জেন অস্টেনের উপন্যাস পর্যন্ত নিজে প্রকাশ করার সাহস পান নি।

লংম্যান প্রকাশিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের একখানি কাব্য-সঙ্কলন (৫০০ কপির সংস্করণ) বিক্রি হতে চার বছর সময় লেগেছিল। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতা লিখে মোট একহাজার পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন। টেনিসনের কবিতার পাঠকের সংখ্যাও এত অল্প ছিল এবং এত কম অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেইজন্য তিনি বিবাহ করতে পারেন নি। রবার্ট ব্রাউনিঙের (Robert Browniug) অবস্থাও তদ্রূপ। মক্সন (Moxon) ছিলেন ব্রাউনিঙের অন্যতম প্রকাশক। কবিতার চাহিদা তখন এত কম ছিল যে, প্রকাশক মক্সন বাধ্য হয়ে ব্রাউনিঙকে অনুরোধ করেছিলেন, পুস্তিকাকারে (pamphlets) তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য, যাতে প্রত্যেক পুস্তিকা প্রকাশের খরচ দশ-বারো পাউণ্ডের বেশি না হয়। ব্রাউনিঙ তাতেই রাজী হন এবং ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁর অনেক কবিতা পুস্তিকাকারে খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এডমণ্ড গস্ (Edmund Goss৩) তাঁর *Dictionary of National*

Biography-র মধ্যে ব্রাউনিঙের একখানি চিঠি প্রকাশ করেন এই পুস্তিকা প্রকাশের ব্যাপার সম্বন্ধে। তার মধ্যে ব্রাউনিঙ যা লিখেছেন তা সত্যিই মর্মান্তিক। ব্রাউনিঙ লিখেছেন

> He (Moxon) printed, on nine occasions, nine poems of mine, wholly at my expense ; that is, he printed them and subtracting the very moderate returns, sent me in duly, the bill of the remainder of expenses...

প্রকাশক খরচ করে কবিতার বই প্রকাশ করতেন। বই বিক্রি হলে যা পাওয়া যেত তাতে প্রকাশকের খরচ না উঠলে, বাকিটা তিনি কবি ব্রাউনিঙের নামে বিল করে পাঠিয়ে দিতেন। তবু মক্সন অন্যান্য অনেক প্রকাশকের তুলনায় তখন অনেক বেশি উদার ও সাধু ছিলেন।

শুধু মারি বা মক্সন নন, লংম্যান সম্বন্ধেও এইসময়ের অনেক কাহিনী শোনা যায়। তার মধ্যে একটি বিশেষ উপভোগ্য কাহিনীর উল্লেখ করছি এখানে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জনৈকা মহিলা লেখিকা প্রকাশক লংম্যানের কাছে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য সোজাসুজি আবেদন করেন। লংম্যান তার উত্তরে তাঁকে জানান

> My dear Madam, it is no good bringing me poetry ; nobody wants poetry now. Bring me a cookery book, and we might come to terms.

মর্মার্থ এই : 'মহাশয়া, কবিতার বই প্রকাশের জন্য এখন আমাদের কাছে আসবেন না। কবিতা আজকাল আর কেউ পড়তে চান না। তার চেয়ে গৃহস্থালী রান্নাবান্না সম্বন্ধে যদি কোনো বই লেখেন নিয়ে আসবেন, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায়, প্রকাশক লংম্যান দুঃখ করে বিদ্রূপ করেছিলেন, সত্যিই লেখিকাকে রন্ধনের বই লিখতে বলেন নি। কিন্তু লংম্যানের মতো খ্যাতনামা প্রকাশকের কাছ থেকে এইরকম একখানা চিঠি পেয়ে লেখিকা লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, সত্যিই যখন একখানা বই লেখার প্রস্তাব করেছেন লংম্যানের মতো প্রকাশক, তখন এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। সুতরাং তিনি কবিতা লেখা কিছুদিনের জন্য মুলতুবী রেখে, রন্ধন সম্বন্ধে বই লিখতে আরম্ভ করলেন। বই লেখা শেষ হলে একদিন লংম্যানের কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলেন। লংম্যান তো অপ্রস্তুত। অথচ ঐরকম চিঠি লিখে ফেলেছেন যখন এবং ভদ্রমহিলা যখন সেই চিঠির ঐরকম ব্যাখ্যা করেছেন, তখন কথার খাতিরে বই প্রকাশ না-করেও উপায় নেই। মহিলার নাম এলিজা এ্যাক্টন

(Eliza Acton)। ১৮৪৫ সালে লংম্যান এই মহিলার রন্ধনকলার বই *Modern Cookery* প্রকাশ করেন। একটার পর একটা সংস্করণ হয় বইখানার অল্পদিনের মধ্যে। কিন্তু মহিলার মনে পাছে কোনো ক্ষোভ থাকে, সেইজন্য লংম্যান পরে তাঁকে কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দিতে বলেন প্রকাশের জন্য। এলিজার কাব্যগ্রন্থও লংম্যান প্রকাশ করেন। মহিলা-কবির বাসনা অতৃপ্ত রাখেন নি তাঁরা। কবিতার বইখানি একেবারেই বিক্রি হল না, দেখা গেল। অথচ রন্ধনকলার বইখানির সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। তখন লংম্যান একদিন মহিলাকে ডেকে বললেন: 'দেখলেন তো? পাঠকের রুচি সম্বন্ধে যা বলেছিলাম আপনাকে, তা সত্যি কি-না?'

লংম্যানের জীবনে নতুন যুগের সূচনা হল এইসময় – অবশ্য গৃহস্থালী রান্নাবান্নার বই প্রকাশ করে নয়, মেকলের (Macaulay) ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে। তখন চতুর্থ টমাস লংম্যান প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে 'লংম্যান, ব্রাউন, গ্রীন' (Longman, Brown, Green)। এই পর্বে লংম্যানরা প্রথম প্রকাশ করেন মেকলের *Lays of Ancient Rome*, ১৮৪২ সালে। মেকলে এই গ্রন্থখানি লংম্যানদের উপহার দিয়েছিলেন, অর্থাৎ দান করে দিয়েছিলেন সমস্ত স্বত্ব। কিন্তু বইখানি যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন লংম্যান পাণ্ডুলিপিখানি সমস্ত স্বত্বসহ গ্রন্থকার মেকলেকে প্রত্যর্পণ করেন। প্রকাশনের ইতিহাসে এতখানি মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় আর কেউ দিয়েছেন কি-না সন্দেহ। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশ লংম্যানের এই উদারতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল, আমাদের দেশে নয়, ওদেশেও। গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব গ্রন্থকারের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় পেয়ে, সেই গ্রন্থ যখন মুনাফা যোগাতে লাগল তখন তা গ্রন্থকারকে সানন্দে প্রত্যর্পণ করা যে কতখানি মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া, তা এদেশের প্রকাশকরা বোধহয় আজও কল্পনা করতে পারেন না। মেকলে ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই বই থেকে যে কত টাকা পেয়েছেন তার হিসেব নেই।

মেকলের কয়েক খণ্ড 'ইতিহাস'ও লংম্যান সাহস করে প্রকাশ করেছিলেন তখন। যে সময়ে পাঠকদের রুচি সম্বন্ধে প্রকাশক লংম্যান পূর্বোক্ত কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, সেই সময় মেকলের ইতিহাসের মতো বিরাট নীরস গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করা যে কতখানি দুঃসাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া, তাও বোধহয় আমাদের দেশের প্রকাশকরা কল্পনা করতে পারবেন না। শুধু প্রকাশ করা নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিহাস প্রকাশিত হবার পর, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের জন্য লংম্যান অগ্রিম বিশ হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন মেকলেকে। ১৮৫৬ সালের ১৩ মার্চ লংম্যান চেকে এই টাকা

দিয়েছিলেন লেখককে। বই প্রকাশের ইতিহাসে এই তারিখটি তাই স্মরণীয় হয়ে আছে। উপন্যাস বা গৃহস্থালীর বই নয়—ইতিহাসের বইয়ের জন্য লেখককে এত টাকা অগ্রিম দেওয়ার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল। লংম্যানদের সৎসাহস, সাধুতা ও উদারতা সাহিত্য-জগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় জুড়ে আছে—শুধু ইংলণ্ডের নয়, সারা পৃথিবীর।

লংম্যানদের মতো মারিদেরও পরিবর্তন হচ্ছিল এর মধ্যে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় জন মারির যুগ আরম্ভ হয়। কবিতার বাজার মন্দা বলে যা-তা যে-কোনো বই প্রকাশ করাও সমীচীন নয়—একথা মারিরা বুঝতেন। তাই এইসময় তৃতীয় জন মারি ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে একটি করে 'হ্যাণ্ডবুক' প্রকাশের এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। ১৮৩৬ সালে প্রকাশক মারি নিজে হল্যাণ্ডের হ্যাণ্ডবুক লিখে প্রকাশ করেন, যাচাই করে দেখার জন্য। বই ভাল বিক্রি হল যখন, তখন যোগ্য লেখকদের দিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডের উপর এইধরনের হ্যাণ্ডবুক প্রকাশ করলেন। মারির এই প্রচেষ্টার বিস্ময়কর সাফল্য হল। সাহিত্যের মন্দা বাজারের দিনেও প্রচুর টাকা তিনি মুনাফা করলেন। এত টাকা মুনাফা করলেন যে, তাই দিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তার নাম দিলেন 'হ্যাণ্ডবুক হল' (Handbook Hall)। আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে মারিদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। এইসময় প্রত্যেক দেশের সচিত্র বিবরণগ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করলেন, প্রধানত পর্যটকদের জন্য। অবশেষে ডারুইনের (Darwin) যুগান্তকারী গ্রন্থ *Origin of Species* ও *Descent of Man* প্রকাশ করে মারি সারা পৃথিবীর পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। বইয়ের বাজার যখন মন্দা, তখন ডারুইনের বই প্রথম ছাপার পরিকল্পনা করা যে কতটা দুঃসাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া, একশো বছর পর আজ আমরা তা কল্পনা করতে পারব না।

প্রাজ্ঞ সমালোচকরা, বিজ্ঞ সাহিত্যরসিকরা এবং অভিজ্ঞ প্রকাশকরা প্রায়ই বলে থাকেন, বইয়ের বাজার মন্দা এবং তার জন্য পাঠকদের রুচিবিকারকে দায়ী করেন। কিন্তু সাহিত্যের এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে পাঠকরা কখন কি চান না-চান, সে সম্বন্ধে বিচার সবসময় নির্ভুল নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই ইতিহাস থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয়। কবিতার বাজার যখন মন্দা, ব্রাউনিঙের মতো কবিকে যখন নিজে খরচ দিয়ে পুস্তিকাকারে কাব্যগ্রন্থ ছাপতে হচ্ছে, কবিতার বদলে কুকারির বই যখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তখন মেকলের 'ইতিহাস' বা ডারুইনের 'অরিজিন অফ্ স্পেশীজে'র মতো বই-এর চাহিদা হল কি করে? আরও বিস্ময়কর হল, যে প্রকাশকরা অনেক কম

খরচেও কবিতার বই ছাপতে রাজী হন নি, তাঁরা বহুগুণ বেশি খরচ দিয়ে, মেকলে ও ডারুইনের সুবৃহৎ গ্রন্থ সাগ্রহে প্রকাশ করলেন কার ভরসায়?

কেবল সাহিত্যরসের দিক থেকে বিচার করে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই গতানুগতিক সাহিত্যেতিহাসে এর উত্তর খোঁজা বৃথা। বাইরের সমাজ, সেই সমাজের পাঠকগোষ্ঠীর রুচি ও মানসিক ক্ষুধা ইত্যাদির বিচার না করে, যাঁরা সাহিত্যের গুণাগুণের তত্ত্বকথা নিয়ে ইতিহাস রচনা করেন, তাঁদের রচিত ইতিহাস রসালোচনা হিসেবে যত মূল্যবান হোক না কেন, সত্যকার ইতিহাস হিসেবে তার মূল্য নগণ্য। যখন কুকারির বই বিক্রি হয়, কবিতার বই বিক্রি হয় না, ঠিক সেই সময় ডারুইন ও মেকলের বই কি করে পাঠকচিত্ত জয় করল, এ-প্রশ্নের উত্তর সাহিত্যের যে ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না, সে-ইতিহাস কিসের ইতিহাস জানি না।

সমাজবিজ্ঞানীরা এ-প্রশ্নের উত্তর দেবেন এই বলে যে, পাঠকদের মনের যুগোপযোগী খোরাকের কথা কোনদিনই অ্যাকাডেমিক সমালোচকরা বিচার করে দেখেন নি। শেয়ারমার্কেটের তেজীমন্দার মতো তাঁরা পাঠকদের সাহিত্যপাঠের সাময়িক রুচির উত্থান-পতনের বিচার করেছেন। যদি আরও গভীরে তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছত তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন, পাঠকদের বাইরের মানসিক তরঙ্গের তলায় আর-একটি অন্তঃস্রোত আছে এবং সেখানে অনেক অজানা অতৃপ্ত চাহিদা জমা হয়ে রয়েছে। সেখানে তাঁরা যে-যুগের পাঠক, সেই যুগের উপযোগী পাঠ্যবস্তু চান। তা পান না বলেই, ঘোলা জলে তৃষ্ণা মেটান। তাই বলে, ঘোলা জলের চাহিদাটা সত্য নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই সবদেশেই দেখা যায়, চটকদারি সাহিত্যের বেসাতি করে যাঁরা পাঠকদের সাময়িক রুচি পরিতৃপ্ত করেন এবং হাউইয়ের মতো সাহিত্যাকাশে খ্যাতির আলোকে ঝলমল করে ওঠেন, তাঁরা হঠাৎ নিভে গিয়ে নীরেট পাথরখণ্ডের মতো আবার ধপ্ করে মাটিতে পড়েন। তারপর আর তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যথাসময়ে যথাস্থানে তাঁরা বিলুপ্ত হয়ে যান। 'মডার্ন কুকারি'র লেখিকার যুগ ছিল আসলে ডারুইন ও মেকলের যুগ। তবু 'মডার্ন কুকারি' প্রচুর বিক্রি হয়েছিল, কারণ মেকলের 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' এবং ডারুইনের 'জীবের ক্রমবিকাশের' ইতিহাস, তখনও প্রকাশিত হয় নি। যখন প্রকাশিত হল, তখন বোঝা গেল, যুগের চাহিদা কি এবং পাঠকরা সে-সম্বন্ধে সচেতন কি-না? দেখা গেল, যুগের অন্তঃসলিলা চিন্তাপ্রবাহ থেকে পাঠকরা পিছিয়ে ছিলেন না। যুগোপযোগী পাঠ্য তাঁরা পান নি বলে, অপাঠ্য কুকারি ও প্রেমকাহিনী তাঁরা পড়েছেন। রোমান্টিক কবিতাও তাঁদের আর ভাল লাগছিল না। কেবল কল্পনার মুক্তডানায় ভর দিয়ে শূন্যে বিচরণ করতে তাঁদের মন চাইছিল না। তাঁরা আরও বাস্তব,

আরও জীবন্ত কিছু চাইছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্রধানত নির্মাণের যুগ, প্রসারের যুগ, গঠনের যুগ। ধনতন্ত্রের অবাধ অগ্রগতির যুগ, বাষ্পীয় রেলগাড়ির যুগ। সাহিত্যে তার জন্য উপন্যাস চাই, ইতিহাস চাই। বিভিন্ন দেশের হ্যাণ্ডবুক প্রকাশ করে মারি তাই এত মুনাফা করেছিলেন যে তাই দিয়ে গৃহনির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিলেন — হ্যাণ্ডবুক হল। সাহিত্যের ইতিহাসে এই হ্যাণ্ডবুক হল একটি অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ। প্রকাশকের যুগ থেকে সাহিত্য যে ধীরে-ধীরে পাঠকের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছে, এই কীর্তি হল তারই সাক্ষী।

উপন্যাসের যুগ

> If the great Victorian poets had long to wait before receiving their due reward, Dickens proved that dazzling prizes were to be won in the realm of fiction in the middle of the nineteenth century. —Mumby.

কাব্যের বাজার মন্দা হলেও, উপন্যাসের বাজার গোড়া থেকেই তেজী ছিল। যুগটিই হল উপন্যাসের। কাব্যের যুগ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কাব্য বা ছন্দোবদ্ধ ভাষাই হল মানুষের আদি অকৃত্রিম ভাষা। নৃত্যের মতো কাব্যই তাই মানুষের আদি শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উপন্যাস তা নয়। সমাজে মানুষ যতদিন না মানুষ বলে গণ্য হয়েছে, মানুষের ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃত হয়েছে, স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছে, ততদিন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জন্ম হয় নি এবং উপন্যাসের সাহিত্যিক রূপায়ণও সম্ভব হয় নি। তাই উপন্যাসের জন্মের জন্য আমাদের ফিউডালযুগের অবসান ও বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিকযুগের অভ্যুদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফিউডালযুগের সাহিত্যিক অবদান হল গাথা ও মহাকাব্য; বুর্জোয়াযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান হল উপন্যাস। উপন্যাস সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক সত্যটি র‍্যাল্‌ফ ফক্স (Ralph Fox) তাঁর *The Novel and the People* গ্রন্থে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। র‍্যাল্‌ফ ফক্স বলেছেন

> The novel, is the epic art form of our modern bourgeois society We can even say that not only is the novel the most typical creation of bourgeois literature, it is also its greatest creation. It is a new art form. It did not exist, except in very rudimentary form, before that modern civilisation which began with the Renaissance...

যুগে-যুগে, ইতিহাসের যাত্রাপথে, নতুন-নতুন শিল্পকলার সৃষ্টি হয়। বহির্জগতের পরিবর্তনের ফলে মানুষের মনোজগতে যে নতুন ভাবধারার, যে নতুন চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাকে সাহিত্যে ও শিল্পে রূপায়িত করার জন্য মানুষ নতুন-নতুন 'মাধ্যম' সন্ধান করে। উনবিংশ শতাব্দীতে বহির্জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের

মন প্রথম অর্গলমুক্ত হয়ে যখন বিচিত্র ভাবরাজ্যে পক্ষবিস্তার করল, যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় যখন দীপ্ত হয়ে উঠল তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবন, তখন কাব্যের পরিমিত প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সে তৃপ্তি পেল না। নতুন 'form' বা রূপের সন্ধান করতে লাগলেন নবযুগের শিল্পী। উপন্যাস হল এই নবযুগের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রূপ এবং তার ভাষা হল বন্ধনহীন গদ্যভাষা। আধুনিক ছাপাখানার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান – উপন্যাস ও গদ্যভাষা। উপন্যাস-প্রসঙ্গে র‍্যাল্‌ফ ফক্‌স তাই বলেছেন[১]

> the novel as an art in its own right, with its own rules, with its universal acceptance and appreciation, is a creature of our own civilization, above all, of the printing press.

উপন্যাস হল আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের মহান শিল্পরূপ। এই সমাজের যৌবন-কালে উপন্যাসের চরম বিকাশ হয়েছিল যেমন, তেমনি তার প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে চরম অবনতি হতেও বাধ্য। আজ সেই অবনতি ও চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে উপন্যাস। উপন্যাস শুধু খাঁটি ধনতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি নয়, তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই নতুন শিল্প-মাধ্যম ধনতান্ত্রিকযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অবদান বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে এই ধনতান্ত্রিকযুগের যৌবনকাল বলা যায়। উপন্যাসের চরম বিকাশও তাই এইসময় হয়। ফিল্ডিং (Fielding), স্কট (Scot), ডিকেন্স (Dickens), ব্রন্তে (Bronte), অস্টেন, ধনতান্ত্রিকযুগের এই যৌবনকালের দান। যে-যুগের চোখে-মুখে নবযৌবনের উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্য, বিশ্বাস ও আদর্শ-প্রবণতার উজ্জ্বল প্রকাশ হয়েছিল, সেই যুগে এইসব ঔপন্যাসিকের জন্ম হয়েছিল ইংলণ্ডে। তার মধ্যে ডিকেন্স ছিলেন মধ্যমণি। ডিকেন্স সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা-গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে চেস্টারটনের লেখা 'চার্লস ডিকেন্স' উল্লেখযোগ্য। চেস্টারটন (G. K. Chesterton) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (*The Dickens Period*) চমৎকার ভাষায়, নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গীতে, ডিকেন্সের ঐতিহাসিক পটভূমিকার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন[২]

> It was a world that expected everything of everybody. It was a world that encouraged anybody to be anything. And in England and literature its living expression was Dickens...

১ Ralph Fox: *The Novel and the People*, Moscow, 1954, : Introduction : pp 61-68

২ G. K Chesterton : *Charles Dickens*, London, 15th edition, 1925, P. 10

He was the voice in England of this humane intoxication and expansion, this encouraging of anybody to be anything. His best books are a carnival of liberty...

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীকে নিঃসন্দেহে উপন্যাসের মধ্যাহ্নকাল বলা যায়। সেই মধ্যাহ্নে মধ্যগগনের সূর্যরূপে ডিকেন্সের আবির্ভাব হল। প্রকাশনক্ষেত্রেও একটা নতুন যুগের বিকাশ হল, কেবল ডিকেন্সকে কেন্দ্র করে নয়, আরও অন্যান্য ঔপন্যাসিককে কেন্দ্র করে। দেখা গেল, কাব্যের বাজার যেমন মন্দা, উপন্যাসের বাজার আদৌ তা নয়। নতুন যুগের এই নতুন মাধ্যম ও আঙ্গিকের জন্য যেন পাঠকরাও উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তাঁরা কাব্যের মূল্য না বুঝলেও, উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মানব-চরিত্রের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ, সমাজ-জীবনের যে বৃহত্তর পরিচয় তারা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন, একমাত্র উপন্যাসেই তা সম্ভব হল। নতুন সমাজের নায়ক-নায়িকারা বিচিত্ররূপে, বিচিত্র ভঙ্গীতে উপন্যাসের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সুখ-দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চারিত্রিক সঙ্গতি-অসঙ্গতি সব যখন উপন্যাসের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠলো পাঠকের সামনে, তখন পাঠকরাও অসীম আগ্রহে নতুন-নতুন উপন্যাসের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যুগের তাগিদেই উপন্যাসের চাহিদা বাড়ল।

ডিকেন্স যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখন অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো খুব সন্তর্পণে, সসঙ্কোচেই করলেন। তিনিই যে যুগশিল্পী, একথা বুঝতে প্রকাশক ও পাঠকদের খুব দেরি হয় নি। পাঠকরা যেন ডিকেন্সের অভাবই বোধ করছিলেন এতদিন এবং তাঁদের সঙ্গে প্রকাশকরাও। প্রথমে একদিন ডিকেন্স তাঁর প্রথম রচনাটি চুপিসাড়ে এক মাসিক পত্রিকার অফিসে 'চিঠির বাক্সে' ফেলে দিয়ে আসেন। সম্পাদকের হাতে সর্মপণ করতেও তাঁর ভরসা হয় নি। লেখাটি যখন সেই পত্রিকায় একদিন প্রকাশিত হল, তখন ডিকেন্সই সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ অন্য কেউ তখনও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। উইলিয়াম হল্ (William Hall) নামে জনৈক পুস্তকবিক্রেতা এই পত্রিকাখানি ডিকেন্সের কাছে বিক্রি করেছিলেন। বিক্রেতা ও ক্রেতা কেউ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। তার দু'বছর পরের কথা। এই হল্ সাহেব (ইয়ং হল্ বা লিট্‌ল হল্ বলে পরিচিত) একদিন এক সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্য। ব্যক্তিটির নাম চার্লস ডিকেন্স। আর যিনি খুঁজে-খুঁজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সরাইখানায়, ইয়ং হল্ সাহেব, তিনি হলেন বিখ্যাত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান 'চ্যাপমান এ্যাণ্ড হল্'-এর (Chapman & Hall) অংশীদার হল্ সাহেব। চ্যাপমান ও হল্ দু'জন তরুণ বন্ধু উদ্যোগী হয়ে একটি পাবলিশিং

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক মাম্বি এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন: 'Chapman and Hall, two young men whose names are as closely allied to Dickens and his works as is that of John Murry to Lord Byron.' প্রকাশক জন মারির নামের সঙ্গে যেমন বাইরনের নাম জড়িত, তেমনি প্রকাশক চ্যাপম্যান ও হলের সঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের নামও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

সরাইখানায় গ্রন্থকার ডিকেন্স ও প্রকাশক হলের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হল, সেদিন কেউ কারও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানতেন না। চার্লস ডিকেন্স জানতেন না যে তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সম্মান পাবেন একদিন এবং হল্ সাহেবও জানতেন না যে, ডিকেন্সের বই প্রকাশ করে তিনি লাভবান হবেন বা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দু'জনের যখন কার্নিভালের সরাইখানায় প্রথম দেখা হল, তখন হল্ সাহেব 'দি পিক্‌উইক পেপার্স' (The Pickwick Papers) লেখার প্রস্তাব করেন। ধারাবাহিকভাবে রচনাগুলি প্রকাশিত হবে সেমুর (Seymour) সেগুলি চিত্রিত করবেন, এই প্রস্তাব হয়। ডিকেন্স প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রকাশক প্রত্যেক মাসের রচনার জন্য ১৪ পাউণ্ড করে পারিশ্রমিক দিতে রাজী হন। ডিকেন্স লেখেন: 'The work will be no joke, my dearest Kate, but the emolument is too tempting to resist.' পিক্‌উইকের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন ডিকেন্স বিবাহ করে সংসার পাতার ভরসা পান এবং বিবাহ করেন। খণ্ড-খণ্ডভাবে পিক্‌উইক পেপার্স প্রকাশিত হয় এবং চার-পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হবার আগে পাঠকরাও তার মূল্য বুঝতে পারেন নি। প্রকাশকরাও প্রথম দিকে যে খুব লাভবান হয়েছিলেন, তা নয়। চার পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে পাঠকমহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। প্রকাশক বই ছেপে সরবরাহ করতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। আশাতীত মুনাফা হল তাঁদের। অপ্রত্যাশিত মুনাফা পেয়ে প্রকাশকরা ডিকেন্সকে তাঁর প্রাপ্য ছাড়াও আরও অনেক বেশি টাকা স্বেচ্ছায় খুশী হয়ে দিলেন। ডিকেন্স ও চ্যাপম্যান হলের সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় হল।

ডিকেন্সের যুগ আসছে, এইরকম একটা চাপা গুঞ্জন যখন পাঠকমহলে শুরু হল, তখন অন্যান্য প্রকাশকরাও ডিকেন্সের বইয়ের জন্য লালায়িত হয়ে উঠলেন। রিচার্ড বেণ্টলে (Richard Bentley) নামে একজন প্রকাশক তাঁর 'Bentley's Miscellany' পত্রিকার সম্পাদকের পদে ডিকেন্সকে নিযুক্ত করে ফেললেন, কারণ 'Bentley was one of the shrewdest men in the trade.' ধুরন্ধর প্রকাশক বেণ্টলে বুঝেছিলেন যে, ডিকেন্সকে এইভাবে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত করতে পারলে তিনি তাঁকে দিয়ে

নিয়মিত লেখাতে পারবেন পত্রিকার জন্য এবং সেই লেখা পরে প্রকাশ করতেও (গ্রন্থাকারে) তাঁর বাধা হবে না। তাই হল। 'অলিভার টুইস্ট' ধারাবাহিকভাবে ডিকেন্স লিখতে আরম্ভ করলেন বেণ্টলের জন্য। যুগপৎ অনেক লেখার চাপ পড়ল তাঁর উপর। 'পিক্‌উইক' তখনও লেখা শেষ হয় নি, 'অলিভার টুইস্ট' (*Oliver Twist*) নিয়মিত লিখতে হচ্ছে এবং 'বার্ণাবি রুজও' লিখতে হবে। ক্রমে এই কাজের বোঝা বহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব উঠলো, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তিনি এমনভাবে বাঁধা পড়েন যে, মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পান না। তখন তাঁর প্রথম প্রকাশক চ্যাপমান হল্‌ই তাঁকে আড়াই হাজার পাউণ্ড দিয়ে বেণ্টলের সমস্ত দায় থেকে মুক্ত করেন, অলিভার টুইস্ট ও বার্নাবির চুক্তিপত্র বাতিল করিয়ে দেন। তা ছাড়া ম্যাক্রোন (Macrone) নামে যে প্রকাশকের কাছে ডিকেন্স প্রথম তাঁর *Sketchas by Boz* বিক্রি করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকেও টাকা দিয়ে চ্যাপমান কপিরাইট ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রন্থকারকেই প্রত্যর্পণ করেন। ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর প্রকাশকের সম্পর্ক যে কত আপনার, এইসব ঘটনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

চ্যাপমান ও হলের এই উদারতা যে নিছক বদান্যতা নয়, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা প্রকাশক ও ব্যবসাদার। মুনাফাই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য, অন্যান্য ব্যবসাদারদের মতো। কিন্তু জন মারি, লংম্যান, চ্যাপমান ও হল্‌ প্রভৃতি প্রকাশকদের বিশেষত্ব এই যে, বইয়ের ব্যবসাকে তাঁরা বাজারের অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসার মতো মনে করতেন না। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, সেই হাঁসকেই যে সবার আগে মানুষের মতো মর্যাদা দেওয়ার দরকার এবং বাঁচিয়ে রাখার দরকার, একথা তাঁরা উপলব্ধি করতেন। লেখকদের মূল্য ও মর্যাদা তাঁরা বুঝতেন ও দিতেন। মুনাফাটাকে অন্ধের মতো আঁকড়ে থাকতেন না। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রকাশকদেরও যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, একথা তাঁরা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। অতিরিক্ত মুনাফা অনেক সময় স্বেচ্ছায় তাঁরা গ্রন্থকারের সঙ্গে বণ্টন করে নিয়েছেন, নিজেরা ভোগ করেন নি। ইংলণ্ডের মতো দেশে তাই সাহিত্যের যেমন সমৃদ্ধি হয়েছে, সাহিত্যিকেরও তেমনি মর্যাদা বেড়েছে। সংস্কৃতিবান, রুচিবান, উদার প্রকাশকদের দান তাতে কম নেই। যুগোপযোগী দূরদৃষ্টি নিয়ে, উদীয়মান ধনতান্ত্রিকযুগে, ইংলণ্ডে যে-সব প্রকাশকের আবির্ভাব হয়েছিল সাহিত্যক্ষেত্রে, তাঁদের মধ্যে জন মারি, লংম্যানস, চ্যাপমান হল্‌ প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। বহু বিচক্ষণ সমালোচকের তুলনায় এঁদের সাহিত্যপ্রতিভা যাচাই করার ক্ষমতা যে অনেক বেশি ছিল, তার প্রমাণ একাধিকবার এঁরা দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্য তাই দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে।

প্রতিভা ও সমাজ

প্রথম প্রস্তাব

সাহিত্যের বিকাশে এবং সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশে পেট্রন ও প্রকাশকের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ধনিক পেট্রন ও প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকের সুনজর ও সহযোগিতা সাহিত্যিকের জীবনে যে এককালে একান্ত প্রয়োজন ছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। অস্বীকার করে লাভ নেই। পেট্রন ও প্রকাশকের পোষকতার ছায়াতলে সাহিত্যিকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে এবং অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা শিলা-বৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। পৌরাণিক অবতারদের মতো প্রতিভাবানেরা সমাজপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে হঠাৎ যুগান্তকারী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন না। প্রতিভার বিকাশের ও প্রতিভার স্বীকৃতির ইতিহাস, বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় মাত্র।

সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকরা অনেকে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। স্বীকার করলে প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা ও মূল্য দেওয়া হয় না, খাটো করা হয় – হয়ত এই-রকম সজাগ মনোভাব তাঁদের এই কুণ্ঠার কারণ। তা যদি না হয়, তাহলে বলতে হয় যে তাঁরা মনে করেন, 'প্রতিভা' এমন কোনো অলৌকিক বস্তু, যা সমাজের জল-হাওয়া ছাড়াও শূন্যতার মধ্যে আপন শক্তিতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। ওঠে যদি উঠুক, কিন্তু ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই। 'বিশ্বাস' প্রমাণসাপেক্ষ নয়, তর্কসাপেক্ষও নয়। কারও আত্মোপলব্ধি নিয়ে কোনদিন তর্ক করা চলে না। ইতিহাস তা নয়। সমাজের ইতিহাসও নয়, সাহিত্যের ইতিহাসও নয়। সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেন, 'Science and the fine arts may require a rich economic soil. But imaginative writing is a flower the flourishes merrily among rocks and ice, in forst and storms'. (Vossler) – 'বিজ্ঞান ও চারুকলার সমৃদ্ধির জন্য স্বচ্ছল আর্থিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়ত হতে পারে। কিন্তু কল্পনা-সাহিত্য হল এমনই এক জাতীয় ফুল, যা হেসে-খেলে পাহাড়ে-পর্বতে তুষার-ঝঞ্ঝায় ও বরফের মধ্যেও ফুটে উঠতে পারে।' হীরের টুকরোর মতো কথা,

আলোর ঝলকানি আছে, কিন্তু কথার মধ্যে কোনো বস্তু নেই, ওজন নেই। ফাঁকা কথার ঝলমলানি। বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং এই উক্তির সুন্দর উত্তর দিয়েছেন[১]

> But the history of literature regarded in its sociological aspect, teaches us to view generalisations of this sort with a certain mistrust.

আরিস্তুতল যেমন ভাবতেন যে, কাদা হলেই কেঁচো হবে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কাদা হলেই যে কেঁচো হবে, এমন কোনো কথা নেই। নাও হতে পারে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, মোজায়েক মেজেতে কেঁচো হবে। তা হতে পারে না। কেঁচো হতে হলে কাদা চাই-ই চাই, যদিও কাদা হলেই কেঁচো হয় না। তুষারপৃষ্ঠে রজনীগন্ধা ফুল ফোটে না। বরফের উপরেও কল্পনা-সাহিত্যের রঙীন ফুল ফুটে ওঠে, একথা নিছক কাব্যিক কল্পনা হিসেবে উপভোগ্য, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সমাজের সঙ্গে প্রতিভার কোনো যান্ত্রিক সম্পর্ক নেই, অর্থনীতির সঙ্গেও না। প্রাচুর্যের মধ্যেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর, একথাও সত্য নয়। তা যদি হত, তাহলে পৃথিবীর রাজা, মহারাজা, লর্ড বেরনরা বড়-বড় প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পী হতেন। কথাটা একেবারেই তা নয়। ঐ কাদা ও কেঁচোর সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। সুস্থ সামাজিক পরিবেশ হলেই যে সুসমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার মানে এই নয় যে, সমৃদ্ধ সাহিত্য রিক্ত সমাজের ঘুঘুডাঙ্গায় গজিয়ে উঠবে। পাথরের উপর কাব্যের গোলাপ ফুল ফুটে সুগন্ধে মাতিয়ে দেবে চারিদিক—এমন আজগুবি কাণ্ড সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটা সম্ভবপর নয়। কথাটার মানে হল, সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অনুকূল সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। প্রতিভার প্রকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য রসাল ও সাবাল মাটি চাই। নীরেট পাথরের বুকের উপর সাহিত্যের ফুল ফোটে না। ভসলারের কথা সত্য নয়।

প্রতিভা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক যাঁরা মানেন এবং মানেন না, তাঁদের দুই দলের মধ্যেই গোঁড়া উগ্রপন্থীরা আছেন। একদল মনে করেন, সমাজই সর্বেসর্বা, প্রতিভা বা ব্যক্তিত্ব কিছু নয়। বিশেষ সমাজে বিশেষ প্রতিভার বিকাশ হয়, সমাজই প্রতিভানিয়ন্তা। লেখার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা ভাল খেতে-পরতে পেলেই বড় সাহিত্যিক হতে পারেন, এই মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ও প্রতিভার সম্পর্ক 'যান্ত্রিক'

১ L. L Schucking: *The Sociology of Literary Taste*: P. 8

মনে করেন। সমাজ যেমনভাবে চালায়, তেমনিভাবে সাহিত্য এগিয়ে চলে, প্রতিভা এগিয়ে চলে। এ-ধারণা মারাত্মক ভুল এবং ঠিক এর বিপরীত ধারণার মতোই অর্থহীন ও অবান্তর। দ্বিতীয় দল যাঁরা মনে করেন সাহিত্য সাহিত্য, প্রতিভা প্রতিভা, তার সঙ্গে সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁদের ধারণাও ভুল। একই ভুলের এপিঠ আর ওপিঠ। সমাজের সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা সবসময় প্রত্যক্ষ নয় এবং কোনো সময় যান্ত্রিক নয়। পরিবেশশূন্য প্রতিভাও আজগুবি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। প্রতিভার স্ফুরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু পরিবেশ অনুকূল হলেই যে প্রতিভার স্ফুরণ হতে থাকবে, তা নয়। সমাজ ও প্রতিভা, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে এইটাই বড় কথা। প্রতিভার স্ফুরণ অনুকূল পরিবেশ ছাড়া সম্ভবপর নয়। সাহিত্যের বিকাশের জন্যও চাই সুস্থ সরস পরিবেশ। মধ্যযুগে এই অনুকূল পরিবেশ বলতে বোঝাত, ধনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা। পরবর্তীকালে এই পরিবেশ বলতে বোঝাত, প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকদের সাহায্য ও সহানুভূতি। ভবিষ্যতে হয়ত বোঝাবে, সাধারণ শিক্ষিত সাহিত্য-রসিক পাঠকগোষ্ঠীর সুবিচারবোধ। পাঠকগোষ্ঠী চিরকালই প্রতিভার স্ফুরণে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে, পাঠকগোষ্ঠীর কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হবার পর। উপস্থিত হবার সমস্ত পথই বন্ধ ছিল মধ্যযুগে। প্রতিভা ও লোকসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের যে পথ, সে-পথের পাহারাদার ছিলেন ধনিক পৃষ্ঠপোষকরা। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন বিচারের জন্য পাঠকদের বা রসিকদের সামনে উপস্থিত হওয়াই সম্ভব হত না। মধ্যযুগে বা সামন্তযুগে তাই প্রতিভা সম্পূর্ণ ধনিক পেট্রনের মুখাপেক্ষী ছিল। সাহিত্যিক বা শিল্পীর কোনো স্বাধীন আদর্শ ছিল না, কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না। পেট্রনের আদর্শই ছিল তাঁর আদর্শ, তাঁর নীতিই ছিল পোষ্য কবি ও শিল্পীর নীতি। কথাটা পেট্রার্ক (Petrarch) ও চসার (Chaucer) প্রসঙ্গে শুশ্‌কিং অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন[২]

> Think of Petrarch, who yet, as the most celebrated poet of his day, enjoyed an entirely exceptional position. Into what difficult situations he was brought by the simple fact that the poet could not support himself by the sale of his works to the public! For twenty years he was supported by the Colonna family; then, when Riezi achieved his dream of the

২ শুশ্‌কিং: ঐ, ১০

revival of the Roman Republic, Petrarch carried on in his support a bitter polemic against the tyrants of Rome—those same Colonnas. Later he lived for a considerable time with the terrible Visconti family, at Milan.

এই হল পেট্রার্কের মতো প্রতিভাবানের জীবনকাহিনী। কুখ্যাত অন্নদাতা কলোন্না পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। প্রতিভাকে বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কবি চসারকেও তাই করতে হয়েছিল[৩]

Chaucer had his Visconti—the unscrupulous John of Gaunt. He ate the bread of a court at which French taste and the rather stale theories of love of past centuries were still accepted; and a good part of his literary activity ran on these lines.

কেবল সামন্তযুগে নয়, ধনতান্ত্রিকযুগেও দেখা যায়, বড়-বড় ধনিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা প্রথম দিকে ঠিক সেকালের রাজা-মহারাজাদের মতো শিল্পী-সাহিত্যিকদের পোষকতা করেছেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরাও যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেছেন। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) এই প্রসঙ্গে বলেছেন[৪]

We need not go into the importance which the Court of Weimer had for Goethe, Schiller, and Wieland, and Munich had for Wagner. But it is essential to note how with the rise of modern capitalism the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life.

আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আগে সেই ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। পালযুগের কবি 'রামচরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, সেনযুগের ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব থেকে আরম্ভ করে মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র কলকাতা শহরের কবিয়ালরা পর্যন্ত সকলেই রাজা, মহারাজা ও ধনিকদের প্রসাদজীবী ছিলেন। লক্ষ্মণসেন থেকে আরম্ভ করে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং

৩ গুপ্‌কিং : ঐ, ১০

৪ Karl Mannheim : *Man and Society—In an Age of Reconstruction*, London, 1940, Part II, P. 84 fn.

শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ, কি হাটখোলার জমিদার—সকলকেই তাঁরা তোষণ করেছেন এবং সকলেরই প্রচুর প্রশংসা ও গুণগান করেছেন। তা যদি না করতেন, তাহলে ঠিক বলা যায় না তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হত কি-না। মুকুন্দরামের পেট্রন-দর্শনের আগে চণ্ডী দর্শনের সৌভাগ্য হয় নি। পেট্রনের বরাভয় পাবার পর তিনি চণ্ডীদেবীর বরাভয় লাভ করেছিলেন। ঘনরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যশক্তির বিকাশের ইতিবৃত্তও তাই। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর কবিয়ালদের পর্যন্ত।

সুতরাং গোবরগাদায় পদ্মফুলের মতো প্রতিভা যে-কোনো পরিবেশে ফুটে উঠতে পারে, একথা ভুল। এইধরনের উক্তির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। পদ্মফুল যেমন যত্রতত্র ফোটে না, এমনকি ঘাসও যেমন যেখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠে না, প্রতিভাও তেমনি যে-কোনো সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিকাশের বা বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। শুধু তাই নয়। প্রতিভার স্বরূপও অনেকটা নির্ধারিত হয় সামাজিক পরিবেশের দ্বারা। রামপালের কি লক্ষ্মণসেনের, বর্ধমানের মহারাজার কি কৃষ্ণনগরের মহারাজার রাজসভায় যে-কবি তাঁর কবিত্ব শক্তি প্রকাশের সুযোগ পান, তাঁর কাব্যাদর্শও সেই রাজসভার পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ বা কাব্যনীতিকে তিনি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করতে পারেন না। তাঁর কাব্যরুচিও তাঁর পেট্রন তৈরি করেন। আদর্শ, নীতি ও রুচি সবই রাজসভার পরিবেশে বা ধনিক পৃষ্ঠপোষকের বৈঠকখানায় পেট্রনদের খেয়াল-খুশী মাফিক তৈরি হয়। কবি সেই আদর্শই অনুসরণ করেন, সেই নীতিই মেনে চলেন এবং সেই রুচিরই পরিচয় দেন তাঁর কাব্যে। অর্থাৎ তাঁর কবি-প্রতিভার অনেকটাই পেট্রনের মনোরঞ্জনের জন্য অপব্যয় হয়ে যায়। জয়দেব বা ভারতচন্দ্রের কাব্যরুচি ও নীতির মধ্যে যে পরিচয় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তা তাঁদের প্রতিভার যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁদের পেট্রন রাজা লক্ষ্মণসেন ও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার পরিবেশের, রাজরুচির ও রাজনীতির। রাজসভার শুধু নয়, সেই রাজার রাজত্বকালীন সমাজের রুচি ও নীতিরও সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায় তাঁদের কাব্যে। প্রতিভা তাঁদের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠার অবকাশ যতটা না পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ পায় টবের সৌখীন পরগাছা হয়ে বেড়ে উঠতে। প্রতিভার পদ্মফুল নিশ্চয়ই, কিন্তু কাচের জলপাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। বাহার আছে, মর্যাদার মহত্ত্ব নেই। কবি জয়দেবের প্রতিভা যেমন, ধোয়ীর বা গোবর্ধনের বা ভারতচন্দ্রেরও তেমনি। শক্তির জৌলুস আছে, কিন্তু তা দেখলেই বোঝা যায় যে, সেটা খেলোয়াড় কবি রাজার সামনে বাহাদুরি নেবার জন্য যথাসাধ্য কৃতিত্বের সঙ্গে দেখাচ্ছেন। রাজা-বাদশাহরা যেমন হাতির লড়াই বা ময়ূরের লড়াই দেখতেন এবং সেদিনকার কলকাতার হঠাৎ-

নবাবরা যেমন বুলবুলির লড়াই বা মেড়ার লড়াই উপভোগ করতেন, ঠিক তেমনি রাজা ও তাঁর সভাসদরা কবিদের কবিত্বশক্তির জৌলুস দেখতেন এবং কবিরাও তা দেখিয়ে ধন্য হতেন। মধ্যযুগের সামন্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এইভাবে প্রতিভার বিকাশ হত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

What happens in this intellectual field does not differ greatly from what happens in the realm of natural science; an endless variability of creation is influenced in definite directions by a certain selection. For this selection we find of importance in the past the circumstance that it proceeds from the literary interest of groups in possession of economic and social sources of power, on which the creative artists are dependent. —Schucking.

সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে বাইরের সমাজের সম্পর্ক যে কতকটা জীববিজ্ঞানের সূত্রের মতো নির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং সেই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন[৫]। কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাহিত্যিকদের আত্মম্ভরিতায় বাধলে হয়ত তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্বীকার করতে বাধ্য; সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের ইতিহাস পড়েও যাঁরা একথা স্বীকার করতে চান না, বুঝতে হবে তাঁরা ইতিহাসের কোনো শিক্ষা ও নীতিকে মূল্যবান মনে করেন না। মতামত যেখানে তর্কাতীত বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং সেই বিশ্বাস যখন ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, তখন তা খণ্ডন করার জন্য কোনো যুক্তিতর্কের অবতারণা করা অর্থহীন। ইতিহাসের ধারা থেকে যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁদের জন্যই এই বক্তব্য।

শুশ্‌কিং-এর প্রতিপাদ্য হল: প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা ঘটে, সাহিত্য শিল্প ও মনীষার ক্ষেত্রে তার চেয়ে পৃথক কিছু ঘটে বলে মনে হয় না। কথাটার তাৎপর্য হল এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন কার্য-কারণের সম্বন্ধ সূত্র দিয়ে বাঁধা থাকে, কোনো

৫ Schucking: ঐ, ১৫

ব্যতিক্রম হবার উপায় থাকে না, মনীষা ও প্রতিভার ক্ষেত্রেও কতকটা তাই থাকে। বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে বিশেষ প্রতিভা ও মনীষার বিকাশ হয়। প্রতিভার স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায়, তা ঐ সামাজিক কারণের বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। মনীষার ও প্রতিভার বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যটা কোনো অলৌকিক শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্র্য নয়, সামাজিক শক্তির বৈচিত্র্য। সাধারণত আমরা প্রতিভার এই স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করি যে, 'প্রতিভা' বা 'মনীষা' অলৌকক শক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু সে-রকম বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই, থাকতে পারেও না। প্রতিভাবান যিনি, মনীষী যিনি, তিনি ভগবান নন, মানুষ এবং রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয় একটা পথ ধরে এবং সেই পথ বাইরের সামাজিক শক্তির নির্দিষ্ট পথ। তার মানে, সমাজ যন্ত্রী, আর তিনি যন্ত্র, তা নয়। ছক্কাটা সড়ক ধরে প্রতিভার বিকাশ হয় না, একথা খুব সত্য। আঁকাবাঁকা পথে, বাঁধা পথের বেড়া লঙ্ঘন করে, মনীষার প্রকাশ হয়। ঠিক কথা। কিন্তু একথা ঠিক বলে সমাজের নিয়ন্ত্রণশক্তি নেই, একথা একেবারেই ঠিক নয়।

যুগে-যুগে প্রতিভা ও মনীষার বিকাশের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী ও গোষ্ঠীরাই তাঁদের বিকাশের ধারা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিপ্লবী প্রতিভার বিকাশ হয়েছে তখন, যখন সমাজে কোনো বিপ্লবী গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর প্রতিপত্তি বেড়েছে এবং সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই মনীষার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম বড় একটা হয় নি দেখা যায়। মহাকবি সেক্সপীয়রের অন্যতম পেট্রন ছিলেন সাউদাম্পটনের আর্ল। *Rape of Lucrece*-র উৎসর্গপত্রে সেক্সপীয়র তাঁকে লিখেছিলেন: 'What I have done is yours; what I have to do is yours.' এটা শুধু উৎসর্গ-পত্রের কথার কথা নয়। কথার মধ্যে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তার তাৎপর্য গভীর। 'যা আমি করেছি তা আপনার, বা আপনারই অনুগ্রহে'—একথা তেমন বিস্ময়কর নয়, বেদনাদায়কও নয়। কিন্তু পরবর্তী কথা: 'যা আমি করব, বা যা আমাকে করতে হবে, তাও আপনারই অনুগ্রহে'—রীতিমত বেদনাদায়ক। 'সেন্টিমেন্টের' দিক থেকে বেদনা-দায়ক, কিন্তু 'ইতিহাসের' দিক থেকে নয়। এই হল সত্যকার ইতিহাস। এই উৎসর্গপত্রের উক্তি সম্বন্ধে শুশ্‌কিং মন্তব্য করেছেন[৬]

৬ Schucking: ঐ, ১১

This might be interpreted as polite phrase-making, but that would be quite mistaken. We know how powerfully the aesthetic taste of a small aristrocratic class was able at that time to impose itself in the field of true literature...

কেউ যদি মনে করেন যে, উৎসর্গপত্রে সেক্সপীয়র ভদ্রতা করেছেন শুধু, তাহলে তিনি ভুল করবেন। শিষ্টতা ও ভদ্রতা প্রকাশের ক্ষেত্র ও পাত্র আরও অনেক ছিলেন, কিন্তু সাউদাম্পটনের জমিদার ভদ্রলোককে পাত্র নির্বাচন করা হল কেন? *Rape of Lucrece* রচনার সঙ্গে এই পেট্রনের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত রুচি চরিতার্থের কি কোনো সম্পর্ক নেই? ভক্তরা হয়ত বলবেন, নেই, কারণ ভক্তের ভাব-গদগদ মনে সেকথা ভাবতেও ব্যথা লাগবে। কিন্তু ভক্তি ও তথ্যনিষ্ঠা এক নয়। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভক্তরা ভাবান্ধ, ইতিহাস বা তথ্যের চেয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি তাঁদের কাছে অনেক বড়। দুঃখের বিষয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধির মানদণ্ডে ইতিহাসের ধারা বিচার করা যায় না। সেক্সপীয়রের মতো প্রতিভা সর্বকালের ও সর্বজনের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু যদি বলা যায় যে, তাঁর প্রতিভা ও মনীষার বিকাশের সঙ্গে তদানীন্তন সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর রুচিনীতির সম্পর্ক ছিল এবং সেই রুচি ও নীতির দ্বারা তাঁর মনীষা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাহলে কি তাঁর প্রতিভাকে খর্ব করা হয়? কখনই হয় না। অন্তত সাধারণত হয় না, বা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু 'ভক্তের' কাছে হয়, কারণ ভক্তের সঙ্গে মনীষার সম্পর্ক ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের মতোই অন্ধ। বৈষ্ণব ভক্তরা শ্রীচৈতন্য যে 'মানুষ' হয়ে জন্মেছিলেন, একথা ভাবতেও কষ্ট পান। সত্যদ্রষ্টা, শক্তিশালী বিরাট পুরুষের মতো তিনি যে যুগান্তকারী কোনো সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন, একথা বলতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন। সবই শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলাখেলা না বললে তাঁরা প্রীত হন না। ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে সরিয়ে দিয়ে একটা অলৌকিক পটভূমিকায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই হল ভক্ত মাত্রেরই নিয়ম, কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের নয়, সকল শ্রেণীর ভক্তদের। প্রতিভা ও মনীষার ভক্তরাও এর 'ব্যতিক্রম' নন। প্রতিভা স্বয়ম্ভূ বা সমাজ ও বস্তুজগৎ-নিরপেক্ষ, একথা না বললে তাঁরা মনে করেন প্রতিভাকে খর্ব করা হয়। তাঁদের সান্ত্বনা দেবার কোনো উপায় নেই, কেউ দিতে পারবেন না, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা তো একেবারেই পারবেন না।

যা বলছিলাম। কতকটা প্রাণীজগতের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো (Natural selection), সাহিত্য-শিল্পজগতেও সামাজিক নির্বাচন চলতে থাকে। নির্বাচন বৈজ্ঞানিক

নিয়মের মতোই নির্মম। নির্বাচনের ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন যেমন সম্ভব হয় জীবজগতে, তেমনি সাহিত্যজগতেও যোগ্য প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। নির্বাচনে ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা, যাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে সমাজে। সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সাধারণত দেখা যায় অর্থগৌরব ও বংশগৌরবের সঙ্গে জড়িত। যাঁদের আর্থিক প্রতিপত্তি আছে, বংশগত আভিজাত্য আছে, তাঁরাই সাহিত্যিক রুচি, নীতি, ভাল-মন্দের মাপ-কাঠি, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা খুশী হলেই সাহিত্য ও শিল্প অনেকটা সার্থক হয়, অখুশী হলে হবার সম্ভাবনা থাকে না এবং সাধারণত হয় না। তার কারণ সাহিত্য বা শিল্পানুরাগী সাধারণের সংখ্যা যতদিন সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন সেই স্তরের উপর প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর প্রভাবও থাকে যথেষ্ট। সুতরাং প্রতিভার ও মনীষার জীবনমরণ কাঠিটিও থাকে তাঁদের হাতে। এ-ক্ষেত্রে তাঁদের মুখাপেক্ষী না হয়ে কারও উপায় নেই, তা তিনি যত বড় প্রতিভাবানই হন না কেন।

মুখাপেক্ষিতার আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ইতিহাসের পাতা থেকে। সাধারণত গতানুগতিক 'সাহিত্যের ইতিহাসে' এ-সব দৃষ্টান্ত স্থান পায় না। তার মধ্যে এ-সবের কোনো মূল্য নেই, অতি নগণ্য। প্রতিভাটাই বড়, তার বিকাশের ইতিহাসটা সেখানে খুব ছোট ব্যাপার। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে এই জাতীয় দৃষ্টান্তের মূল্য খুব বেশি এবং বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন প্রতিভা ও সমাজের সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করছি, ভক্তের ঠুলিবাঁধা বলদের দৃষ্টিতে নয়, তখন দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখযোগ্য।

আলেকজাণ্ডার পোপ (Alexander Pope) বড় কবি ছিলেন। এখন হয়ত অনেকে তা বলবেন না, কিন্তু তাঁর যুগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলেই ইংলণ্ডে গণ্য হতেন। তা হলেও পোপ যখন হোমারের কাব্য অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন এবং যে অনুবাদের জন্য তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জন করেন—তখন মধ্যে-মধ্যে ছোট-খাট একটি বৈঠক ডেকে তিনি তাঁর পেট্রন লর্ড হ্যালিফাক্সকে (Lord Halifax) অনুবাদ পাঠ করে শোনাতেন। স্যামুয়েল জনসন বলেছেন যে, লর্ড হ্যালিফাক্স প্রায়ই তাঁর অনুবাদ সংশোধন করে দিতেন এবং কি করলে আরও ভাল হয় বলে দিতেন। এমনিতে যে ব্যাপারটা অন্যায় কিছু তা নয়। হ্যালিফাক্স গুণী ব্যক্তি, সংশোধন তিনি করে দিতে পারেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, গুণীদের কাছে কবি পোপ তাঁর অনুবাদ সমালোচনার্থে পাঠ করে শোনাতেন না। সেরকম কোনো সাধু অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না। শোনাতে তিনি বাধ্য হতেন এবং এমন একটি গোষ্ঠীর কাছে, যাঁরা প্রথমত তাঁর পেট্রনগোষ্ঠী, দ্বিতীয়ত হয়ত বা গুণী। কবি চসার তাই করতেন, তাঁর শিষ্য লিডগেটও (Lydgate) তাই করতেন। লিডগেটের পেট্রন ছিলেন

পঞ্চম হেনরীর ভাই গ্লুসেস্টারের ডিউক। ডিউক নিজে কবির কবিতা সংশোধন করে দিতেন পর্যন্ত। স্পেন্সারও (Spenser) তাই করেছেন। ফ্রান্সে ভোল্টেয়ারের (Voltaire) মতো প্রতিভাবানকেও তাই করতে হয়েছে। সকলকেই তাই করতে হয়েছে। কেউ ব্যতিক্রম ছিলেন কি-না সন্দেহ।

যতদিন না সাহিত্যক্ষেত্রে বাইরের 'প্রকাশক'রা অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অভিজাত-গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত পাঠকশ্রেণী তৈরি হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এই অপমান অনেকটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হলেও অনেকেই বিদ্রোহ করতে পারেন নি। কারণ বিদ্রোহ করা মানেই সমাজে প্রতিষ্ঠার সুযোগ হারানো এবং প্রতিষ্ঠা না পাওয়া বা স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই প্রতিভার অপমৃত্যু। প্রকাশকদের যুগেও যে প্রতিভা এই বিশেষ গোষ্ঠীর কবল থেকে একেবারে মুক্ত হয়েছে, তা নয়। তা হতে পারে না। প্রকাশকদের যে ইতিহাস আলোচনা করেছি আগে, তাতে দেখা যায় যে, প্রথমযুগের প্রকাশকরাও অনেকটা পেট্রন-মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং পেট্রন ও লেখকের মধ্যে থেকে তাঁরা যোগাযোগ করে দিতেন। পরবর্তীকালে প্রকাশকরাই যখন পেট্রন হন, তখন পেট্রনযুগের মনোভাব তাঁদের মধ্যেও নতুন রূপে প্রকট হয়ে ওঠে। সাহিত্যের রুচি-নীতির প্রবর্তন তাঁরাই অনেকটা করতে থাকেন। তবু পেট্রনযুগের চেয়ে প্রকাশকযুগের পরিবেশ অনেক বেশি স্বাধীন ও মুক্ত। বিভিন্ন প্রকাশকের স্বার্থের সুযোগ নিয়ে ইতিহাসে প্রথম প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকরা আত্মপ্রকাশের সুব। সুযোগ পান। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির যুগের সমাজের কথা।

সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা

প্রথম প্রস্তাব

সভ্য-সমাজে অন্যান্য সকল শ্রেণীর সঙ্গে সাহিত্যিকেরও আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু সকল শ্রেণী যেমন সমাজে সমান মর্যাদা পান নি, তেমনি সাহিত্যিকরাও পান নি। একেবারে আদিম সমাজে হয়ত অন্যান্য লোকশিল্পীদের মতো তাঁরাও মর্যাদা পেতেন, কারণ তখন অর্থের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক ততটা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ হয় নি। পরে যখন তা হয়েছে, সমাজ যখন নানাশ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছে এবং এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শাসিত ও শোষক-শোষিতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তখন সাহিত্যিকরাও বৃহত্তর লোকসমুদ্রের বুকে নগণ্য ভৃত্যরূপে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছেন—'unwept, unhonoured, unsung.'

বর্তমানযুগে সাহিত্যিকদের যে মর্যাদা বেড়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। সভা-সমিতিতে, মৃত সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে জীবিত সাহিত্যিকদের যে-রকম ডাক পড়ে, তাতে এইটুকু অন্তত পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাহিত্যের মূল্য বাড়ুক না বাড়ুক, সাহিত্যিকের মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু তারপরেও কথা আছে। সভাপতিত্ব করতে সাহিত্যিকদের যদি 'ফি' দিয়ে ডাকতে হত, তাহলে সভা-সমিতির উদ্যোক্তাদের উত্তেজনা অনেকটা কমে যেত এবং যাঁদের নিতান্তই থাকত তাঁদের আর সাহিত্যিকদের কাছে ধর্ণা দিতে হত না। বরং তখন হয়ত উল্টো ব্যাপারই ঘটত। সাহিত্যিকরা নিজেরাই সভা-সমিতির উদ্যোক্তাদের কাছে ধর্ণা দিতেন, যেমন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে দেন। সুতরাং এ-যুগের সাহিত্যিকদের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়লেও, ভেবে দেখা উচিত, সেই মর্যাদাটা কি বস্তু, কেনই বা বেড়েছে এবং কতটুকু বেড়েছে।

সত্যিই কি সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে? সোজাসুজি উত্তর দেবার মতো সহজ প্রশ্ন নয়। কলকাতা শহরে দেখা যায় বাড়িওয়ালারা আজও অনেকে সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনলে বাড়ি ভাড়া দিতে চান না। বাইরে হয়ত 'To Let'-এর সঙ্গে 'Writers & Pleaders not allowed' কথাটা লেখা থাকে না, কিন্তু অনেক বাড়িওয়ালাকে দেখেছি সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনে জবাব দিতে: 'ভাড়া

দেব না।' এটা কি সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদার পরিচয়? এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। স্বনামধন্য কোনো সাহিত্যিক (বিশেষ করে ফিল্মে বই লিখে যিনি স্বনামধন্য হয়েছেন) হয়ত কড়া বাড়িওয়ালার কাছেও খাতির পাবেন, কিন্তু সেটা তিনি 'সাহিত্যিক' বলে নয়, নিজেও বাড়িওয়ালা হতে পারেন, এরকম টাকার মালিক বলে বা সঙ্গতি আছে বলে। যে-কোনো প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের তুলনায় একজন গভর্ণমেণ্ট আফিসের সাধারণ কেরানীর মর্যাদা অনেক বেশি বাড়িওয়ালার কাছে, দোকানদারের কাছে এবং হাটবাজারে। যে-সমাজে বাড়িওয়ালাদের মর্যাদা বেশি, সে-সমাজে বাড়ি করাটাই বড় কথা, বই লেখা নয়। যে-কোনো সামাজিক সভায় বাড়িওয়ালা ও গাড়িওয়ালারা যে-রকম মর্যাদা পান, সাহিত্যিকরা তার কিছুই পান না। এখনও না। যে দু'একজন পান তাঁরা সাহিত্যিক হয়েও বাড়ি ও গাড়িওয়ালা হতে পেরেছেন বলে পান, কেবল সাহিত্যিক বলে পান না। কেবল সাহিত্যিকদের মর্যাদা দু'চারজন সাহিত্যক্ষ্যাপার সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাও সেটা ভুয়ো মর্যাদা, তার কোনো 'মেটিরিয়াল' বা বাস্তব ভিত্তি নেই। যেমন কোনো সাহিত্যিক যদি তাঁর অনুরাগীদের কাছে টাকা ধার চান তো পাবেন না, কারণ অনুরাগীরা জানেন যে ঋণের টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। এরকম আরও অনেক ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। লাভ নেই দিয়ে। আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

সাহিত্যিক স্বামীর গর্বিতা স্ত্রী হতে চান, এরকম দু'একজন ক্ষণজন্মা কন্যা হয়ত বর্তমান সমাজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক জামাইয়ের শ্বশুর হতে চান, এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। সাহিত্যিকরাও যখন বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দেন সংবাদপত্রে তখন তাঁর পেশা ও চাকরির কথা উল্লেখ করেন, সাহিত্যনেশার কথা বলেন না। 'কি করেন?' 'কবিতা লিখি বা শুধু লিখি', একথা রবীন্দ্রনাথেরই বলা শোভা পায় এবং বলেও কিছু আসে যায় নি তাঁর। কিন্তু কবিতা লিখি, গল্প লিখি বা প্রবন্ধ লিখি, কেবল এই কথা বললে কোনো উদীয়মান সাহিত্যিকের চাকরি জুটবে না, স্ত্রী জুটবে না এবং জীবনে কোনদিন সংসারধর্ম করাই হয়ত তাঁর সম্ভব হবে না। ভাবী জামাই হিসেবে শ্বশুরের কাছে সাহিত্যিক বা শিল্পীর মর্যাদা যে কতটুকু, তার সুন্দর পরিচয় দিয়ে গেছেন থ্যাকারে (Thackeray)। থ্যাকারের বিখ্যাত *The Newcomes* গ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লেডি কিউ ও তাঁর নাতনী ইথেলকে চেনেন। একজন চিত্র-শিল্পী তাঁর নাতনী ইথেলকে বিবাহ করতে চেয়েছেন শুনে লেডি কিউ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন

An artist propose for Ethel ! One of her footmen might propose next...The father came and proposed for this young painter, and you didn't order him out of the room !

থ্যাকারের যুগের মনোভাব অনেক বদলে গেছে। লেডি কিউদের যুগও আর নেই। কিন্তু এখনও অনেক লেডি কিউ আছেন যাঁরা তাঁদের কন্যা বা নাতনীর পাণিপ্রার্থী কোনো সাহিত্যিককে স্বচ্ছন্দে এইধরনের কথা বলে বিদায় করতে পারেন। এদিক দিয়ে মনে হয় না যে, থ্যাকারের যুগ পার হয়ে আমরা খুব বেশি দূর এগিয়ে এসেছি। আগের চেয়ে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে সাহিত্যের মর্যাদা বেড়েছে, সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা বেড়েছে, কিন্তু তাঁর সামাজিক মর্যাদা বিশেষ বেড়েছে বলে মনে হয় না। এ-যুগের কোনো বড়লোকের কন্যা দরিদ্র শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রেমে পড়ে হয়ত তাঁকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু সেটা সাধারণত চলচ্চিত্রের নায়িকাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সাহিত্যিক তাঁর নিজের দিবাস্বপ্ন বা অচরিতার্থ বাসনাকে এইভাবে চলচ্চিত্রের মধ্যে চরিতার্থ করতে চান বলেই ধনীর কন্যা দরিদ্র শিল্পীর প্রেমে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করে সুখীও হন। আসলে বাস্তব জীবনে তা কখনও ঘটে না বলেই চলচ্চিত্রে দেখতে তা ভাল লাগে। এ-রকম ব্যাপার মনোমৈথুনের ট্র্যাজিক দৃষ্টান্ত হলেও, এর মধ্যে সামাজিক সত্য (social reality) বলে কিছু নেই। সামাজিক সত্যটা ঠিক তার বিপরীত। সেই ট্র্যাজিক রিয়ালিটিকে কমেডিতে পরিণত করে সাহিত্যিক নিজে তাঁর ব্যর্থ মনস্কামনা পূরণ করেন মাত্র। লোকের ভাল লাগে এ-রকম উপন্যাস পড়তে বা ফিল্ম দেখতে, তার কারণ বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণীর হতভাগ্য কোটালপুত্র ও কোটাল-কন্যাদের প্রায় সকলেরই প্রাণের বাসনা তাই। তাঁদের বাসনা সমাজে চরিতার্থ হয় না যখন, তখন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় অথবা চলচ্চিত্রের পর্দায় যদি তা ক্ষণিকের জন্যও পরিপূর্ণ হয়, তাহলে সেইটুকুই লাভ। এইজন্য আমাদের এই সমাজে এই জাতীয় সাহিত্যের হঠাৎ-জনপ্রিয়তা এত বেশি। ধনীর পুত্র ও দরিদ্রের কন্যা অথবা দরিদ্রের পুত্র ও ধনীর কন্যার মধ্যে প্রেম—এ যেন দুর্ভাগা মধ্যবিত্তের প্রাণের কথা ও ব্যথা দুই-ই। তাই যে সাহিত্যিক তাকে মধ্যযুগের রোমান্সের মতো রূপায়িত করতে পারেন সাহিত্যে, তিনি হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু এইধরনের দরিদ্র শিল্পী সাহিত্যিক ও ধনিকের কন্যার প্রেম সিনেমার পর্দায় দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, এটাই 'সোস্যাল রিয়ালিটি', তাহলে তিনিও যে দিবাস্বপ্নবিলাসী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। থ্যাকারের যুগ শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। অর্থাৎ মর্যাদার মক্কা অনেক দূর।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং বলেছেন—'In past centuries the position

of the artist in society was nevér particularly good. Those, of course, who had reached the peaks of Parnassus always found ready and honoured acceptance in the highest circles of society.' যাঁরা পার্নাসাসের চূড়ায় পৌঁচেছেন তাঁরা যে উচ্চসমাজে সাদর মর্যাদা ও সমাদর পাবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কথা হচ্ছে চূড়ায় ক'জন পৌঁছতে পারেন? তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, চূড়ান্ত সার্থকতার কাছে, যে ক্ষেত্রেই হোক, সকলেই মাথা হেঁট করেন। সেখানে বিশিষ্ট পেশার কোনো প্রশ্ন আসে কি? কথাটা তলিয়ে ভেবে দেখবার মতো। সাধারণ দরজি থেকে যিনি বিরাট ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের লক্ষপতি মালিক হয়েছেন, সাধারণ গামছা-বিক্রেতা থেকে যিনি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তাঁকে মর্যাদা দেয় না কে? সকলেই মর্যাদা দেন, কিন্তু কাকে দেন? তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ক্ষমতাকে দেন এবং সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন তাঁর সাফল্যকে, সার্থকতাকে। 'Nothing succeeds like success.'—কথাটা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাতে একথা বোঝায় না যে সেই পেশাকে বা পেশাদারকে তাঁরা মর্যাদা দেন। দরজি থেকে যিনি ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের মালিক হন, তাঁকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ দরজিকে মর্যাদা দেওয়া নয়। তেমনি যে সাহিত্যিক সার্থকতার পর্বতশৃঙ্গে উঠেছেন, তাঁকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ সাহিত্যিক বা সাহিত্যকে মর্যাদা দেওয়া নয়। কথাটা বিশেষভাবে বোঝা প্রয়োজন। লর্ড চেস্টারফিল্ড যে পোপ (Pope) বা এ্যাডিসনের (Addison) সাহচর্যে নিজেকে ধন্য মনে করতেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব কামনা করতেন, তা থেকে একথা বোঝায় না যে তিনি সাহিত্যিক পেশাকে শ্রদ্ধা করতেন। সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, জয়দেব থেকে ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালারা পর্যন্ত রাজসভায় বা বড়লোকের বৈঠকখানায় যে মর্যাদা পেতেন, তাকে আধুনিক অর্থে কোনমতেই 'সামাজিক মর্যাদা' বলা যায় না। সামাজিক মর্যাদা সেটা নয়। সেটা হল মধ্যযুগীয় বদান্যতা ও উদারতা, আধুনিকযুগের ব্যক্তিগত বা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।

মোগলযুগের শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে (সপ্তদশ শতাব্দীর কথা) ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের যা বলে গেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন

> If the artists were encouraged, the useful and fine arts would flourish; but these unhappy men are contemned, treated with harshness, and inadequately remunerated for their labour. The artists, therefore, who arrive at any eminence in their art are those only who are in the service

of the king or of some powerful Omrah, and who work exclusively for their patron —Letter to Vayer, July 1663.

বার্নিয়েরের শেষ কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিল্পীদের যে কোনো মর্যাদা ছিল না, একথা তিনি পরিষ্কার বলেছেন। শিল্পীদের ক্ষমতা থাকলেও সেই ক্ষমতাপ্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। তাঁদের মধ্যে দু'একজন যাঁরা খ্যাতি অর্জন করতেন, তাঁরা হয় কোনো রাজসভায়, না হয় কোনো ওমরাহের পোষকতায় থেকে তাঁর মনোরঞ্জন করার জন্য শিল্প রচনা করতেন। রাজা বা ওমরাহ্ তাঁদের সুনজরে দেখতেন, পোষকতা করতেন বলে সাধারণ লোকও তাঁদের মর্যাদা দিত। সেটা শিল্পীর মর্যাদা নয়, রাজা বা ওমরাহের মোসাহেবের মর্যাদা।

বার্নিয়ের আমাদের দেশের সপ্তদশ শতকের কথা বলে গেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিল্পীর বা সাহিত্যিকের বিশেষ কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। দু'একজন ভাগ্যবান যাঁরা রাজসভায় প্রবেশাধিকার পেতেন, তাঁরাই যা সামান্য মর্যাদা পেয়ে গেছেন সমাজে। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। ইংলণ্ডেও সাহিত্যপ্রতিভার চেয়ে অর্থের মর্যাদা ছিল বেশি, এই সেদিন পর্যন্ত। খুব বিশদৃশভাবে ছিল। শুশ্‌কিং তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন

It strikes us today, however, as odd when we hear that in 1723 a comedy of Steele's enjoyed great popularity because the author was reputed to have an income of a thousand a year. Clearly there was nothing much in being an artist.

বাস্তবিকই তাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

শুশ্‌কিং বলেছেন : 'For a long time the son of a 'good family' was considered in some way to have lost caste if he became a professional writer or painter, and still more if he became an actor. To live by the pen was not very respectable.' সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনা যাঁরা আরামকেদারায় বসে লেখেন তাঁরা হয়ত কথাটা ঠিক জানেন না, বা জেনেও স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সাহিত্যিকদের ইতিহাস যাঁরা বাস্তব সমাজের পটভূমি থেকে বিচার করেন, তাঁরা একথাটা বিশেষভাবে জানেন ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

অভিজাত বংশের সন্তান যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এককালে সাহিত্য বা শিল্পচর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা রীতিমত মানহানিকর ব্যাপার ছিল। তাতে তাঁদের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা দুয়েরই হানি হত। এককথায় বলা যায়, কালি-কলম, রঙ-তুলি বা বাটালির পেশা কোনদিনই সমাজে বিশেষ মর্যাদা পায় নি। দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন শুশ্‌কিং। সমাজের ইতিহাস বাদ দিয়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেন, তাঁদের কাছে এই দৃষ্টান্তগুলি খুব 'শকিং' মনে হবে নিশ্চয়।

ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্ররা কংগ্রীভের (Congreve) কথা নিশ্চয় জানেন। নাট্যকার হিসেবে কংগ্রীভ যখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন তখন তিনি একবার ফ্রান্সে বেড়াতে যান। ভল্টেয়ার (Voltaire) তখন বেঁচে ছিলেন। কংগ্রীভ ফ্রান্সে এসেছেন শুনে ভল্টেয়ার তাঁকে সাহিত্যিক শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন। আলাপের সময় কথাটা ভল্টেয়ার বলে ফেলেছিলেন কংগ্রীভকে। বেশ উৎসাহিত হয়ে ভল্টেয়ার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার মতো একজন বিখ্যাত লেখককে চোখে দেখলাম এবং আপনার সঙ্গে আলাপ হল, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।' কথাটা শুনে কংগ্রীভ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, 'মার্জনা করবেন, আমি লেখক নই, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাত্র। ভদ্রলোক বলেই আমার পরিচয় দেবেন, লেখক বলে নয়। ও পরিচয়টা আমি দিতে চাই না।' ভল্টেয়ার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কল্পনাও করেন নি, এ-রকম একটা উত্তর কংগ্রীভের মুখ থেকে তাঁকে শুনতে হবে। ভল্টেয়ার অত্যন্ত মেজাজী ও তেজী ছিলেন। অপ্রস্তুত হয়ে ভল্টেয়ার ফিরে এলেন না। তিনিও বেশ কড়া জবাব দিলেন কংগ্রীভের মুখের উপর। বললেন, 'আমি কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করতে আসি নি। ভদ্রলোক কংগ্রীভের সঙ্গে আমার পরিচয় না হলেও আমি দুঃখিত হতাম না। আমি লেখক কংগ্রীভের সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিলাম।' কল্পনা করা যায় না। কংগ্রীভের মতো খ্যাতনামা লেখকের কাছেও 'ভদ্রলোকে'র মর্যাদা অনেক বেশি 'লেখকে'র চেয়ে।. লেখক বলে পরিচয় দিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করতেন।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিখ্যাত সাহিত্যিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের (Samuel Richardson) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন লেডি ব্রাড্‌সহাউ (Lady Bardshaugh)। ল্যাঙ্কাশায়ার মহলের অভিজাতবংশের মহিলা লেডি ব্রাড্‌সহাউ। একে অভিজাত, তার উপর লেডি। রিচার্ডসনের সঙ্গে লেডি ব্রাড্‌সহাউ নিয়মিত পত্রালাপ করতেন এবং পত্রের মধ্যে তাঁর গভীর অনুরাগও প্রকাশ পেত। কিন্তু তিনি পত্রালাপ করতেন একান্ত গোপনে। রিচার্ডসনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা

তিনি কারও কাছে কোনদিন প্রকাশ করেন নি। পাছে কেউ জেনে ফেলে এই ভয়ে সবসময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। যদি তাঁর ল্যাঙ্কাশায়ারের বন্ধুরা কোনরকমে জানতে পারতেন যে তিনি একজন লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ করেন, তাহলে হয়ত তাঁরা তাঁকে সমাজচ্যুত করতেন। লেডি ব্রাড্‌সহাউ মুশকিলে পড়ে গেলেন, যখন স্যামুয়েল রিচার্ডসন তাঁকে তাঁর স্বাক্ষরসহ একখানি নিজের ফটোগ্রাফ উপহার দিলেন। কোথায় ফটোগ্রাফখানি তিনি রাখবেন তাই নিয়ে ভেবে আকুল হলেন লেডি। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন যে, রিচার্ডসনের স্বাক্ষর বদলে ফেলে, তার বদলে 'ডিকেন্‌সন' লিখে তিনি ছবিটা রেখে দেবেন। 'When he sent her his portrait she altered his signature to Dickenson, to prevent the acquaintance from coming to light.'[১] সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা যে কিরকম ছিল, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে, আমার মনে হয়, লেখকরা মর্মে-মর্মে বুঝতে পারবেন। এর আগে থ্যাকারের লেডি কিউ-এর কথা বলেছি। লেডি ব্রাড্‌সহাউ সাহিত্যিকের অনুরাগী হয়েও লেডি কিউ-এর মনোভাব কাটাতে পারেন নি।

'জেণ্টলম্যানে'র মনোভাব মধ্যযুগের অন্তিমকাল পর্যন্ত এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠত সর্বক্ষেত্রে যে অনেক সময় তা দেখে চমকে উঠতে হত। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মধ্যযুগীয় মনোভাবের রেশ ছিল। একটা যুগের দৃষ্টিভঙ্গী যান্ত্রিক নিয়মে যুগান্তরের সময় অথবা নতুন যুগের অভ্যুদয়কালে হঠাৎ অন্তর্ধান করে যায় না, যেতে পারে না। যেতে অনেক সময় লাগে। সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ধীরে-ধীরে বদলায়। নতুন সামাজিক সম্পর্ক মানুষকে নতুন ভঙ্গীতে দেখতে ও বিচার করতে শেখায়। সেটা আরও বেশি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার অনেক পরে ধীরে-ধীরে মানুষের মানসিক গড়নটা বদলাতে থাকে। মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিকযুগে পৌঁছলেই মানুষের মানসিক গড়ন আধুনিক হয় না বা রাতারাতি দৃষ্টিভঙ্গী বদলায় না। সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদাও হঠাৎ রাতারাতি বদলায় নি। অন্যেরা সাহিত্যিকদের কি চোখে দেখতেন তা লেডি কিউ ও লেডি ব্রাড্‌সহাউ-এর দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। তার চেয়েও বড় সত্য হল, সাহিত্যিকরা নিজেরাই 'সাহিত্যিক' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন। কংগ্রীভ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পেট্রনদের পরিবর্তে যখন প্রকাশকদের যুগ এল, তখনও সাহিত্যিকরা নিজেরাই এই মনোভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। মধ্যযুগের সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড

১ Schucking: *The Sociology of Literary Taste:* Chap. 3, pp. 16-25

তখনও তাঁরা সগৌরবে বহন করে নিয়ে চলছেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে সাহিত্যিকরা তাঁদের বইয়ের জন্ম পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা নিতে সঙ্কোচবোধ করতেন। কারণ, লিখে টাকা নেন বা টাকা রোজগার করেন, একথা ভাবতেও তাঁদের লজ্জা হত। তাতে 'ভদ্রলোক' হিসেবে তাঁদের সামাজিক মর্যাদার হানি হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। সুতরাং বইয়ের টাকা প্রকাশকদের কাছেই জমা থাকত। অনেকে বোধহয় জানেন না (এবং জানলে দুঃখিত হবেন) যে করুণ 'এলিজি' (*Elegy*) কাব্যের কবি টমাস গ্রে পর্যন্ত তাঁর প্রকাশকের কাছ থেকে ঐ কবিতার জন্ম টাকা নিতে রাজী হন নি, তাঁর ভদ্রলোকসুলভ মর্যাদার হানি হবে বলে। ভদ্রলোকের মর্যাদা সম্বন্ধে এ-রকম টন্‌টনে জ্ঞান নিয়ে গ্রে'র মতো কবি 'এলিজি' কাব্য রচনা করেছিলেন, একথা ভাবতেও কিরকম লজ্জা হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক ওয়াল্টার স্কটের মনোভাবও তাই ছিল—'Scott always preferred to be known as a landed gentleman rather than as an author'[২] সাহিত্যিক বলে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে জমিদার বলে পরিচয় দিতে স্কট অনেক বেশি গর্ববোধ করতেন। কবি বাইরন যদিও শেষকালে প্রকাশকদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব বেশি টাকা আদায় করার চেষ্টা করেছেন, তাহলেও প্রথম দিকে বই-এর জন্ম টাকা নিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করতেন, ঐ একই কারণে।

প্রকাশকের যুগেও দেখা যায় যে সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে সাহিত্যিকরা লেখার জন্ম টাকা নিতে সঙ্কোচবোধ করতেন। সুতরাং সাহিত্যিক পেশার যে কিরকম সামাজিক মর্যাদা ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ ছাড়া, 'ছদ্মনামে' (pen-name) লেখার রীতিও প্রধানত এই কারণে চালু হয় বলে মনে হয়। ভদ্রলোক ও অভিজাত বংশের সাহিত্যিকরা স্বনামে লিখতে চাইতেন না, সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে। পরিবারের আভিজাত্যের খ্যাতি যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্মই তাঁরা 'ছদ্মনামে' লিখতে আরম্ভ করেন। জার্মানির কথা উল্লেখ করে শুশ্‌কিং এ-সম্বন্ধে বলেছেন

> In the matter of the social standing of the artist it is very significant, for example, that in Germany at the beginning of the century, and for a long time after it, many aristocrats who engaged in literary work felt it necessary to assume middle class pennames—

২ Schucking: ঐ, 'Shifting of the Sociological Position of the Artist' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কাউণ্ট বেরন, এডলার সকলে তাঁদের বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ছদ্মনাম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। শুধু জার্মানিতে নয়, অন্যান্য দেশেও এই রীতি চালু হতে থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে ধীরে-ধীরে আধুনিকযুগে—'It was the natural consequence of the changed outlook on life associated with the rise of the middle class.' ধনতান্ত্রিকযুগে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের পর, সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা বাড়তে থাকে। কিন্তু রাতারাতি বাড়ে নি, খুব ধীরে-ধীরে বেড়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত নতুনযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যেও মধ্যযুগের মনোভাব বেশ সজাগ ছিল দেখা যায়। বাইরনের মতো কবির মন থেকেও অতীত ধারণার মূল উপড়ে ফেলা সম্ভব হয় নি অনেকদিন পর্যন্ত। ১৮১৩ সালে ১৪ই নভেম্বরের ডাইরীতে বাইরন লেখকদের সামাজিক মর্যাদার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন [৩]

> I do think the preference of writers to agents—the mighty stir made about scribbling and scribes, by themselves and others—a sign of effeminacy, degeneracy and weakness. Who would write, who had anything better to do ?

এখানে বাইরন লেখকদের সম্বন্ধে mighty stir-এর কথা উল্লেখ করেও বলছেন যে ওটা degeneracy-র লক্ষণ। তিনি ১৮১৩ সালে এমন কথাও বলেছেন যে 'Who would write, who had anything better to do ?' প্রচলিত সংস্কার, প্রথা বা দৃষ্টিভঙ্গী রাতারাতি বর্জন করা যে কত কঠিন, তা বাইরনের এই ১৮১৩ সালের উক্তি থেকে বোঝা যায়। নতুনযুগের বিকাশ হলেও, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়লেও, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের মতো দেশে বাইরনের মতো কবিও, সাহিত্যিকদের নিয়ে মাতামাতি করাটাকে, চারিত্রিক অবনতি ও মেয়েলিপনার লক্ষণ বলে অভিযোগ করছেন। সাহিত্যিকরা নিজেরাই সকলে তখনও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হন নি দেখা যায়। তার অনেক পরে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং অন্যের কাছ থেকে যোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন। তার ইতিহাস খুব বেশি হলে একশো বছরের বেশি নয়। কিন্তু সেই মর্যাদার স্বরূপ কি ? সত্যিই কি সেটা খাঁটি সাহিত্যিক পেশা ও প্রতিভার মর্যাদা, না সাহিত্যিক ব্যবসায়ে সাফল্যের মর্যাদা ?

৩ শুশ্‌কিঙের গ্রন্থে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উদ্ধৃত

উপনিবেশের সাহিত্য

বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত

বাংলা হাতেলেখা পুথির প্রচলন শেষ হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষদিকে। বাংলা দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রায় একশো বছর পর পর্যন্ত হাতেলেখা পুথির কদর ও প্রচলন ছিল দেখা যায়। তার প্রধান কারণ দু'টি। প্রথম কারণ হল, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর সবরকমের বই ছাপা হত না এবং ছাপা সম্ভবও ছিল না। মুদ্রিত বইয়ের প্রচার ধীরে-ধীরে হয়েছে, রাতারাতি হয় নি। কোনদেশেই হয় নি মুদ্রণও তখন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং বহু মূল্যবান বই পাণ্ডুলিপি আকারেই থাকত, ছাপা সম্ভব হত না। দু'চারজন পণ্ডিত ও অনুরাগী পাঠক প্রয়োজনবোধে লিপিকর নিযুক্ত করে পাণ্ডুলিপি 'কপি' করিয়ে নিতেন। রাধাকান্ত দেব ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদেরও তাই করতে হয়েছে। পাণ্ডুলিপি প্রচলিত থাকবার দ্বিতীয় কারণ হল, পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপা হয়েছে, যেমন এখনও হয়। বইয়ের 'মূল্য' অনুযায়ী বই ছাপা হয় নি, আজও সবসময় হয় না। এমন অনেক পুথি ছিল, যা মূল্যবান হলেও, ব্যয়বহুল বলে মুদ্রিত করা সম্ভব ছিল না এবং মুদ্রিত হলেও তার পাঠক পাওয়া যেত না। প্রাচীন পুথি নয় শুধু, নতুন-লেখা বইও অধিকাংশ সময় পাঠকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ছাপা হত। প্রাচীন পুথি আজও অনেক ছাপা হয় নি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুথিশালায় আজও বহু মূল্যবান পুথি অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত আছে।

হাতেলেখা পুথির যুগে সমাজে সাধারণ 'পাঠকগোষ্ঠী'র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রাজা-মহারাজা ও জমিদার-তালুকদাররা মধ্যে-মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনে পুথি নকল করিয়ে নিতেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও লিখে নিতেন, তবে রাজা বা রাজকুমাররা ধৈর্য ধরে পুথি নকল করতে পারতেন না। মধ্যে-মধ্যে রাজকন্যা ও রাজমহিষীরা করতেন। বনবিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী লিখিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের পুথি (২৬২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় আছে। মুক্তকেশী বসুজায়া-লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের পুথিও (২৬৩৩) আছে। রাজা-মহারাজারা যে পুথি সবসময় নিজেদের পাঠার্থে নকল করাতেন তা নয়। দেবালয়ে, ধর্মানুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দান করবার জন্যও পুথি নকল করা হত। সোনা দান, গো-দানের মতো পুথি দানও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। ধর্মশাস্ত্রে তাই পুথি দানের মাহাত্ম্য কীর্তন

করা হয়েছে দেখা যায়। লিপিকরেরাও তার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। পুথি দান নয় শুধু, পুথি নকল করলেও যে পুণ্যলাভ করা যায়, লিপিকররা সেকথাও উল্লেখ করেছেন। মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের পরেও দেখা যায়, এই পুণ্যার্জনের লোভে অনেক ধনী ব্যক্তি প্রচুর অর্থব্যয় করে বই ছেপে বিতরণ করেছেন। তার মধ্যে বর্ধমানের রাজাদের প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

পুথি নকল করা যে খুবই কষ্টকর ব্যাপার, তা বলে বোঝাবার দরকার নেই। সেকালের পেশাদার লিপিকররা, একালের প্রেস-কম্পোজিটরদের মতো, একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠলেও, যথেষ্ট মেহনৎ করে তাঁদের অর্থ রোজগার করতে হত। ১১৫৯ সালে কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের পুথি নকল করে লিপিকর আত্মারাম ঘোষ 'দগিণা ১ জোড়া কাপড় আর ২ তঙ্কা' পেয়েছিলেন (সোসাইটির পুথি, ৯৷৩২২)। তখনকার দিনে একজোড়া কাপড়ের দাম দু'টাকা ধরলেও, কালিকামঙ্গল পুথির মূল্য বা খরচ পড়ে চারটাকা। আজকালকার টাকার মূল্যহারে অন্তত বত্রিশ টাকা। পুথি কপি করানো যে কত ব্যয়সাধ্য ছিল, তা এই সামান্য হিসেব থেকেই অনুমান করা যায়। মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে লিপিকরদের 'রেট' কিছু যে কমে নি তা নয়। পেটের দায়ে ও প্রতিযোগিতার ফলে কিছুটা তাঁরা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, দু'হাজার শ্লোক-সম্বলিত 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের পুথি মাত্র পাঁচসিকা দিয়ে কিনেছিলেন। ১৮০২ সালে পূজারী গোস্বামীর গীতগোবিন্দটীকার একখণ্ড দশ আনায় বিক্রি হয়েছিল, একথা পুথিতেই লেখা আছে (সোসাইটির পুথি, ৭ খণ্ড, ১৩৪)। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলেই যে ক্রমে পুথির মূল্য কমে আসছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু রেভারেণ্ড ওয়ার্ড সাহেব, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পুথি নকলের হার অত্যন্ত বেশি বলে অভিযোগ করেছেন। তখন ৩২,০০০ অক্ষর নকল করাতে বারো আনা থেকে একটাকা পর্যন্ত দিতে হত। মনে হয়, ওয়ার্ড সাহেব পুথি নকলের খরচের কথা ভেবে এই অভিযোগ করেছেন, লিপিকরের পরিশ্রমের কথা ভেবে বলেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেখা যায়, এই হার বেড়ে প্রায় চতুর্গুণ হয়েছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৬৯ সালের কার্যবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তখন পুথি নকলের হার ছিল একহাজার শ্লোক প্রতি চারটাকা। অনভিজ্ঞ লিপিকররা ছাপাখানার আতঙ্ক দ্বিতীয়যুগে কাটিয়ে উঠে, একথা বুঝেছিলেন যে, সব পুথি ছাপা সম্ভব নয় এবং ছাপার হারও এমন কিছু কম নয় যে তাঁদের পারিশ্রমিকের হার কমাতে হবে। পরবর্তীকালে, ছাপাখানার কাজ ভালভাবে চালু হবার পরেও, পুথি নকলের হার বৃদ্ধির কারণ তাই বলে মনে হয়।

এত ব্যয় করে ও কষ্ট করে, সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে পুথি নকল করানো হত না, তা বলাই বাহুল্য। পুথির ধনিক মালিকই পুথি পাঠ করতেন, অথবা দান করতেন। পুথিগত বিদ্যার কোনো প্রচার হত না। বাইরের সমাজের সাধারণ লোক পুথি পাঠ করবার কোনো সুযোগও পেত না। এমনকি, সাধারণ লোকের মধ্যে দু'চারজন বিদ্যোৎসাহী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ধনিকের গৃহ থেকে পুথি চুরি করে যে পাঠ করবেন, তারও কোনো উপায় ছিল না। লিপিকররা, বোধহয় পুথির মালিকদের পরামর্শে, পুথির শেষে কড়া দিব্য দিয়ে রাখতেন, যাতে পুথি কেউ না চুরি করে। যেমন :

অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেঽনঘ।
কর্তুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ॥
আত্মনো হ্যুপকারায়োপকারায় পরস্য চ।
ইদং হরতি যো মূঢ়স্তস্য তাতঃ পশুর্ধ্রুবম্॥
(সোসাইটি, ৭। ৪৯৭৫)

দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি
মাতা গাধিং পিতা সুকরং জর্ম্মে জর্ম্মে
(পরিষৎ-পুথি, ১৭২)

এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে।
সে সাসুরে হইবেক স্বার পুত্রবধূকে হরণ করিবে।
(পরিষৎ-পুথি, ২৮৫)

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা পুথির বিবরণ, ৩। ৫২২)

'বংশোক্ষয় ভবেৎ', 'পশুর্ধ্রুবম্', 'মাতা গাধিং পিতা সুকরং', 'পুত্রবধূকে হরণ করিবে', 'গোব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক' ইত্যাদি কটূক্তি ও অভিশাপ উপেক্ষা করে, কেবল জ্ঞানার্জনের তাড়নায়, সাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে পুথি চুরি করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। পুথির যুগে জ্ঞানবিদ্যা তাই ধনিকের গৃহে ও রাজসভায় বন্দী হয়ে থাকত। সাধারণ মানুষের তার মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না।

ছাপাখানা যখন স্থাপিত হল তখন এক নতুনযুগের সূচনা হল আমাদের দেশে। বহির্জগতে যুগে যুগে অনেক বিপ্লব হয়েছে এবং তার ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে জ্ঞানজগতের কোনো বিপ্লব হয় নি কোথাও। পৃথিবীর কোনো দেশই হয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে ইয়োরোপে যেমন বিদ্যাজগতে এক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, আমাদের ভারতবর্ষেও তাই

হয়েছিল। ভারতবর্ষের বা বাংলা দেশের ছাপাখানার বিস্তারিত ইতিহাস এখানে আলোচনা করব না। যোগ্য ব্যক্তিরা সে-সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছেন। তথ্যাকীর্ণ সেই নীরস ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই। বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রসার প্রসঙ্গে বাংলা দেশের ছাপাখানা ও মুদ্রকদের সম্বন্ধে যতটুকু বলা দরকার, তাই বলব।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৫৫৬ ও ১৫৫৭ সালে, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায়, প্রথম বই ছাপা হয়। বাংলাভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হল 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। ১৭৪৩ সালে মুদ্রিত। বাংলাভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নয়, রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা দেশেও মুদ্রিত নয়, পর্তুগালের লিস্‌বন শহরে মুদ্রিত। লেখকের নাম পাদ্রি মানোএল্-দা-আসসুম্পসাম্। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। বইয়ের মধ্যে মোটামুটি রোমানক্যাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি বর্ণনা করা হয়েছে। রোমান থেকে বাংলায় অক্ষরান্তরিত করলে, বইয়ের গোড়ার আবেদনটি এইভাবে পাঠ করা যায়[১]

বেঙ্গালীরে জানান

পড়হ

দোস্ত বেঙ্গলী, শোন : পুথি সকলের উত্তম পুথি, শাস্ত্রসকলের উত্তম শাস্ত্র ; শাস্ত্রীসকলের উত্তম শাস্ত্রী খ্রি‌স্তর শাস্ত্রী, কৃপার শাস্ত্র এবং কৃপার শাস্ত্রের পুথি। এহি পুথিতে শোনো মন দিয়া পাইবা বুঝন, বুঝান, বুঝিবার বুঝাইবার উপায় তরিবার। আস্থার ভেদের অর্থ শোনো, শোনাও ; পৃথকে জানিয়া বুঝো, বুঝাও, পরিণামে পন্থ ধরো ধরাও ; শিষ্য গুরুর ন্যায়েতে ন্যায় করিতে শিখো, শিখাও ; এহা জানিয়া, বুঝিয়া, মানিয়া মুক্তি হইবেক ; দশ আজ্ঞা পালন করো যদি।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদের বিশেষ স্থান আছে। কিঞ্চিদধিক দুশো বছর আগেকার বাংলা গদ্যভাষার নিদর্শন এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বাংলাভাষা চর্চার আদিযুগে বিদেশীদের দ্বারা রচিত বাংলা রচনার সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন এই বইটি। পূর্ববঙ্গের (ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের) প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে স্বল্পাধিক সাধুভাষার সংমিশ্রিত রূপের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবেও

১ কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ : শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

এর মূল্য আছে। তা ছাড়া, রোমান বর্ণমালায় হলেও, বাংলাভাষার এই প্রথম মুদ্রিত রূপ বলে, এ-বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।[২]

ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় কোচিনে। ১৫৭৭ সালে জন্ গোনসালভেস নামে একজন স্পেনীয় পাদ্রি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত করে, সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের *Doctrina Christao* গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রিত করেন। অনূদিত গ্রন্থের নাম 'ক্রীস্ট্য বন্নকনম্'। এই 'ক্রীস্ট্য বন্নকনম্'ই ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত ভারতীয় ভাষার সর্বপ্রথম বই। এ-বইয়ের একখানি কপি মাত্র প্যারীসের 'বিবলিওথেক্ ন্যাশানেল্' লাইব্রেরীতে আছে, তাও ১৫৭৯ সালে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, প্রথম সংস্করণ নয়।[৩] আজ পর্যন্ত অন্তত এর আগেকার ছাপা ভারতীয় অক্ষরে আর কোনো মুদ্রিত গ্রন্থের নিদর্শন অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় নি। উল্লেখযোগ্য হল, ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বই ক্রীস্ট্য বন্নকনম্ এবং রোমান হরফে বাংলাভাষার প্রথম মুদ্রিত বই কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ, দু'খানিই খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত বই, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অনুবাদ ও রচনা করা। মধ্যযুগে, হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির আমলে, ধর্মই ছিল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। আধুনিক মুদ্রণযুগের আদিপর্বে দেখা যায়, মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে মুদ্রিত গ্রন্থের চরিত্র রাতারাতি বদলায় নি। পাণ্ডুলিপির যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই ছাপাখানার প্রসার হয়েছে ধীরেসুস্থে। তার কারণ, ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বা মুদ্রিত বই প্রচারিত হবার ফলে, কোনো দেশের পাঠকগোষ্ঠী নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হঠাৎ গড়ে ওঠে নি। ছাপাখানার প্রথমযুগে ইয়োরোপেও ধর্মগ্রন্থের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই প্রথমযুগের মুদ্রকরা ধর্মগ্রন্থই বেশি ছেপেছেন। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, হবার কোনো কারণও ছিল না। কেবল ইয়োরোপের সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তন হয়েছিল বলে, ইয়োরোপবাসীর খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থই ছিল এদেশের সর্বাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ। ছাপাখানার আদিপর্বে, মুসলমান আমলে ইসলাম-ধর্মীরা যদি ছাপাখানার প্রবর্তন করতেন, তাহলে ইসলামধর্মই হত এদেশের প্রথমযুগের মুদ্রিত গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু।

বাংলা বর্ণমালার প্রথম মুদ্রিত রূপ দেখা যায় হলহেডের (Halhed) *A Grammar of the Bengal Language* নামক গ্রন্থে। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড রচিত এই

২ উক্ত গ্রন্থে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবেশক' দ্রষ্টব্য।

৩ *A Brief Note on Early Printing in India*, **The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing, National Library, Calcutta, 1955**

গ্রন্থ ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইংরেজিতে লেখা এই ব্যাকরণের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অংশ-বিশেষ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়। বাংলা দেশের হুগলী শহরে, ছেনিকাটা বাংলা হরফে (কাঠের অক্ষরে নয়), এ্যানড্রুজের ছাপাখানায় বইখানি ছাপা হয়। বাংলা দেশে মুদ্রণযুগের প্রবর্তন হয় ১৭৭৮ সাল থেকে। অবশ্য হলহেডের ব্যাকরণেই যদি সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়ে থাকে, তাহলে একথা সত্য। পরে যদি আরও প্রাচীন কোনো বই পাওয়া যায়, তাহলে এ সত্য মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

হলহেডের ব্যাকরণ-মুদ্রণের একটু ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিদেশীরা এদেশের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনবোধ করেন। ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগের জন্য নয়, শাসনকার্যের প্রয়োজনের জন্য। হলহেড সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষায় এই বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। রচনার পর মুদ্রণের সমস্যা দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্য থেকে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাই বা ছাপা হবে কোথায়? তখনও মুদ্রণোপযোগী বাংলা হরফ তৈরি হয় নি এবং তাতে কোনো বইও ছাপা হয় নি। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন গবর্ণর-জেনারেল। এর আগে বিলেতে উইলিয়ম বোল্ট্‌স এক সেট্ বাংলা মুদ্রণহরফ তৈরি করাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং হলহেডের ব্যাকরণ ছাপানো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তখন চার্লস উইলকিন্স নামে কোম্পানীর একজন বিদ্যোৎসাহী সিভিলিয়ানকে ওয়ারেন হেস্টিংস অনুরোধ করেন, বাংলা হরফের ছেনি কেটে দিতে। উইলকিন্স এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিদ্যাচর্চায় তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগও ছিল। আগেই তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা হরফের দু'একটি ছেনি তৈরি করেছিলেন। হল হেডের সঙ্গেও উইলকিন্সের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি সাগ্রহে সম্মত হলেন। ছেনি কাটা, ঢালাই করা, ছাপা, সব তিনি নিজের হাতেই প্রথম করেন। বাংলা ছাপার হরফ প্রথমে এইভাবেই তৈরি হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা দেশের ক্যাক্সটন বলা যায়।

বাংলা দেশের এই ইংরেজ ক্যাক্সটনের সহকারী একজন বাঙালী ক্যাক্সটন ছিলেন, তাঁর নাম পঞ্চানন কর্মকার। প্রথম থেকেই বাংলা ছাপার হরফ তৈরির কাজে তিনি উইলকিন্সের সহযোগী ছিলেন। উইলকিন্স তাঁকে সযত্নে অক্ষরের ছেনিকাটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাংলার কর্মকারদের লৌহকর্মে আশ্চর্য কুশলতার কথা মনে করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, অক্ষরের ছেনিকাটা শিখতে পঞ্চাননকে খুব কষ্ট করতে হয় নি। তিনি বাংলা অক্ষরের ছেনিকাটায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে, পরে নিজে একটা আলাদা

সেট অক্ষর তৈরিও করেছিলেন। হলহেডের ব্যাকরণ যে বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়েছিল, তার চেয়ে পঞ্চাননের হাতে তৈরি বাংলা অক্ষরগুলি আরও বেশি সুন্দর হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে এই অক্ষরে কর্ণওয়ালিসের কোড ছাপা হয়। প্রধানত পঞ্চানন কর্মকারের চেষ্টাতেই মুদ্রণহরফ নির্মাণ একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী শিল্পে (টাইপ ফাউণ্ড্রি) পরিণত হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পঞ্চাননের তৈরি অক্ষরের ছাঁদেই বাংলা মুদ্রণহরফ তৈরি হয়েছে।[৪]

ব্যাকরণ ও আইন-কানুনের অনুবাদগ্রন্থ ছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দু'খানি অভিধান। প্রথমটি হল, আপজনকৃত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'। কলকাতার 'দি ক্রনিকেল প্রেস' থেকে ১৭৯৩ সালে এই অভিধান প্রকাশিত হয়।* দ্বিতীয়টি হল, হেনরী ফরস্টারের *A Vocabulary in two parts, English and Bangalee, and vice versa* নামক অভিধান। এই অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড—১৮০২ সালে।

ভারতীয় অক্ষরে প্রথম বই ছাপা হয় খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে, তার নাম ক্রীস্ট্য বন্নকনম্। এ বই ভারতবর্ষেই ছাপা হয়। বাংলাভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় রোমান হরফে, নাম কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ। পর্তুগালের লিসবন শহরে ছাপা হয়। বাংলা দেশে প্রথম বাংলা অক্ষর ছাপা হয় ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থে। তারপর আইন-কানুনের অনুবাদ ও অভিধান। তারপরে ছাপা হয় বাংলা খ্রীস্টধর্মের বই। বাংলা মুদ্রিত অক্ষর প্রথমে ব্যাকরণ, আইন-কানুন ও অভিধানেই ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনভাবে যদি বাংলা ছাপাখানার সূত্রপাত হত, তাহলে হয়ত ভগবদ্গীতা ও কোরআনের বাংলা অক্ষরে মুদ্রণ, অথবা বাংলা অনুবাদ মুদ্রণ থেকেই আরম্ভ হত, ইয়োরোপে যেমন বাইবেল মুদ্রণ থেকে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশে তার ব্যতিক্রম হয়েছে পরাধীনতার জন্য।

৪ সজনীকান্ত দাস : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২২-২৬ পৃষ্ঠা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, সম্পাদকীয়—'বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা', ৭৬৬-৭৪৩ পৃষ্ঠা।

Early Bengali Printing on Papar, by S. C. Guha : Memoirs of the Madras Library Association, 1941, 44-47.

The three first type-printed Bengali Books, H. Hosten : Bengal Past and Present. July-Dec. 1914.

* ৮নং লালবাজারে আপজন্ সাহেবের 'দি ক্রনিকেল' প্রেস ছিল এবং এই প্রেস থেকে 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল' পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় আপজন্ সাহেবের অভিধানের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। আপজন্ সাহেব প্রাচীন কলকাতার একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।

বিদেশী শাসকদের নিজেদের শাসনকার্যের স্বার্থে ব্যাকরণ, আইন-কানুন ও অভিধানের প্রয়োজন হয়েছে বেশি। ইংরেজরা এদেশে পাদ্রির বেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেন নি। তাই খ্রীস্টধর্মের গ্রন্থের চেয়ে ব্যাকরণ, অভিধান ও আইনগ্রন্থের প্রয়োজন তাঁদের অনেক বেশি ছিল। এই প্রয়োজনের জন্যই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মুদ্রণযুগের সূত্রপাত হয়েছে ব্যাকরণ অভিধান ও আইনের বই দিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই হল মুদ্রণযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ বা বাংলার কবিয়ালরা তখনও রাজসভায় বন্দী হয়ে আছেন, জনসভায় যাত্রাপথে ছাপাখানার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌছতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে বাংলা দেশে। ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়ম কেরীর শ্রীরামপুর পদার্পণে ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন হয়। এই দুটি ঘটনাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেসব ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এদেশে পাঠাতেন, কাজকর্মের সুবিধার জন্য তাঁদের যে সর্বাগ্রে এদেশীয় ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, তাৎকালিক গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁরই উদ্‌যোগে ১৮০০ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত-মৌলবী প্রভৃতি নিয়োগ করা হয় এবং এদেশী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ভ হয়। মুদ্রণের প্রয়োজন বাড়ে এবং তার ফলে কলকাতায় ছাপাখানারও প্রসার হয়।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য, আধুনিক মুদ্রণযুগে, আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার মুদ্রণশিল্প ও মুদ্রিত সাহিত্যের আদিপর্বের ইতিহাস প্রধানত ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের কীর্তিকাহিনীর ইতিহাস। এই মিশনারীদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন উইলিয়ম কেরী। কেবল মিশনের পক্ষ থেকে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষার জন্য নয়, নতুন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের কর্তা হিসেবেও, উইলিয়ম কেরী মুদ্রণযুগের উদ্‌যোগপর্বে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালনও করেছিলেন।[৫]

৫ উইলিয়ম কেরীর অনেক ভাল ইংরেজি জীবনচরিত আছে। বাংলায় শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'উইলিয়ম কেরী', সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ১৫, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বাংলা দেশে সর্বপ্রথম যে ব্যাপটিস্ট মিশনারী আসেন, তাঁর নাম জন টমাস। ১৭৮৩ সালে প্রথম একবার বাংলা দেশে এসে, ১৭৮৪ সালেই তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং ১৭৮৬ সালে দ্বিতীয়বার বাংলায় ফিরে আসেন। টমাসের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা এবং তার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেছিলেন। শিক্ষার জন্য তিনি একজন যোগ্য শিক্ষক সন্ধান করতে লাগলেন। এই যোগ্য শিক্ষক হলেন রামরাম বসু। মুন্‌শী রামরাম বসুর সঙ্গে টমাস মালদহ যান। পরে নবদ্বীপে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৭৯২ সালে তিনি আবার ইংলণ্ড ফিরে যান। ১৭৯৩ সালে আবার তিনি ফিরে আসেন। এইবার তাঁর সঙ্গী হয়ে আসেন উইলিয়ম কেরী। আসার পথে জাহাজেই কেরী বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন টমাসের কাছে। পরে রামরাম বসুই তাঁর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। কোম্পানীর সাহেবদের হুকুম ছিল, এই মিশনারী-দের যেন কলকাতায় কোনো মিশন প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া হয়। আশ্রয়হীন অবস্থায় কেরী সপরিবারে মুন্‌শীসহ বাংলা দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে-ঘুরে বেড়ান। কলকাতা থেকে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল থেকে নদীয়া, নদীয়া থেকে ব্যবসায়ী নীলু দত্তের মাণিকতলার বাগানবাড়ি, সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্টায় তিনি প্রায় সাত-আট মাস ধরে ভেসে বেড়ান। অবশেষে ১৭৯৪ সালে মালদহের মদনাবাটির নীলকুঠির তত্ত্বাবধা-য়কের চাকরি নিয়ে তিনি চলে যান। ইতিমধ্যে বাংলাভাষায় কেরী বেশ দক্ষতা অর্জন করেন এবং তাঁর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ছাপার ইচ্ছা হয়। ১৭৯৬ সালের মধ্যেই নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনুবাদ করা শেষ হয়ে গেল। কলকাতার মুদ্রকদের কাছে হিসেব নিয়ে তিনি জানলেন যে, ৬০০ পৃষ্ঠার অনূদিত গ্রন্থ, নতুন সেট বাংলা অক্ষর কাটিয়ে দশ-হাজার কপি ছাপতে চল্লিশহাজার টাকার (৪৩৭৫০ টাকা) বেশি খরচ পড়বে। অক্ষরের সেট ইংলণ্ড থেকে কাটিয়ে আনতে হবে। এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। ১৭৯৭ সালে তিনি খোঁজ পেলেন যে কলকাতায় দেশীয় ভাষার অক্ষরনির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মনেহয়, এই হরফনির্মাণের কারখানা হুগলীর পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর সহকারীদের সঙ্গে, কলকাতা শহরে এসে স্থাপন করেছিলেন। বাংলা টাইপ ফাউণ্ড্রির প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন কর্মকার। কেবল বাংলাভাষার নয়, পঞ্চাননের সহযোগী ও জামাই মনোহর মিস্ত্রী, অন্যান্য আরও অনেক ভারতীয় ভাষার ছাপার অক্ষরের সেট তৈরি করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে কেরীর সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের পরিচয় হয়। এইসময় ইংলণ্ড থেকে সদ্য-আগত একটি ছোট কাঠের ছাপাখানা কলকাতায় নিলামে বিক্রি হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়। নীলকর উড্‌নি সাহেব বাইবেল-প্রচারের উদ্দেশ্যে এই প্রেস ৪০ কি ৪৬ পাউণ্ড দিয়ে কিনে কেরীকে দান করেন। ১৭৯৮ সালে ছাপাখানাটি

মদনাবাটির ঘাটে এসে পৌছায়। ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে কেরী কলকাতায় আসেন টাইপের অর্ডার দেবার জন্য। এইসময় বাংলার মুদ্রণ অক্ষরের আদি-কারিগর পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এদিকে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নতুন মিশনারীরা এইসময় কলকাতায় আশ্রয় না পেয়ে ড্যানিশ-এলাকা শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য তাঁরা (ফাউণ্টেন ও ওয়ার্ড সাহেব) কেরীর কাছে যাত্রা করেন নৌকাযোগে। তাঁদের পরামর্শে কেরী ১৭৯৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, সমস্ত উপার্জিত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে, কেবল ছোট কাঠের ছাপাখানাটি সঙ্গে নিয়ে, নৌকাপথে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কেরীর আগমনের পর ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন হয় ১৮০০ সালে।

ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, কেরীর পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানার দায়িত্ব নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। ১৮ই মার্চ তারিখে (১৮০০ সাল) প্রথম শীট মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে, কলকাতা থেকে পঞ্চানন কর্মকার এসে শ্রীরামপুরের মিশন-ছাপাখানায় যোগ দিয়েছিলেন। পরে রামরাম বসুও আসেন। পঞ্চাননকে পেয়ে অক্ষরনির্মাণের দুশ্চিন্তাও তাঁর দূর হয়েছিল। কাঠের ছাপাখানায় যেদিন বাইবেলের বাংলা অনুবাদের প্রথম শীট ছাপা হয়, সেদিন পাদ্রি সাহেবরা এক নতুন স্বপ্ন দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। ছোট্ট একটি বিলেতী কাঠের ছাপাখানা, হ্যাণ্ডপ্রেস। সব কাজ হাতেই করতে হয়। তবু তাই দিয়ে কত কাজ যে করা যায়, তা পাণ্ডুলিপির যুগের লেখক ও লিপিকররা কল্পনা করতে পারতেন না। হাজার-হাজার শীট ও পৃষ্ঠা ছাপা যায়, যা লিপিকররা মাসের পর মাস মেহনৎ করেও কপি করতে পারতেন না। হাজার-হাজার পাঠকের কাছে মুদ্রিত বই পৌছে দেওয়া যায়, যা ছাপাখানার আগে কোনমতেই সম্ভব হত না। ওয়ার্ডের জার্নালে ১৮ই মার্চ তারিখে (১৮০০ সাল) লেখা আছে—'This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Mathew.' ম্যাথুর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম বাংলা মুদ্রিত পৃষ্ঠার সামনে দাঁড়িয়ে, পঞ্চানন কর্মকারের হাতে ছেনিকাটা বাংলা অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে, কেরীর দৃষ্টিপথে সেদিন বাংলাভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গ্রন্থের হাজার-হাজার মুদ্রিত পৃষ্ঠা ও তার পাঠকদের ছবি ভেসে উঠেছিল। অজ্ঞানতার তিমির ভেদ করে, রাজসভা থেকে জনসভার পথে মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের নিশ্চিত ও দ্রুত অগ্রগতির স্বপ্ন দেখে, সেদিন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না।

ছাপাখানায় পূর্ণোদ্যমে বই-ছাপার কাজ চলতে থাকে। ১৮১১ সালে লেখা ওয়ার্ডের একটি চিঠিতে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ওয়ার্ড লেখেন : 'ছোট্ট একটি ঘরে বসে আমরা লেখাপড়ার কাজ করি, আর সামনে চেয়ে দেখি মধ্যে-মধ্যে প্রেসের দিকে। প্রেসের অফিসটি প্রায় ১৭০ ফুট লম্বা একটি হলঘর। ভারতীয় কর্মচারীরা সেখানে বসে নানাভাষায় বাইবেল অনুবাদ করছেন, অথবা প্রুফ সংশোধন করছেন। প্রেসের মধ্যে বিভিন্ন টাইপ-কেসে আরবী ফার্সী নাগরী তেলুগু পাঞ্জাবী বাঙলা মারাঠী চীনা ওড়িয়া বর্মী কানাড়ী গ্রীক হিব্রু ও ইংরেজি অক্ষর সাজানো আছে। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান, সকল সম্প্রদায়ের কর্মচারী বসে কাজ করছেন - লেখা কম্পোজ করছেন, প্রুফ দেখছেন, অক্ষর ডিস্ট্রিবিউট করছেন। অফিসের বাইরে অক্ষর-নির্মাণের জায়গা, সেখানে নানারকমের সব অক্ষর তৈরি হচ্ছে। তারই পাশে কয়েকজন লোক মিলে কালী তৈরি করছে, ছাপার কালী। কাছে বেশ বড় একটি ঘেরা খোলা জায়গায় কাগজীরা কাগজ তৈরি করছে হাতে। আমাদের নিজেদের ছাপার কাগজ আমরা নিজেরাই তৈরি করতাম।' এই বর্ণনা পড়েই মিশন প্রেসের দ্রুত অগ্রগতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়। এ যেন মহাযজ্ঞের বিরাট অনুষ্ঠান। কেবল একটি বই-ছাপার ছাপাখানা নয়। ছাপাখানার সংলগ্ন ফাউণ্ড্রিতে পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর সহকারীদের নিয়ে সমস্ত ভারতীয় ভাষার ছাপার উপযোগী ছেনিকাটা হরফ তৈরি করছেন। তার পাশে কালী তৈরি হচ্ছে, ছাপার কালী। তারই কাছে, স্থানীয় কাগজীরা কাগজ তৈরি করছে হাতে। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া কি? ভিতরে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান, সকলে কম্পোজ করছেন, প্রুফ দেখছেন, অনুবাদ করছেন, কপি লিখছেন, ছাপছেন। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি ও লিপিকরের যুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগের রাজসভায় বন্দী বিদ্যার মুক্তির জন্য, এ যেন এক বৈপ্লবিক অভিযানের প্রস্তুতি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য কেরী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে মুদ্রণাভিযান আরম্ভ করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য হলেও, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কর্মক্ষেত্র হল ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ১৮০১ সালে কেরী এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রধানত তাঁরই সুপারিশে তাঁর অধীনে বাংলা বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কেরী নিজে এবং কলেজ-কর্তৃপক্ষও এইসময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ অভাব বোধ করতে লাগলেন। দেশীয়পণ্ডিতদের পুস্তক-রচনায় উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হল

Resolved that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native Languages. —Home Dept. Misc. 559, 6.

তখন বই-ছাপাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ছাপার উপযুক্ত ছাপাখানাও বেশি ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের বিবিধ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য, বাংলা ছাপার হরফ ও ছাপাখানার উন্নতি ও দ্রুত প্রসার হতে থাকে কলকাতা শহরে। কলেজের কর্তৃপক্ষ মুদ্রণের ব্যয়-পূরণের জন্য প্রত্যেক মুদ্রিত বই কলেজ-লাইব্রেরীর জন্য অনেকগুলি কপি কিনে নিতেন। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, প্রয়োজনে ও উৎসাহে, মুদ্রণযুগের বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর বিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee* (১৮৩৪) অভিধানের ভূমিকায় যা লেখেন, তা বিশেষ উল্লেখ্য

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta; a number of Books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works.

উইলিয়ম কেরী ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই-সময়ের মধ্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, এবং সংস্কৃত মারাঠী ওড়িয়া অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় ব্যাকরণ অভিধানাদিও প্রকাশিত হয়েছিল।[৬]

হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল-সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি ইত্যাদি শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও ১৮১৭-১৮ সালের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষার এই প্রসারের

৬ *The Life and Achievement of William Carey*, The Carey Exhibition etc, National Library.

তাগিদেই বাংলা ছাপাখানার এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছিল কলকাতায়। রামমোহন রায় এইসময় থেকেই তাঁর নবযুগের আদর্শসংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, প্রধানত মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যে। একথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেকালের সংবাদপত্রের এইসব সংবাদের তাৎপর্য তাই

> নূতন পুস্তক।—শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অথর্ববেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন। (সমাচার দর্পণ, ২৭ মার্চ, ১৮১৯)
>
> নূতন পুস্তক।—সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক। (সমাচার দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮১৯)

নবযুগের বাংলার সামাজিক সংগ্রাম প্রধানত মুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রাম। হাতেলেখা পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগের অশিক্ষার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রামমোহন-ইয়ং-বেঙ্গল-বিদ্যাসাগরের যুগের প্রগতিশীল সংগ্রামের ইতিহাসকে এককথায় মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিবৃত্ত বলা যায়। Pen is mighter than the Sword—একথা পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগের কথা নয়, প্রিন্টিং প্রেস বা ছাপাখানার যুগের কথা, মুদ্রিত গ্রন্থযুগের কথা। লিপিকরের হাতের কলম তার হাতের চেয়েও দুর্বল, কিন্তু মুদ্রণযুগের লেখকের কলম শাণিত তলোয়ারের চেয়েও ধারাল ও শক্তিশালী। মুদ্রিত গ্রন্থ গোলাবারুদের মতো মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকার দুর্গ ভেদ করে জ্ঞানের আলোকরাজ্যে অভিযান করেছে। বাংলা দেশে যখন এই অভিযান শুরু হয়েছে, তখন অর্ধস্ফুট বাংলা-ভাষায় সমসাময়িক সংবাদপত্রে সেই অভিযানকে এইভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে

> যে দেশে ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্বকালে কতক ২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য ২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।
>
> গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক একস্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে। (সমাচার দর্পণ, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯)
>
> এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যে হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি

পাইয়া সর্বদেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্বরা করে সেই মতো ছাপার পুস্তক ক্রমে ২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বর্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে। (সমাচার দর্পণ, ৩ এপ্রিল, ১৮১৯)

মুদ্রণযুগের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা সবই প্রায় এর মধ্যে বলা হয়েছে। ভাষা অস্পষ্ট হলেও, বক্তব্য খুব স্পষ্ট। 'যেদেশের ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সেদেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না।' সভ্যতার ইতিহাসকে আজও ঐতিহাসিকরা মুদ্রণযুগ ও মুদ্রণপূর্বযুগ, এই দুই পর্বে ভাগ করতে পারেন। মধ্যযুগ থেকে প্রাগৈতিহাসিকযুগ পর্যন্ত ইতিহাস মুদ্রণপূর্বযুগের সভ্যতার ইতিহাস, আর মধ্যযুগের পরবর্তী আধুনিকযুগের ইতিহাস মুদ্রণযুগের ইতিহাস। 'পূর্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত।' পুথিপাণ্ডুলিপির যুগের একথা ঐতিহাসিক সত্য। তখন 'অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত।' কিন্তু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর এদেশে যখন বই ছাপা আরম্ভ হয়েছে তখন 'ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট-বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।' এই যে ছোট-বড় সকল ঘরে 'ব্যাপ্ত' হওয়া, এইটাই মুদ্রণযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হাজার-হাজার বই ছাপা হচ্ছে। সব বই একস্থানে থাকছে না, 'নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে।' তার ফলে কি হচ্ছে? 'যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের' ইচ্ছা হচ্ছে এবং তারই ফলে 'এদেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে।' ছাপা বইয়ের গতি ঠিক নদীর স্রোতের মতো—'ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায়।' নদী ক্ষুদ্র হলেও যেমন কুল্-কুল্ করে প্রবাহিত হয়ে সবদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই দেশের মাটিকে উর্বর করে, ছাপা বইও ঠিক তাই করে। সামান্য একটি ছোট ছাপা বই হাজার মানুষের পাঠ্য হতে পারে এবং শতসহস্র মানুষের মনে জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে। পতিত মানব-জমিনে আবাদ করলে যে কত সোনা ফলতে পারে, মুদ্রণযুগের আগে মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি।

১৮১৯ সালে, 'সমাচার দর্পণে'র সংবাদে প্রকাশ, 'গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে।' আন্দাজের কিছুটা বাহুল্য হলেও বাংলা দেশের ছাপাখানার আদিপর্বের এই কীর্তি সামান্য নয়। দশ বছরে দশহাজার বই অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে একহাজার করে বই ছাপা হয়েছে। কত কপি করে প্রত্যেক বই ছাপা হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায় না। কয়েকশো কপি করে ছাপা হলেও, ১৮১৯-২০ সালের মধ্যে কয়েক লক্ষ কপি মুদ্রিত বই বাংলা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজসভায় নয়

বা পণ্ডিত-পুরোহিতদের মধ্যে নয়, সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজসভার বাংলা সাহিত্যের যুগ যে অস্তাচলে গেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই! বাংলা সাহিত্য জনসভামুখী হয়েছে। লক্ষ-লক্ষ মুদ্রিত গ্রন্থ বীর যোদ্ধার মতো মধ্যযুগের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলা দেশে নবযুগের প্রবর্তন করেছে। রিনেস্যান্স বা নবজাগরণের যুগ এসেছে মুদ্রিত গ্রন্থের অভিযানে। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে কেবল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে দু'লক্ষ বারো হাজার ভল্যুম বই ছাপা হয়েছে, চল্লিশটি ভাষায়। অধিকাংশ ভাষার মুদ্রণহরফ প্রথম তৈরি করে ছাপা হয়েছে। কেন ভারতের মধ্যে বাংলা দেশ নবযুগের নবজাগরণের মহাকেন্দ্ররূপে গণ্য হয়ে থাকে, তা কেবল শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসের এই বিস্ময়কর কীর্তির কথা ভাবলেই বোঝা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, ১৮২৫-২৬ সালের মধ্যে, কলকাতা শহরের যে সব ছাপাখানা থেকে বইপত্র নিয়মিত ছাপা হচ্ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়
বহুবাজারের শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানা
আড়পুলির শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেস
মীরজাপুরের সম্বাদতিমিরনাশক প্রেস
মীরজাপুরের মুন্শী হেদাতুল্লার ছাপাখানা
শাঁখারিটোলার মহেন্দ্রলালের ছাপাখানা
শাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেস
শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস
ইটালীর পিয়ার্স সাহেবের প্রেস
সমশুল আখবার প্রেস
কালেজ প্রেস

(১৮২৫-২৬ সালের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে সংকলিত)

কলকাতা শহরের (তখনকার) আশেপাশেও কয়েকটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন, 'শুঁড়া লিথোগ্রাফিক প্রেস'। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ছাড়াও, নীলমণি হালদারের ছাপাখানা থেকে অনেক বই ছাপা হত। বাংলার নবজাগরণের অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হয় এইসব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায়। একদিকে ধর্মসভার সংগঠকরা এবং আর একদিকে রাম-মোহন রায় ও হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ, ইয়ং ক্যালকাটা বা ইয়ং বেঙ্গল দল এই আন্দোলন শুরু করেন, প্রধানত এইসব ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত বই পত্র-পত্রিকা দিয়ে। উভয়দলের নেতারা মধ্যে-মধ্যে বইপত্র ছেপে বিনামূল্যেও বিতরণ করেছেন।

মুদ্রণযুগের প্রথম পর্বে ইয়োরোপে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে বই ছাপা হত, কারণ মুদ্রণ তখন রীতিমত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। মুদ্রিত বইয়ের পাঠকগোষ্ঠী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীরও তখন তেমন বিকাশ হয় নি। বাংলা দেশের মুদ্রকরাও তাই করেছেন। আগে বিজ্ঞাপন দিয়ে বই-ছাপার জন্য তাঁরা অগ্রিম টাকা সংগ্রহ করেছেন, তারপর বই ছেপে প্রকাশ করেছেন। মুদ্রণযুগের আদিপর্বে এইভাবে সীমাবদ্ধ সাবস্ক্রাইবারগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ আর্থিক পোষকতার প্রয়োজন হয়েছে। তার ফলেই মুদ্রণের প্রসার এবং মুদ্রিত বইয়ের প্রচার, দুই-ই সম্ভব হয়েছে। এর দু'একটি দৃষ্টান্ত সেকালের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত করছি[৭]

ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান। শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিংবা মোকাম লালবাজারে থ্যাকার সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক। – সমাচার দর্পণ, ৩১ মার্চ ১৮২১।

কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থে ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ ইইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক. উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতি পুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।…শ্রীকাশীনাথ শর্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

৭ সংবাদগুলি অধিকাংশই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড থেকে সংকলিত।

এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান। —সমাচার দর্পণ, ২ জুন, ১৮২১।

রামকমল সেনের অভিধানের জন্য অগ্রিম অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি খুব সহজ। কিন্তু দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতা শ্রীকাশীনাথ শর্মণের পদ্ধতিটি অভিনব। তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মুদ্রক-প্রকাশক। পরিষ্কার ভাষায় তিনি ক্রেতা-পাঠকদের জানিয়েছেন যে ব্যাকরণ রচয়িতা যিনি তিনি—'তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকরার্থে ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন।' পুস্তকখানি মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেই তিনি নিশ্চিন্ত হন নি। 'বহু প্ররিশ্রমে' দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ও রাম তর্কবাগীশের টীকানুসারে 'মূল ও ভাষার্থ' শুদ্ধ ও পরিবর্ধিত করে তিনি ছাপার জন্য প্রস্তুত করেছেন। 'যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান' এবং তাঁর বই ছাপা হলে 'অনেকের উপকার হইবেক'—একথা জানিয়েও তিনি বলেছেন—'ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।' ছাপাকর্ম যে সহজ কর্ম ছিল না, একথা কাশীনাথ শর্মার এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়। ১৮২৭ সালের ১৭ মার্চ কলকাতার আমড়াতলা গলির জনৈক বেণীমাধব দত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাপার সংকল্প করে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে জানাচ্ছেন—যে 'গ্রন্থের পরিমাণ ৮৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক একারণ মুদ্রাঙ্কিত করণে ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া পুতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে—'। বেণীমাধবের মতো তখন অনেকেই এইভাবে সাবস্ক্রাইবার সংগ্রহ করে বই প্রকাশ করতেন।

বাংলা বইয়ের প্রকাশক ও বিক্রেতা। মুদ্রিত বাংলা বইয়ের আদিপর্বের প্রকাশকরা অধিকাংশই মুদ্রকও ছিলেন। মুদ্রক ও প্রকাশকের মধ্যে ব্যবধান তখনও রচিত হয় নি। ইয়োরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। প্রথমযুগের বাঙালী মুদ্রক-প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় গঙ্গাকিশোরের। একদিক দিয়ে বিচার করলে উইলকিন্সকে যেমন আমাদের দেশের ক্যাক্সটন বলা যায়, তেমনি অন্যদিক দিয়ে বিচার করে গঙ্গাকিশোরকেও বাংলার ক্যাক্সটন বললে ভুল হয় না। ইংলণ্ডের আদি মুদ্রক-প্রকাশকরূপে (কেবল হরফ-নির্মাতারূপে নয়) ক্যাক্সটন যেমন অমর হয়ে আছেন, বাংলা দেশের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তেমনি বাংলা বইয়ের আদি-মুদ্রক-প্রকাশকরূপে ঐতিহাসিক সম্মান দাবী করতে পারেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের বিশাল বাঙালী পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ক'জন পঞ্চানন কর্মকার ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কথা জানেন?

মুদ্রণযুগের মহাতীর্থ শ্রীরামপুরের কাছে বহরা গ্রামে ছিল গঙ্গাকিশোরের বাড়ি। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় তিনি কম্পোজিটরের কাজে নিযুক্ত হন এবং সেই সুযোগে

ছাপাখানার সমস্ত কাজকর্ম শেখেন। কিছুদিন পরে তাঁর স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ইচ্ছা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি কলকাতা শহরে এসে বই-প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। স্বাধীন ব্যবসা হিসেবে বইয়ের ব্যবসা যে করা যায়, তা বোধহয় গঙ্গাকিশোরের আগে আর কোনো বাঙ্গালী ভাবে নি। বাংলা বই তার আগে ছাপা হয়েছে ধর্ম প্রচার ও স্কুলপাঠ্যরূপে। স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরূপে কেউ তা ছেপে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেন নি। প্রথম গঙ্গাকিশোরই এই ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক। এদিক দিয়ে তাঁকে বাঙ্গালী প্রকাশকদের ও পুস্তক-বিক্রেতাদের আদিগুরু বলা যায়। ১৮২০ সালে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লেখা হয়

> ...Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop . He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from when his books were purchased with great avidity... (*On the effect of the Native Press in India*, 134-35)

বই-প্রকাশ করে যে স্বাধীন বাণিজ্যের মতো অর্থ উপার্জন করা যায়, এ-বিষয়ে গঙ্গাকিশোরই প্রথম চিন্তা করেছিলেন। তিনি ইয়োরোপীয়দের ছাপাখানা থেকে বাংলা বই ছেপে বিক্রি করতেন। বিক্রির জন্য একটি 'বুকশপ্'ও তিনি খুলেছিলেন। কলকাতা শহরে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বইয়ের দোকান বলে মনে হয়। কেবল বইয়ের দোকান খুলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন নি। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে তিনি এজেণ্ট নিয়োগ করে পাঠাতেন বই বিক্রির জন্য। কলকাতা শহরে তখন বাংলা বই ছাপা হত প্রধানত ফেরিস এ্যাণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রালয়, লালবাজারের হিন্দুস্থানী প্রেস, লল্লুলালের সংস্কৃত যন্ত্র, বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র, অথবা শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে। যতদূর জানা গেছে, তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হন নি। কিছুকাল অন্য প্রেস থেকে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করে, বইয়ের ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে, গঙ্গাকিশোর একটি বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌যোগী হন। তাঁর এই

ছাপাখানাটির নাম বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস। এই প্রেসই বোধহয় বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত বাংলা দেশের প্রথম ছাপাখানা। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৮ সালের পরে নয়।

কেবল মুদ্রক-প্রকাশক নন, ক্যাক্সটনের মতো গঙ্গাকিশোরও নিজে লেখক ছিলেন। তিনি বাংলাভাষায় একখানি ইংরেজি ব্যাকরণ (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৭), দ্রব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসার্ণব (১৮২০?) প্রভৃতি গ্রন্থ নিজে রচনা করে প্রকাশ করেন। স্বরচিত গ্রন্থ ছাড়া, কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ তিনি ছেপে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৬ সালে তিনি ছ'খানি চিত্রসহ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ফেরিস এ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ এর আগে আর প্রকাশিত হয় নি বলে মনেহয়। গঙ্গাকিশোরই প্রথম অন্নদামঙ্গল ছেপে প্রকাশ করেন। সচিত্র মুদ্রিত বাংলা বইও এই প্রথম প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী', 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' এবং লল্লুলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের কোনো কোনো বই ছেপে প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তির সহযোগে তিনি 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানিই বোধহয় বাঙালী প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

ব্যবসায়ের জন্য স্বাধীনভাবে প্রথম বাংলা বই প্রকাশ করা, বই বিক্রির জন্য প্রথম বইয়ের দোকান করা, বাঙালী হয়ে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা, বাঙালীর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রথম বিক্রির জন্য ছাপা, প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই চিত্রিত করা -এতগুলি কাজ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্‌যোগী হয়ে করেছিলেন। বাংলার রিনেস্‌ন্সি আন্দোলনে বাংলা ছাপাখানার ও বাংলা বইয়ের যদি কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে, তাহলে গঙ্গাকিশোরই সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সর্বপ্রথম তাকে সার্থক করার চেষ্টা করেন। গঙ্গাকিশোরের পরে এই পুস্তকব্যবসায়ের কাজে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন বাঙালীদের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে বহুনিন্দিত বটতলার প্রকাশকরা উল্লেখযোগ্য।[৮] বাঙালী হিন্দু-মুসলমান মুদ্রক প্রকাশক, যাঁরা বটতলার প্রকাশক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেকালে, তাঁরা পরবর্তীকালে যেকারণে যতই নিন্দিত ও উপেক্ষিত হন না কেন, বাংলা বইয়ের মুদ্রণ প্রকাশন ও প্রচারকার্যে তাঁরা যে সাহস ও শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তা অবজ্ঞার বিষয় নয়।

৮ বিনয় ঘোষ : কলকাতা কালচার 'বটতলার সাহিত্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বাংলা বইয়ের দোকান ও বিক্রয়ব্যবস্থা। গঙ্গাকিশোর একটি বইয়ের দোকান খুলেছিলেন বলে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বইয়ের দোকান বলতে আজকাল যা বোঝায়, সেরকম কোনো বইয়ের দোকান তিনি খুলেছিলেন কি-না, সঠিক বলা যায় না। মনেহয়, তাঁর ছাপাখানাই বইবিক্রয়ের কেন্দ্র ছিল এবং তাকেই বইয়ের দোকান বলা হত। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' একথাও বলেছেন যে তিনি এজেণ্ট নিয়োগ করে বাইরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। বটতলার প্রকাশকরাও তাই করতেন। মুদ্রণযুগের প্রথম পর্বে ইয়োরোপেও ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালারা বই নিয়ে মেলায়-মেলায় বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াতেন। বাংলা বইয়ের প্রথমযুগের মুদ্রক-প্রকাশকরাও এইভাবে বই-প্রচারের ও বিক্রির ব্যবস্থা করতেন, এজেণ্ট বা ফিরিওয়ালা নিয়োগ করে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন[৯]

> তখন পুস্তকের ফেরিওয়ালা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেমবিলাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ, হিন্দু-মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার প্রভৃতি ক্রয় করিত। বটতলা ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই একখানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওলাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করিতাম। তাহারা আমায় কিছু বলিত না, আমি যে একজন বাঁধা খরিদ্দার। এমন খরিদ্দার চটাইবে কেন? (পিতা-পুত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার: বোল্ড টাইপ লেখকের।)

অক্ষয়চন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কথা বলেছেন। বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থই যে তখনও বেশি বিক্রি হত বাইরে, একথাও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রধানত তাঁরাই এজেণ্ট পাঠিয়ে বাইরে বই বিক্রি করতেন। মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের প্রসারে ও প্রচারে বটতলার প্রকাশকদের এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

বাংলা বইয়ের দোকান বটতলার প্রকাশকরাই যে প্রথম খুলেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আসলে বাংলা বইয়ের দোকান তখন বিশেষ ছিলই না, কারণ দোকান সাজিয়ে বই বিক্রি করবার মতো মুদ্রিত বাংলা বই তখন খুব বেশি ছিল না। বই প্রথমে বিক্রি হত মুদ্রক-প্রকাশকদের ছাপাখানা থেকে, অথবা তাঁদের কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি বা সভাসমিতির আফিস থেকে, এবং যাঁর দরকার হত তিনি সেখান থেকে

৯ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত 'পিতাপুত্র' দ্রষ্টব্য।

হদিশ করে কিনে আনতেন। বই ছাপিয়ে মুদ্রক-প্রকাশকরা এইভাবে বিজ্ঞাপনও দিতেন কাগজে। দু'একটি এইধরনের বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৮১৮ সালে পীতাম্বর শর্মা ৪৯২ পৃষ্ঠার এক অভিধান ছাপিয়ে 'সমাচার দর্পণ' (২৫ জুলাই, ১৮:৮) পত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে—'চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।' এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়, বড় বইও তখন ৫০০ কপির সংস্করণ ছাপা হত। ১৮১৮ সালে ইংরেজি বর্ণমালা একখানি, অর্থ ও উচ্চারণসহ, বাংলায় তর্জমা করে ছাপা হয়—'কেতাব চামড়া বন্ধ জেল্‌দ করা' এবং মূল্য 'ফি কেতাব ৩ টাকা।' বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—'যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারী বাটীর নিকট শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।' এরকম বহু বইয়ের বিজ্ঞাপন তখনকার ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। দোকান খুলে বাংলা বই বিক্রির যে ব্যবসা করা যেতে পারে তা বাঙালীদের অন্তত তখনও খেয়াল হয় নি।

বিদেশী বা ইংরেজি বই বিক্রির দোকান কয়েকটি ছিল কলকাতা শহরে। এইসব বইয়ের দোকান প্রধানত চীনাবাজারেই ছিল। চীনাবাজারের বইয়ের দোকানের কথা শুনে অনেকেই হয়ত অবাক হবেন, কিন্তু এক শতাব্দী আগেকার কলকাতা শহরে বই-বিক্রির প্রধান কেন্দ্র ছিল চীনাবাজার। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এ-সম্বন্ধে চমৎকার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের কথা। তিনি চীনাবাজারের বইয়ের দোকান সম্বন্ধে লিখেছেন[১০]

> Bookshops have attractions all there own, even in the China Bazaar, this truth is very evident The stock of books in some of these native shops is heavy... Shakespeare, Addision, Burns, Chalmers, Scott, Marryatr, indeed almost every author of note with general readers, has a place on the shelves of the bazaar bookseller.

১০ *Sketches of Calcutta,* or *Notes, of a Late Sojourn in the City of Palaces,* By a Griffin, Glasgow, 1843, pp. 103-4

চীনাবাজারের অনেক দোকান এদেশী লোকের দোকান ছিল। নানারকমের পণ্যদ্রব্যের দোকানের মধ্যে বইয়ের দোকানও ছিল যথেষ্ট। বই কিনতে হলে চীনাবাজারেই যেতে হত। চীনাবাজারে বই-কেনা সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 'ভূদেব চরিতে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি [১১]

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন সময়ে ভূদেববাবুর একখানি ইংরাজি অভিধানের প্রয়োজন হয়। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা হইতে সংগৃহীত দুই টাকা দশ আনা লইয়া চীনাবাজারে গমন করেন। তথায় মধুসূদন দে নামক এক ব্যক্তির পুস্তকের দোকান ছিল। সেই দোকানে একখানি 'জন্‌সনের ডিক্সনারী' দেখিয়া সেই খানিই ক্রয় করিতে মনন করিলেন ; কিন্তু মূল্য জিজ্ঞাসা করায় মধু দে বলিলেন, 'চারি টাকা'। ভূদেববাবু বলিলেন, 'আমার কাছে, দুই টাকা দশ আনা মাত্র আছে, উহা লইয়া পুস্তকখানি আমাকে দাও।' মধু দে বলিলেন, 'চারি টাকাতে বেচিলেও আমার লাভ অল্পই থাকে ; এরূপ স্থলে দুই টাকা দশ আনাতে কেমন করিয়া দিব ?' ভূদেববাবু তখন অন্যান্য দোকানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ পুস্তক আর কোথাও পাইলেন না। রৌদ্রে হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। পুনরায় মধু দের দোকানের নিকট আসায় মধু দে বলিলেন, 'কেন এত কষ্ট পাইতেছ, আমি উহা অপেক্ষা একখানি অল্প দামের অভিধান দিতেছি, লইয়া যাও।' ভূদেববাবু বলিলেন, 'ঐ খানিতে সকল কথার মানে পাওয়া যাইবে ; ছোট অভিধান হইলে হইবে না। ঐ খানিই আমাকে দুইটাকা দশ আনাতে দাও।' মধু দে বালকের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সন্তান জানিয়া বলিলেন, 'তোমার পড়া শুনায় বড় আঁট দেখিতেছি ; আচ্ছা, বই খানি আমি তোমাকে অমনি দিতেছি, লইয়া যাও।' ভূদেববাবু বলিলেন, 'আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা আমি দিতেছি, বাকী আমি যাহা দিয়া উঠিতে পারিলাম না সেই অংশটাই তোমার দান হইবে।' মধুসূদন দের মন প্রকৃত পক্ষেই উদার ছিল তিনি স্বীকৃত হইয়া ভূদেববাবুর নিকট হইতে ঐ মূল্য লইয়া পুস্তকখানি তাঁহাকে দিলেন এবং স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, 'তোমার যেরূপ পড়াশুনায় মন দেখিতেছি তাহাতে তোমার হাতে আমার বই নষ্ট হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার দোকানে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই অনেক আছে ; এক একবারে চারি পাঁচখানি করিয়া বই তোমাকে দিব, তুমি পড়িয়া আমায় ফেরত দিও।...

১১ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব-চরিত, ১ম ভাগ, ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা।

চীনাবাজারের এই মধুসূদন দে-র দোকান থেকে অনেকদিন ধরে অনেক বই নিয়ে ভূদেববাবু পড়েছেন। মহানুভবতা তখনও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল এবং বই-ব্যবসায়ীদেরও ছিল, এমনকি চীনাবাজারেও। ভূদেববাবুর অভিজ্ঞতা থেকে আরও একটি কথা জানা যায়, বাঙালী বইবিক্রেতারা তখন নতুন ও পুরাতন বই, দুই-ই বিক্রি করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অথবা সফিউদ্দিনের মতো বটতলার উদ্‌যোগী প্রকাশকরা ছাড়া, বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ে আর কেউ সে-সময় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন কি-না জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাখানা, বইপ্রকাশ ও বই-বিক্রির স্বাধীন বাণিজ্যে বিশিষ্ট যুগনেতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টি ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে বাংলার নবজাগরণের যুগে যিনি অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন, তিনি যে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের পন্থাস্বরূপ ছাপাখানা ও বই-ছাপার কাজ বেছে নিয়েছিলেন এবং তার জন্য প্রেস ও বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতেই বোঝা যায়, নবযুগের মুদ্রক-প্রকাশকদের কতখানি দায়িত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসও তিনকতক ব্যবসা করেছিলেন, কিন্তু ছাপাখানার বা বইয়ের ব্যবসা নয়। স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর কর্মজীবনের গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন যে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে পরের অধীনে চাকুরী করা বর্তমান সমাজে কত কঠিন। তাই তিনি ব্যবসায়ের কথা ভেবেছিলেন এবং এমন এক ব্যবসায়ের কথা, যা তাঁর কর্মজীবনের মহান আদর্শের পরিপন্থী নয়। ১৮৪৭ সালে তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকুরী ছেড়ে দেন, তখন কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত একজনকে বলেন, 'বিদ্যাসাগর খাবে কি করে?' বিদ্যাসাগর এই কথা শুনে বলেছিলেন, 'বোলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।' আলু-পটল বেচে তিনি খান নি, প্রেসে বই ছেপে, তাই বেচে খেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে কাজ করার সময় তিনি ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেস কেনার মতো টাকা তাঁদের দু'জনের কারও ছিল না। বিদ্যাসাগর তাঁর এক বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬০০ টাকা ঋণ করে প্রেসটি কেনেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তিনি যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন মার্শাল সাহেব সেই কথা জানতে পেরে তাঁকে বলেন যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি ভাল সংস্করণ যদি তিনি উত্তম কাগজে সুন্দরভাবে ছেপে প্রকাশ করেন, তাহলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য তিনি ১০০ কপি কিনে নিয়ে প্রেসের ৬০০ টাকা ঋণ

শোধ করে দেবেন। এই আশা পেয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূল পাণ্ডুলিপি আনিয়ে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তার একশো কপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিক্রি করে বন্ধুর ঋণ পরিশোধ করেন।[১২] মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইগুলি বিক্রির জন্য তিনি 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী' নামে একটি বইয়ের দোকান স্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালী মুদ্রক-প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ। ছাপাখানা তিনি সখ করে স্থাপন করেন নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের কাজে, আধুনিকযুগে ছাপাখানার শক্তি যে কত বেশি তা বিদ্যাসাগর বুঝতেন। না বুঝলে, তাঁর অত কাজের মধ্যে তিনি ছাপাখানাটির দিকে মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাঁকে আমি কেবল প্রকাশক বা পুস্তকব্যবসায়ী বলি নি, মুদ্রকও বলেছি। তিনি মুদ্রকও ছিলেন। কোনো মুদ্রকের চেয়ে ছাপাখানার টেকনিক্যাল বিদ্যা তিনি কম আয়ত্ত করেন নি। ছাপাখানায় ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী অক্ষরের যতগুলি ঘর থাকে, বাংলায় তার ছয়-সাতগুণ বেশি ঘর থাকে, য-ফলা, র-ফলা, যুক্তাক্ষর ইত্যাদির বাহুল্যের জন্য। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকলে কম্পোজিটারের সুবিধা হয়, সে-রকম কোনো সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা তখনও বাংলা ছাপাখানায় প্রবর্তিত হয় নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বোধহয় সর্বপ্রথম, বহু চিন্তা ও পরিশ্রম করে, কম্পোজিটারের অক্ষরের-কেসে, অক্ষর সাজানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত এই অক্ষরবিন্যাস পদ্ধতিই বাংলা ছাপাখানায় দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে। তার নাম হল 'বিদ্যাসাগর সার্ট'।[১৩]

বাংলা দেশের ছাপাখানার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও যে এতখানি দান আছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সমাজ শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য দান। এত যুগান্তকারী ও মূল্যবান যে মুদ্রক-প্রকাশক-রূপে তাঁর দানের কথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি বলা চলে। কিন্তু বিস্ময়ের বা বিস্মৃতির কোনো কারণ নেই। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি আদর্শ-প্রতিমূর্তি ছিলেন, ছাপাখানা ও বইয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ গভীর যোগাযোগ আকস্মিক ঘটনা নয়, ঐতিহাসিক যুক্তিসম্মত ঘটনা। নবযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বিদ্যাসাগরের সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছাড়াও, আরও অনেকে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

১২ বিদ্যাসাগর রচিত 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৩ বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, ৩২ অধ্যায়।

(শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল) ও পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায়, বাংলার নবজাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ছাপাখানাও তাঁদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেউই ছাপাখানার সংস্রব ত্যাগ করে কিছুই করতে পারেন নি। ছাপাখানাই ছিল তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। বিরোধী পক্ষেরও তাই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতি সংগ্রামকে তাই মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সংগ্রাম বলা যায়। ছাপাখানা ও ছাপা-বইয়ের সাহায্যেই আদর্শ-সংগ্রাম সম্ভব হয়। তার আগে মধ্যযুগে কোনো 'ইডিওলজি'র সংগ্রাম বলে কিছু ছিল না। ইডিওলজির সংগ্রাম বা আদর্শের সংগ্রাম ছাপাখানার দান, নবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে প্রকাশকের দান। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যখন বাংলা সাহিত্যের একজন গণ্যমান্য প্রকাশক ছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে প্রকাশকের কোনো দান নেই, এমন কথা বলা যায় না। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকে, বই ছেপে যাঁরা প্রকাশ ও প্রচার করেছেন, তাঁদেরও প্রকাশক বলা উচিত এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁদের দানও উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও বটতলার হিন্দু-মুসলমান প্রকাশকদের মতো উদ্‌যোগী পুস্তক-ব্যবসায়ীরা মধ্যযুগের রাজসভার অচলায়তন থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করে জনসভায় নিয়ে আসতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বইয়ের দোকান থেকে, প্রকাশক ও মুদ্রকের গৃহ থেকে, অথবা ভ্রাম্যমাণ বই-ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে পাঠক-পাঠিকারা যে স্বাধীনভাবে বই কিনে পড়বার সুযোগ পেতেন, পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগে সে-রকম কোনো সুযোগ তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই সুযোগ প্রথম বাংলা দেশের প্রকাশকরাই করে দিয়েছিলেন? কিন্তু তাঁরা কারা? ইংলণ্ড বা ইয়োরোপের প্রকাশকদের মতো তাঁরা কোনো ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন কি? ডড্‌সলে বা টনসনের মতো প্রকাশক অথবা পাইরেট ড্যাণ্টারের মতো প্রকাশক, বাংলা দেশে জন্মান নি কেন? বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে লংম্যান, কনস্টেবল, মারি, চ্যাপমান ও হল্ প্রভৃতির মতো নতুন পথপ্রদর্শক প্রকাশকের আবির্ভাব হল না কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো হয়ই নি, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক পর্যন্ত, পুস্তক-ব্যবসায়ী ও প্রকাশক অনেক থাকলেও, ইয়োরোপের প্রকাশকদের সমতুল্য একজনও প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেন নি। কেন করেন নি? বাংলা দেশে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অভাব ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো যুগপ্রতিভা যে মারি বা লংম্যানের মতো প্রকাশকের অভাবে এদেশের

পাঠকদের কাছে যথাকালে যোগ্য স্বীকৃতি পান নি, একথা বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। তার ফলে সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয় নি, এমন কথা বলারও কোনো যুক্তি নেই। যুগোপযোগী যোগ্য প্রকাশকের অভাবে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, বহু সাহিত্যিক-প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়েছে এবং সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য সাহিত্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে, সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ে নি। কাব্য-কথাসাহিত্যের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ চক্রে বাংলা সাহিত্য আবর্তিত হয়েছে। তার যা কিছু সমৃদ্ধির গৌরব, তাও এই সীমাবদ্ধ চক্রের গৌরব। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এ-গৌরব স্বীকৃত হলেও, বাংলা সাহিত্য যে সেখানে কতখানি উচ্চাসন দাবী করতে পারে তা বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসে আমরা বিচার করতে পারব না।

বাংলা দেশে প্রকাশকরা যখন যুগের তাগিদে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁরা মধ্যযুগের পেট্রনের মতো পোষকতার ও দয়াদাক্ষিণ্যের মনোভাব নিয়ে এলেন, আধুনিক ধনতান্ত্রিক-যুগের 'এণ্টারপ্রেনোর' বা উদ্যোগী ব্যবসায়ীরূপে এলেন না। ব্যবসায়ীরূপেও যখন এলেন, তখন ব্যবসাটা অস্তমিত যুগের দোকানদারি হয়েই রইল, নবযুগের 'এণ্টারপ্রাইজ' হল না। এখানে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জীবন থেকে। ১৮৩৯ সালে, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ ব্যয়ে রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন।[১৪] বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর 'ক্যাপটিভ লেডী' প্রথমে জে আর নেলার নামে একজন প্রবাসী বন্ধুকে উৎসর্গ করেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনের নামে উৎসর্গপত্র লিখে দেন। পোষাক ও পোষকতার সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবনের যোগাযোগ কি-রকম, তা বুঝতে হলে বইয়ের উৎসর্গপত্র থেকে যে-রকম সাহায্য পাওয়া যায়, এ-রকম আর কিছু থেকে পাওয়া যায় না। একথা সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং সুন্দরভাবে তাঁর একখানি গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন।[১৫] মধুসূদন বন্ধুর বদলে পেট্রন নর্টনকে বই উৎসর্গ করেছিলেন, কারণ নর্টন তাঁকে নানাভাবে

১৪ 'It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersad Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expense the whole of the Bengallee writings of the Late Raja Rammohun Roy, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters.'—*The Calcutta Courier*, January 6, 1840.

১৫ Schucking : *The Sociology of Literary Taste*, Ch. 2, 8-11.

সাহায্য করেছিলেন।[১৬] মধুসূদনের সাহিত্যজীবনে পাইকপাড়ার রাজাদের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতার কথাও ভোলা যায় না। 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ, 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ও তার ইংরেজি অনুবাদ পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থেই অনূদিত, রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। পাইকপাড়ার ছোটরাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধেই তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে প্রহসন দু'খানি রচনা করেছিলেন এবং ১৮৬০ সালে রাজাদের ব্যয়ে বই দু'খানি প্রকাশিত হয়েছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে তিনি বইগুলি উৎসর্গও করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের প্রথম 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ১৮৬০ সালে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। এই পোষকতার জন্যই তিনি মহারাজাকে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র নিজহাতেলেখা পাণ্ডুলিপিখানি উপহার দেন এবং বইখানিও উৎসর্গ করেন।[১৭] বাংলা দেশে বই-প্রকাশের স্বাধীন ব্যবসার অবস্থা যে ১৮৬০-৭০ সাল পর্যন্ত কি ছিল, তা মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের এই রাজপোষকতা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সাহিত্যজীবনে কোনো ব্যবসায়ী প্রকাশকের সহযোগিতা লাভ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা' ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং তার আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল'। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নিশ্চয় লংম্যান বা চ্যাপমানের মতো কেউ ছিলেন না। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। আখ্যাপত্রে কেবল 'মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮-৫, বিদ্যারত্ন যন্ত্র'—এই খবরটুকু পাওয়া যায়, আর কিছু জানা যায় না। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেন থেকে সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে নিজ বাসভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্র নামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর বইগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন।[১৮]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের ইতিহাসেও এই ধারার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয় নি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'কবিকাহিনী'। তাঁর এক উৎসাহী বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই বই ১৮৭৮ সালে প্রকাশ করেন। এ-সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'-তে

১৬ নগেন্দ্রনাথ সোম: মধুস্মৃতি (২য় সং), ৬০-৬২ পৃষ্ঠা।

১৭ 'মধুস্মৃতি' ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধুসূদন দত্ত' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ২৩) দ্রষ্টব্য।

১৮ 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ২২) দ্রষ্টব্য।

তিনি লিখেছেন : 'এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ) এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।'

প্রথম গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত হতে হয়েছিল, ১৮৭৮ সালে। ১৯০৩-০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় (মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)। প্রকাশক এস. সি. মজুমদার, ২০নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী। ব্যবসায়ী-প্রকাশকদের মধ্যে এই মজুমদার লাইব্রেরীরই নাম পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশকরূপে। এই কাব্যগ্রন্থ যখন ছাপা হয়, তখন সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশক শৈলেশ মজুমদার প্রসঙ্গে একখানি চিঠিতে লেখেন[১৯]

> গ্রন্থাবলী কি পর্যন্ত হলো আমি তার কিছুই জানিনে। ফর্মাচারেকের ফাইল পেয়েছিলেম—তারপরে আমার বরাদ্দ বন্ধ। আমার প্রতি নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকের মত ব্যবহার করা হচ্চে—শৈলেশের কাছ থেকে কোনো খবরও পাইনে, আশাও পাইনে, প্রুফও পাইনে। যা ছাপা হচ্চে তাতে ভুলচুক আছে কিনা তাও বুঝতে পারচিনে। যে জননীর ছেলে যুদ্ধে গেছে, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাপতি মহাশয় বাড়িতে খবর পাঠান নিষেধ করেছেন, আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রগত সন্তানের (মাতার) মত বসে আছি—ছেলের গায়ে অস্ত্র লাগ্‌ছে কিনা তাও জানিনে, সে জয়ী হচ্চে কিনা সে খবরও পাইনে—এখন কোথায় কোন্ লড়াইটা হচ্চে সে জনশ্রুতিও আমার কাণে আসে না। কোন দেশের কোন প্রকাশক গ্রন্থকারের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আইন চালায়নি। দূরে থাকি, সুতরাং নিরুপায় হয়ে বসে আছি। আপনি যদি শৈলেশকে ডেকে তার শৈলের মত অচল চিত্তকে আমার দুঃখে একটু বিচলিত করতে পারেন তাহলে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ইতি ১২ই চৈত্র ১৩০৯
>
> আপনার
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ-কালে, আজ থেকে ৭৬ বছর আগে, রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক বেদনা বোধ করেছিলেন, কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত বাংলা দেশের সব সাহিত্যিকই প্রায় সেই বেদনা বোধ

১৯ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ ১৩৪৯। এই তথ্য-নির্দেশের জন্য আমি শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ

করেছেন। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা নিয়ে সকলে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। কোনো দেশেই তা হন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র বা বিশ্বভারতীর মতো মুদ্রণ ও প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান সকলের পক্ষে স্থাপন করাও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত প্রকাশকের পোষকতার অভাবে বাংলা সাহিত্যের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা হিসেব করা যায় না।

পরবর্তীকালে বাংলা দেশে অনেক প্রকাশক বইয়ের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দানও আছে। কিন্তু ইয়োরোপের প্রকাশকদের সঙ্গে এদেশের প্রকাশকদের যে মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে, তার কারণ কি? এ-প্রশ্ন মূলত সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন। এ-প্রশ্নের উত্তর, বাংলার নবজাগৃতি-আন্দোলনের উত্থান-পতনের ধারার মধ্যেই পাওয়া যায়। বাংলা দেশে যে জাগৃতি-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, তা প্রধানত ইডিওলজির বা আদর্শের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, মাটিতে তার বনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপিত হয় নি। এই বনিয়াদ হল অর্থনীতির বনিয়াদ। ইয়োরোপে (ইটালিতে) যে রিনেসান্সের সূত্রপাত হয়েছিল, তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ধনতন্ত্রের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠায়, অবাধ বাণিজ্যের জয়যাত্রায়। বাংলা দেশে শুধু ইডিওলজির ক্ষেত্রে এই জাগৃতির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল, নতুন শিক্ষার ফলে, কিন্তু তার কোনো 'মেটিরিয়াল' ভিত্তি বিশেষ ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দের মতো দু'চারজন বাঙালী ব্যবসায়ীর মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের (Free Enterprise) প্রেরণা জেগেছিল বটে, কিন্তু তা স্বাভাবিক বিকাশের কোনো ঐতিহাসিক পথ খুঁজে পায় নি। বেনিয়ানি ও মুচ্ছুদ্দিগিরি করে বাঙালীরা প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ শাসকরা তা তাঁদের স্বাধীনভাবে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে দেন নি। ধনিক শিল্পপতির বদলে ইংরেজরা বাঙালীদের নতুন জমিদারশ্রেণী ও শিক্ষিত চাকুরীজীবী ভদ্রলোকশ্রেণীতে পরিণত করেছিলেন। বাংলার রিনেসান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলন তাই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পুনরায় চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়েছিল। নব্যসংস্কৃতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বা পরিণতি হয় নি। ইয়োরোপে 'জ্ঞানে'র (Knowledge) সঙ্গে 'বাণিজ্যে'র (Commerce), 'বুদ্ধির (Intellect) সঙ্গে 'বিত্তে'র (Money) যে ঐতিহাসিক সমন্বয় হয়েছিল, বাংলা দেশে তার সূচনা হয়েছিল মাত্র, বিকাশ হয় নি।[২০] বিত্তবানরা তাই বিদ্যাবুদ্ধির বাণিজ্যের পথ বেছে নেন নি। দরিদ্ররাও এই পথে দুঃসাহসীর মতো যাত্রা

২০ Martin : *Sociology of the Renaissance*, pp. 5-12, 27-46.

করে বিত্তসঞ্চয়ের চেষ্টা করেন নি, ইয়োরোপের স্বল্পবিত্ত প্রকাশকদের মতো।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে-দেশে অবাধ বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং উদ্‌যোগী শিল্পপতি বণিকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নি, সে-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্‌যোগী বণিকের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যক্ষেত্রের উদ্‌যোগী বণিকরাই হলেন আধুনিকযুগের প্রকাশকরা। বাংলা দেশে যাঁরা বইয়ের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা নতুন বাঙালী জমিদার, পত্তনিদার ও গাতিদারদের মতো শোষণ ও পোষণের মনোভাব নিয়েই এসেছিলেন, উদ্যম সৎসাহস ও দূরদৃষ্টি নিয়ে আসেন নি। সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে তাই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের দৈন্য ঘোচে নি। বাংলা সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠীও সেইজন্য প্রসারিত হয় নি, একশতাব্দী ধরে প্রায় একই ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের দান তাই নগণ্য বলা চলে। যত সমৃদ্ধই হোক, কেবল কথাসাহিত্যের সম্ভার নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চাসন দাবী করা বা সমান মর্যাদা প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্যের আসন এইদিক দিয়ে টলে উঠবে কি-না, বলা যায় না। ১৮১৮ সালে পীতাম্বর শর্মা যখন ৪২২ পৃষ্ঠার অভিধান প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি ৫০০ কপি ছেপে, ৪০০ কপি বিক্রি হয়ে যাবার পর ১০০ কপির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। একশো বছর পরে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত যত শর্মা যত রকমের বই ছেপেছেন, ৫০০ কপির বেশি কেউ ছাপেন নি। বাংলা বই, ছোটগল্প কাব্য ও প্রবন্ধ, পনের-বুড়ি বছর আগেও, ৫০০ কপির বেশি কোনো প্রকাশক ছাপতেন কি-না সন্দেহ। এর অর্থ এই যে একশো দেড়শো বছরেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংখ্যা ও পাঠকের সংখ্যা বাড়ে নি। অর্থ তাই হলেও, কথাটা সত্য নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জনসংখ্যা নিশ্চয় অনেক বেড়েছে, কিন্তু বইয়ের পাঠক তবু সেদিন পর্যন্ত বাড়ে নি কেন? কারণ বাড়াবার চেষ্টা করা হয় নি, কোনো উদ্‌যোগী প্রকাশক তা করেন নি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা তাই পীতাম্বর শর্মার যুগে সেদিন পর্যন্ত বাস করেছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, সম্প্রতি মনে হচ্ছে, আমরা পীতাম্বর শর্মার যুগ অতিক্রম করছি। বাংলা সাহিত্য এতদিন পরে রাজসভা থেকে বেরিয়ে, পাঁচশো-হাজার মধ্যবিত্ত পাঠকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে, সবেমাত্র হাজার-হাজার পাঠকসাধারণের জনসভায় পৌঁছচ্ছে। শিক্ষিত রুচিবান উদ্‌যোগী বাঙালী প্রকাশকরাও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। প্রকৃত নবযুগের সূচনা হচ্ছে সাহিত্যক্ষেত্রে, তাই বোধহয় বাংলার সাহিত্যিকরা নবযুগের অতীত ইতিহাস আজ আবার নতুন করে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করছেন।

বাংলা সাময়িকপত্রের বিকাশ : 'দিগ্দর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন'

নিসর্গের স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দী জীবনের দিব্য দিনগুলির মধ্যে ক্রমে একটা অননুভূতপূর্ব ব্যস্ততার দুর্গ্রহ দেখা দিচ্ছিল সেকাল-ও-একালের সন্ধিক্ষণে। আমাদের বাংলা দেশে এই সন্ধিক্ষণটা হল অষ্টাদশ শতাব্দী। সমাজে অনেক নতুন আদর্শ ও কর্মনীতির আমদানি হচ্ছিল এবং সেইসব নীতির অঙ্কুশাঘাতে এদেশের জনজীবন সনাতন আদর্শ-ঐতিহ্যের বন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কালস্রোতে ভাসতে আরম্ভ করছিল। মান্ধাতার আমলের নিশ্চল নীতির নঙ্গরগুলি একে-একে এইসময় ছিঁড়তে লাগল। কবির আক্ষেপ

Great things are done when men and mountains meet,
These are not done by jostling in the street. —Blake.

তখন ধূলায় নিক্ষেপ করে মানুষ মিলিত হতে চাচ্ছে মানুষের সঙ্গে। মানুষের জীবনের, মানুষের চিন্তাভাবনার ও কাজকর্মের খবরাখবর জানবার জন্য মানুষ উদ্বিগ্ন হচ্ছে। সমাজ ও বিশ্বসংসার থেকে নির্মুক্ত হয়ে নির্জন পর্বতের পাদদেশে বসে মহৎকর্ম করার যুগ যে আর নেই—একথা এদেশের লোক, অস্পষ্টভাবে হলেও, কলকাতা শহরের কোলাহল শুনেই তখন বুঝতে পারছে। শহরের রাস্তায় তখন আজকের মতো ব্যস্তবাগীশ জনতার দৃশ্য দেখা যায় নি বটে, অটোমোবিলের ছুটোছুটিও আরম্ভ হয় নি, কিন্তু কাঁচাপাকা রাস্তার উপর দিয়ে ঘোড়া-ঘোড়াগাড়ি-পাল্কির দৌড়াদৌড়ি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে মানুষের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে আর গায়ের সঙ্গে গা ঘষে না চলতে পারলে সমাজ ও জীবন দুই-ই অচল হয়ে যাবে। নির্মক্ষিক সমাজ এবং নিরুদ্বেগ ও নিরুদ্যম জীবন যখন আর সম্ভব নয়, তখন 'সংবাদ' বা 'খবর' মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে প্রথমে বাংলা দেশে এই নতুন যুগচেতনা আত্মপ্রকাশ করল মুদ্রিত সংবাদপত্রের মধ্যে।

নিশ্চয় ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে এই যুগচেতনা প্রখর হয়েছিল বাংলা দেশে। ১৭৮০ সালে জন অগস্টস হিকি যখন এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তখন বাংলার পুরাতন গ্রাম্যসমাজ ক্লাইভ-মিরজাফরের আমল থেকে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে-খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। দশবছর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই বিপর্যয় প্রবলবেগে সমাজবক্ষে নেমে এসেছিল এবং গ্রাম্যসমাজের মূল পর্যন্ত তাতে উৎপাটিত

হবার উপক্রম হয়েছিল। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনশূন্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল এবং উৎখাতরা পৈতৃক ভিটেমাটিচ্যুত হয়ে নতুন নাগরিক সমাজের 'লুম্পেন প্রলেটারিয়েটে'র কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। এই নাগরিক সমাজ তখন ঢিমেতালে হলেও নতুন ভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত হচ্ছে এবং তার উপরের স্তরে নানাজাতের ও নানাবর্ণের অজ্ঞাত-কুলশীলরা একালের বিত্তকেন্দ্রিক নয়া-আভিজাত্যের অনুষ্ঠানলিপি রচনা করছেন। এঁরা হলেন কোম্পানির আমলের প্রথম তিন-চার পুরুষের দেওয়ান বেনিয়ান দালাল মুনশী সরকার ও গোমস্তার দল। এঁরাই দেশের উচ্চশ্রেণীর নাগরিক নয়া-আভিজাত্যের প্রবর্তক। সেকালের কুলকৌলীন্যের বদলে বিত্তকৌলীন্য হল একালের আভিজাত্যের অন্যতম মানদণ্ড। ধমনীমধ্যস্থ কুলশোণিতের প্রবাহ ছিল উল্লম্বগতিতে অন্তর্মুখী, তাই সামন্তযুগে কুলকেন্দ্রিক সমাজে শ্রেণীগঠনের প্রসার ছিল না, পরিবর্তনও ছিল না। প্রস্তরবৎ অচল সমাজের মধ্যে মানুষের মনও ছিল বহির্জগতের প্রতি নির্লিপ্ত। কিন্তু আধুনিক বিত্ত-কেন্দ্রিক সমাজে শুধু যে বিত্তের চক্রাবর্তবেগ বৃদ্ধি পেল তা নয়, তার গতিও হল অনুভূমিক, এবং তার প্রচণ্ড আঘাতে তাই সমাজের সেকেলে পিরামিডের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে উঠল, সনাতন সুবিন্যস্ত সোপানগুলিও দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করল। বিত্ত আয়াসে আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু জন্মগত কুল আয়াসের অনায়ত্ত বস্তু। বিত্ত সচল, কুল অচল। কুলের খবর কুলপঞ্জীতে আপ্তবচনের মতো উদ্গীত, কিন্তু বিত্তের খবর নিত্যপরিবর্তনশীল ও রোমাঞ্চকর। তার খবর কোথায় পাওয়া যাবে? আধুনিক সংবাদপত্রে। বিত্তচালিত সমাজের যাবতীয় বার্তা বহন করে আনবে সংবাদপত্র, আধুনিক মানুষ প্রত্যহ গীতাপাঠের মতো তা পাঠ করে তৃপ্ত হবে। অতএব সংবাদপত্রের প্রয়োজন।

বাংলার সমাজে এই প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বেশ প্রবল হয়ে উঠল। দেশের নয়া-বিত্তবানেরা তখন নিজেদের স্বার্থেই বেশ সংবাদলোলুপ হয়ে উঠেছেন। তার উপর হেস্টিংসের আমল থেকে দেশের রাজনীতিও যখন উত্তেজনার খোরাক যোগাতে লাগল তখন সংবাদপত্রের কালোপযোগী উপজীব্যেরও অভাব ঘুচে গেল। ঠিক এই ঐতিহাসিক সুযোগে, ১৭৮০ সালে জন অগস্টস হিকি বাংলা দেশের কলকাতা শহর থেকে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য, এই গেজেট ইংরেজি সংবাদপত্র। হিকি তাঁর সংবাদপত্রের পরিকল্পনা প্রথমে একটি প্রস্তাবাকারে (proposals) ছেপে প্রচার করেছিলেন। তাতে সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে কয়েকটি কথা তিনি এখানকার নগরবাসীদের জানিয়েছিলেন। এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে হিকির এই নিবেদনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব তাঁর একটিমাত্র উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়

> The chief intention of a *Newspaper*, being to effect the more easy circulation of such information, as are either useful or entertaining, and tending to promote the trading concerns of industrious individuals. This paper is set on foot with that design, and to bring into one *Focus*, or immediate point of view, the numerous notices, advertisements etc. now handed about by Harcarrahs in Manuscript . .

মোগল আমলে আমাদের দেশে 'ওয়াকেয়া-নবিস' বা সংবাদলেখকরা ছিলেন, বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁরা প্রত্যেক সপ্তাহে বা মাসে রাজদরবারে লিখে পাঠাতেন। এইসব সংবাদলিপিকে 'আখ্‌বার' বলা হত এবং এগুলি লেখা হত ফারসীতে। বড়-বড় বণিক ও ধনিক মহাজনদেরও নিজস্ব সংবাদলেখক থাকত, হিন্দু মহাজনদের সংবাদলিপিতে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করা হত। আখ্‌বারেতে বা সংবাদলিপিতে শুধু বিশেষ-বিশেষ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হত, তার উপর কোনো মন্তব্য করা হত না। ইংরেজ আমলে প্রথমদিকে এই প্রাচীন সংবাদব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভবও ছিল না। তখন হাতেলেখা লিপিতে ডাক-হরকরারা বাড়ি-বাড়ি সংবাদ সরবরাহ করত। হিকি একথা তাঁর নিবেদনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে কলকাতার মতো বর্ধিষ্ণু বিত্তশালী শহরে এই হরকরাদের উপদ্রব একটা 'nuisance' ও 'disgrace' ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলে কলকাতা শহরের এই কলঙ্ক অপনোদিত হবে। সর্বাধিক উপকৃত হবেন বিত্তসন্ধানী ব্যবসায়ীরা, কারণ বাজারের দ্রব্যমূল্য, কেনাবেচার নোটিস ও বিজ্ঞাপন, জাহাজের আসা-যাওয়ার খবর ইত্যাদি যা নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে তা সবই প্রায় বিত্তলোভীদের কৌতূহলের ইন্ধন যোগাবে, খবর-ক্ষুধা জাগ্রত করবে।

হিকির নিবেদনটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে বোঝা যায় যে এযুগের আর্থনীতিক স্বার্থের তাগিদেই আধুনিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি হয়েছে, রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় কালক্রমে সংবাদের গুরুত্ব অর্জন করে তাতে স্থান পেয়েছে। হিকি অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর 'বেঙ্গল গেজেটে' নিলাম-নোটিস-বিজ্ঞাপনের পাশে সাহিত্যিকদের জন্য একটি স্থান করে দিয়েছিলেন। পণ্যদ্রব্যের বাজারদরের সঙ্গে কাব্য-সাহিত্যের দর যাচাইয়েরও সুযোগ পেয়েছিলেন 'বেঙ্গল গেজেটে'র ভাগ্যবান পাঠকগোষ্ঠী।

'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের পর আরও প্রায় ৪০ বছর কেটে গিয়েছিল বাংলাভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে। একালের সংবাদপত্র সেকালের আখ্‌বার নয়, ঘটনার ব্যাখ্যান ও মন্তব্যের মধ্যে মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধিকার ঘোষণা করে তার আবির্ভাব হয়েছে। কাজেই রাজপুরুষদের কাছে সংবাদপত্র গোড়া থেকেই চক্ষুশূল হয়ে উঠল। 'বেঙ্গল গেজেটে'র পর ইংরেজরাই এদেশে 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে ও খবরাখবর প্রচারে ইংরেজ শাসকরাই ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছেন। ১৭৯৯ সালে এদেশে ওয়েলেসলি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে আইন পাস করেন। এই আইন অনুযায়ী সরকারী সংবাদ-পরীক্ষকের অনুমতি ছাড়া কোনো সংবাদ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এদেশে সংবাদপত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সরকারী আক্রোশে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। হিকি সাহেবের ওপর হেস্টিংস কম অত্যাচার করেন নি, একাধিকবার তাঁকে কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে। শৈশবকালে ইংরেজি সংবাদপত্রকেই যখন টুঁটি টিপে হত্যা করার জন্য শাসকরা উদ্যত হয়েছেন তখন এদেশের মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের বাসনা যদিও বা কারও মনে জেগে থাকে তাহলে অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট হয়েছে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে দেশের সামাজিক আবহাওয়া দ্রুত বদলাতে আরম্ভ করল। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হল (১৮০০), সমাজ সংস্কারের অন্যতম উদ্‌গাতা রামমোহন রায় কলকাতা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হন (১৮১৪), সামাজিক প্রথাসংস্কারাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আত্মীয় সভা স্থাপন করেন এবং বাংলাভাষায় অনুবাদ ও ভাষ্যসহ প্রথম 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করেন (১৮১৫), এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্‌যোগে আধুনিক পাশ্চাত্য-বিদ্যা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ (হিন্দু কলেজ) স্থাপিত হয় (১৮১৭)। সমাজবক্ষে বহুদিক থেকে তরঙ্গ ওঠে একসঙ্গে এবং এইসময় রামমোহন রায় মাতৃভাষাকে বেদান্তের বাহন করে মর্যাদার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা গদ্যভাষা ভূমিষ্ঠ হল যুগোপযোগী জটিল ভাবপ্রকাশের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে। বাংলাভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের শুভমুহূর্তও এগিয়ে এল। ১৮১৮ সালে তিনখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হল : মাসিক 'দিগদর্শন', সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ', সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি'। প্রথম দুটি পত্রিকা শ্রীরামপুর থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা প্রকাশ করেন, তৃতীয় পত্রিকাটি প্রায় একই সময়ে দু'জন বাঙালীর (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়) উদ্‌যোগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর পর 'ব্রাহ্মণ

সেবধি' (১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) ও 'সম্বাদ তিমিরনাশক' (১৮২৩) আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্যন্তই আমরা বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পর্বের সীমারেখা টানতে পারি। 'কৌমুদী' উনিশ শতকের তিরিশের কোঠা এবং 'চন্দ্রিকা' পঞ্চাশের কোঠা উত্তীর্ণ হয়েছিল অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। এই দুটি পত্রিকাই ছিল প্রথম পর্বের প্রাণস্বরূপ, কাজেই প্রথম পর্বের সীমারেখা অন্তত 'কৌমুদী'র অন্তিমকাল পর্যন্ত টানতে হয়।

বাংলা সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের এই প্রথম পর্বে দেখা যায় যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে, পত্রিকায় তাঁদের অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এবং পত্রিকার পোষকতাও তাঁরা করেছেন। "এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপান্ন তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত"—'বঙ্গদূত' পত্রিকা এই ভাষায় মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক ভূমিকার সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন (১৮২৯)। সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই নবজাত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে মতামতের সংঘর্ষ হয়েছে তা সমকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়েছে। বিরোধ প্রধানত ধর্মমত ও সমাজসংস্কারের ঔচিত্য কেন্দ্র করে ঘনিয়ে উঠেছে। একদিকে রামমোহনপন্থীরা, অন্যদিকে সাধারণ হিন্দুসমাজ ও রক্ষণশীলরা বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন নিজেদের পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এ-রকম দৃশ্য এদেশের সমাজে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মতামতের যে সামাজিক গুরুত্ব আছে তা পূর্বে কখনও ব্যক্তিমানসে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয় নি। এই প্রথম একটা যুগান্তকারী সত্য মামুলি শাস্ত্রকথার কুয়াশা ভেদ করে ভোরের সূর্যের মতো ভেসে উঠল দেশের লোকের সামনে। হলই বা তা প্রধানত মধ্যশ্রেণীর সামনে, তাতেই বা কি? ভৌগোলিক সীমাও হয়ত তখন তার কলকাতা শহরের সীমা, তাতেও কিছু আসে-যায় নি। 'কৌমুদী'-'চন্দ্রিকা'র বিরোধ-বিতর্কের মধ্যে এদেশের মানুষের স্বাধীন গণতান্ত্রিক মতামতের জয়যাত্রা ধ্বনিত হয়ে উঠল। নবযুগের উদ্‌বোধন হল দেশীয় সংবাদপত্রে।

বিদ্যাসুন্দর রতিমঞ্জরী রসমঞ্জরীর মতো আদিরসাত্মক সাহিত্যবস্তু এবং কবিগান আখড়াই হাফ-আখড়াই তরজা যাত্রা পাঁচালি তখন অভিজাত নাগরিক সমাজের সাংস্কৃতিক আসর জাঁকিয়ে বসেছিল। তাদের উৎখাত করে বিদ্যাবুদ্ধি-যুক্তি-আশ্রিত জ্ঞানদায়ক বিষয়বস্তু সদ্যোজাত আড়ষ্ট গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল প্রথম পর্বের এই বাংলা পত্রিকাগুলি। প্রবীণ কাব্যসাহিত্যকে স্থলান্তরিত করে নবীন গদ্যসাহিত্যকে সেখানে অভিষিক্ত করার কঠোর ঐতিহাসিক কর্তব্য প্রধানত এই পত্রিকাগুলি পালন করেছিল। অবশ্য বাংলা গদ্যভাষায় গুরুবিষয়ে গ্রন্থরচনা তখন

আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠক এবং পত্রিকার পাঠকের মধ্যে সংখ্যাগত গুণগত পার্থক্য ছিল অনেক। পত্রিকার প্রভাব সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসময় জনৈক পাঠক এ-বিষয়ে লিখেছেন, 'প্রতি সপ্তাহে তত্তৎ পত্রার্থাবগত হইয়া বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপ পূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখাপড়ার ধারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়।' এই বাংলা লেখাপড়ার চর্চা এদেশে সাময়িকপত্র প্রকাশের পর থেকে শুরু হয়েছে বললে অতিশয়োক্তি হয় না।

১৮২১-২২ সালে 'কৌমুদী' ও 'চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হবার পর বাংলাভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলন সম্বন্ধে এদেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে বিশেষ সজাগ হয়েছিলেন তা ১৮২৩ সালে গৌড়ীয় সমাজ নামে প্রথম বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠা থেকে বোঝা যায়। ল্যাডলিমোহন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ তৎকালের সমাজের প্রতিপত্তিশালী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা এই বিদ্বৎসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। লক্ষণীয় হল, মতামতের সংকীর্ণতা সভার পোষকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বহুজনের বিদ্যা বুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা এবং আধুনিক নানাবিষয়ে মাতৃভাষায় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করা। বিদ্বজ্জনেরা যে এইভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ অনুশীলনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, এটাই বড় কথা। সংকল্পের রূপায়ণে বাংলা সাময়িকপত্রের দানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

উনিশ শতকের তিরিশের গোড়া থেকে কোম্পানির আমলের শেষ পর্যন্ত (১৮৫৭-৫৮) বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব বা মধ্যপর্ব বলা যায়। এই মধ্যপর্বে দেখা যায়, হিন্দু কলেজে ইংরেজিশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ বাঙালী বুদ্ধিজীবির বিকাশ হয়েছে, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত সামাজিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত জনস্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হয়েছে এবং বিত্তের চক্রাবর্তবেগে দেশের গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে অভাবনীয় শ্রেণীরূপান্তর হয়েছে। কোম্পানির দেওয়ানীলাভের পর থেকে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত অনভিজ্ঞ ইংরেজ শাসকরা এদেশের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ে যেসব প্রশাসনিক পরীক্ষা করেছেন তাতে বাংলার গ্রামীণ সমাজের মূল ও কাঠাম দুই-ই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। উপরের স্তরে বনেদী জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন একদল হঠাৎ-ধনিক রাজস্বব্যবসায়ী এবং

তাঁদের ও নিচের স্তরের কৃষকপ্রজাদের মধ্যবর্তী স্তরে একদল রাজস্বের ঠিকাদার গজিয়ে উঠেছেন। এই নতুন গ্রাম্য উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী মাটি ও মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ মমতা-বর্জিত হলেও আধুনিক কালোপযোগী মনোভাবও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। গ্রাম ও নগরের মধ্যবর্তী স্তরে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় তাঁরা বিরাজ করছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে এঁদের মানসিক তৎপরতার অভাব ছিল না। নতুন সংবাদপত্রসাহিত্যের পোষকতায় বাংলার গ্রামীণ সমাজের এই নয়া-জমিদারশ্রেণী ও মধ্যস্বত্বভোগী উৎসাহভরে অগ্রণী হয়েছিলেন। তার কারণ বোধহয় নব্যশিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা। এই স্পর্শলাভ ভিন্ন নবযুগের সমাজে আভিজাত্যের জাতে ওঠা সম্ভব নয় বলেই তাঁরা নতুন শিক্ষাসংস্কৃতির সমর্থনে উৎসাহী হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শহরের ক্রমবর্ধমান মধ্যশ্রেণী। এককথায় বলা যায় বাংলা সাময়িকপত্রের পর্বান্তরের জন্য সামাজিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রই তখন প্রস্তুত ছিল।

এই প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্বৎসভার প্রসার এবং দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপর তার প্রভাব বিস্তার থেকে। ১৮৩০-৩১ থেকে ১৮৫১-৫৬ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে যেন বিদ্বৎসভা সাহিত্যসভা ও বিতর্কসভা স্থাপনের মহাধুম পড়ে যায়। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত তরুণরা ১৮২৮ সালের দিকে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে সুধীমহলে সোরগোল তুলেছিলেন কিন্তু সেখানে ইংরেজিভাষায় ফোয়ারা ছুটত, দেশীয় বাংলাভাষা বিশেষ আমল পেত না। ১৮৩২ সালে ষোড়শবর্ষীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যমে সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা স্থাপিত হল যেন তরুণ ডিরোজিয়ানদের জবাব দেবার জন্য। সভার উদ্দেশ্য এইরূপে ব্যক্ত করা হল, 'এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষায় আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।' যুবক দেবেন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থই এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন।' এই সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৫-৩৬), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩) প্রভৃতি সভা-সমাজ একে-একে স্থাপিত হয়। বাংলাভাষার সমাদর যে বাড়ছে তা সভার নামকরণ থেকে বোঝা যায়, উদ্দেশ্য বা অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা কয়েক বছরের মধ্যে ১০০ থেকে প্রায় ৮০০ পর্যন্ত হয়, বেথুন সোসাইটির

সভ্যসংখ্যা হয় ২৪ থেকে ৩০০। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে এই সভাগুলি যে কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এই ধরনের কয়েকটি সভার উত্তরোত্তর সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধি থেকে অনুমান করা যায়।

এইসময় বাংলাভাষায় যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে নানাদিক দিয়ে অগ্রগণ্য হল : 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১ সাপ্তাহিক, ১৮৩৯ দৈনিক, ১৮৫৩ মাসিক), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩ মাসিক), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮-৫৪ মাসিক)। এগুলি ছাড়া আরও বহু বাংলা পত্রিকা এই পর্বে প্রকাশিত হয়। যেমন 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১ সাপ্তাহিক), 'অনুবাদিকা' (১৮৪১ সাপ্তাহিক), 'বিজ্ঞানসেবধি' (১৮৩২ মাসিক), 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' (১৮৩৩ পাক্ষিক), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৮৩৫ মাসিক, ১৮৩৬ সাপ্তাহিক, ১৮৪৪ দৈনিক),'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯ সাপ্তাহিক), 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২ এপ্রিল মাসিক, ১৮৪২ সেপ্টেম্বর পাক্ষিক, ১৮৪৩ মার্চ সাপ্তাহিক) ইত্যাদি। বিবিধ কারণে এই পত্রিকাগুলিও মূল্যবান, কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যপর্বে বাংলাভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের অভীপ্সা পূর্বোক্ত চারটি পত্রিকার মধ্যে প্রকট বলা চলে। এই কারণে চারটি পত্রিকাকেই আমি এই মধ্যপর্বের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেছি।

সদ্যোজাত বাংলা গদ্যভাষার শৈশবকালীন অস্ফুটতা কাটিয়ে তোলাই এক বৃহৎ সমস্যা। তার চাইতেও বৃহত্তর সমস্যা হল এই গদ্যভাষাকে নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগ্য বাহন করে তুলে তাকে সর্বভারসহ সুঠাম করে গঠন করা। সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিতজনের সামনে তুলে ধরেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। একথা ঠিক যে 'প্রভাকর'-সম্পাদক নিজে স্বভাবকবি ছিলেন বলে গদ্যরচনায় তিনি প্রাচীন কাব্যরীতির শিশুসুলভ অনুপ্রাসপ্রবণতা ও চটুল চপলতাদোষ পরিহার করতে পারেন নি, কিন্তু 'মৃত্যুঞ্জয়ী' (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) গৌড়ীরীতি ও কিম্ভুত-কিমাকার পাদ্রিরীতি থেকে বাংলাভাষাকে মুক্ত করে সর্বজনবোধ্য ও সুগম করে তোলার কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর। তাছাড়া 'প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় গুপ্তকবি বাংলাভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনের পক্ষে যে-রকম আন্তরিক সুরে বারংবার আবেদন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় (বর্তমান লেখক সম্পাদিত ও সংকলিত : 'সাময়িক-পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', প্রথম খণ্ড, 'সম্পাদকীয়' দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও বাংলা গদ্যভাষার উন্নয়নোদ্দেশ্যে গুপ্তকবির একটি পরোক্ষ দান হল তৎকালের অন্যতম শক্তিধর গদ্যলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন : 'দর্জিটোলায় নারায়ণ দত্তের বাড়িতে একটি 'বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা' ছিল। সেই সভায় প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় ও ক্রমে বিশেষ

বন্ধুতা জন্মে। তখনও বাংলাভাষায় কিছু লিখিতে হইলে সাধারণতঃ পদ্যেই তাহা লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল, তদনুসারে অক্ষয়কুমারও মধ্যে মধ্যে পদ্য রচনা করিতেন। একবার প্রভাকর পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদক পীড়িত হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে অনুরোধ করেন যে পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজি প্রবন্ধ যেন অক্ষয়কুমার বাংলাতে অনুবাদ করিয়া দেন। প্রথমতঃ অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন, 'আমি তো কখনও গদ্য লিখি নাই, আমি কি পারিব?' কিন্তু অক্ষয়কুমারের লেখাটি এত ভাল হইল যে তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বাংলা গদ্যে নানা প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত করেন।' বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্যভাষা আধুনিক যুগপোযোগী ভাবগম্ভীর রূপ ধারণ করল।

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সনে। অক্ষয়কুমারের রচনাগুণে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং পরে এই পত্রিকার সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদকতা করেন এবং এইসময়ের মধ্যেই আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিৎ প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানত এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। আধুনিক সকল বিষয়ে বাংলা গদ্যভাষায় অনুশীলনে তৎপর হয় 'তত্ত্ববোধিনী'। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাবৃত্ত জীবনচরিত রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সমাজনীতি ইত্যাদি আধুনিক সমস্ত জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলন 'তত্ত্ববোধিনী'তে নিয়মিত হতে থাকে। এসব বিষয় যে বাংলাভাষায় আলোচনা করা আদৌ সম্ভব হতে পারে তা আগে দেশের শিক্ষিতজনের কল্পনাতীত ছিল। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। নব্য-শিক্ষিতসমাজের 'সম্রাট' ছিলেন তখন রামগোপাল ঘোষ, লোকে তাঁকে 'এজুরাজ' ('এজুকেটেড'-দের রাজা) বলত। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে রামগোপাল একদিন মহা উৎসাহে একখণ্ড 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হাতে নিয়ে রামতনু লাহিড়ীর কাছে গিয়ে বলেন, 'রামতনু, রামতনু, বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ!' রামগোপাল-রামতনুর মতো ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী যুবকরাও কেন 'তত্ত্ববোধিনী'কে এইভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন তার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন: 'তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের, অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্যজগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।...ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।'

'ব্রীড়াজনক বিষয়' বলতে লঘু আমোদ-প্রমোদ ও ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করে'র মতো পত্রিকাও এই চটুল রচনার মোহমুক্ত হতে পারে নি। অর্থাৎ আখড়াই-তরজা-কবিয়ালী ঢঙ্ যেন কতকটা উত্তরাধিকার-সূত্রেই তৎকালের সাময়িকপত্রগুলি গ্রহণ করেছিল, এবং রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সমাজনীতির মতো গুরুবিষয়ের আলোচনার মধ্যেও এই চাপল্য আমদানি করে বিদ্যা-সুন্দরী দায় অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকরা। 'কৌমুদী' ও 'বঙ্গদূতে'র মতো পত্রিকাগুলি, প্রধানত রামমোহন ও তাঁর আদর্শানুরাগীদের আনুকূল্যে, এই দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী'র মতো বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বৈচিত্র্য তাঁদেব ছিল না, এবং সে-পথের দুর্গমতার কথা ভেবে অগ্রসর হবার সাহসও তাঁদের হয় নি। সমস্ত দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' প্রথম এই পথে নির্ভয়ে পা বাড়িয়েছিল অদম্য উৎসাহ ও দুর্ভেদ্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে। নাবালক বাংলাভাষাকে প্রায় রাতারাতি সাবালক করার চেষ্টা বলে একে চিহ্নিত করা যায়। বাংলা গদ্যভাষার প্রথম সার্থক শিল্পী বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। 'অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর—বাংলার দুটা বাঘা ভাল্‌কো লেখক তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন' (অক্ষয়চন্দ্র সরকার)। 'তত্ত্ববোধিনী'র গ্রাহকসংখ্যা ৭০০ পর্যন্ত উঠেছিল। সেকালে শিক্ষিত প্রায় সকলেই এই পত্রিকার অনুরাগী পাঠক হয়েছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকতার ঐতিহ্যগৌরব বোধহয় আর কোনো বাংলা সাময়িকপত্র আজ পর্যন্ত দাবি করতে পারে না। অক্ষয়কুমারের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (এপ্রিল ১৯১০—এপ্রিল ১৯১৫), ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রায় ৮০ বছর 'তত্ত্ববোধিনী' বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করে বিদায় নিয়েছে। বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যসাহিত্যকে বাল্যকালে লালন করে কৈশোর ও যৌবনের মধ্যাহ্নে তার প্রখর দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হবার সৌভাগ্যও তার হয়েছে। বঙ্কিমপর্ব ও রবীন্দ্রপর্বের সাধনগৌরবও তার প্রাপ্য। এ-রকম দীর্ঘকালবিস্তৃত সাহিত্য-সাধনা আর কোনো বাংলা সাময়িকপত্রের জীবনে সম্ভব হয় নি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের দানের ইতিহাস লেখা হলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব অনুসন্ধানীর দৃষ্টিপথে বিচিত্র বিস্ময় উদ্‌ঘাটিত করবে।

'তত্ত্ববোধিনী'র পরে মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় (অক্টোবর ১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায়। বাংলাভাষার সমাদর ও মর্যাদা প্রধানত 'তত্ত্ববোধিনী'র চেষ্টায় তখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি নব্য ইংরেজিশিক্ষিতরা পর্যন্ত তার বহুবিধ গুরুভাব প্রকাশের সম্ভাব্যতায় আস্থাবান হয়েছেন। বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভার পরে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮৫০)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বেথুন, হজসন প্র্যাট, রেভারেণ্ড লং প্রমুখ এদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতরা এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভাস্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'to publish translations of such works as ..to provide a sound and useful Vernacular Domestic Literature for Bengal.' এই সভার মুখপত্ররূপে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় — 'যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প ···আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্তপত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।' পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকার আলোচ্য বস্তু এবং চিত্র সহযোগে আলোচনা বাংলা সাময়িক-পত্রে এই প্রথম। কাজেই পত্রিকার প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি পেল, সাহিত্যের পোষক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকরা আরও বেশি উৎসাহী হলেন। বাল্যজীবনে রবীন্দ্রনাথও যে এই পত্রিকাপাঠে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখে গিয়েছেন: 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণ-কুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'

'বিবিধার্থ'কে খুব উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা বললে অত্যুক্তি হবে। 'অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক' বলা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল তা লিখতে পারেন নি। 'তত্ত্ববোধিনী'র অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগরের মতো গদ্যভাষায় তাঁর দখল ছিল না, গুরুবিষয় সুগম গাঢ়বদ্ধ ভাষায় প্রকাশের দক্ষতাও তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনায় সাহিত্যবোধ নিঃসন্দেহে অনেক কম ছিল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে শিল্পবোধের যে মণিকাঞ্চন-যোগ 'তত্ত্ববোধিনী'তে হয়েছিল বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মতো দুটি 'বাঘা ভাল্লুকো'

লেখকের লেখনীর গুণে, 'বিবিধার্থে' তা সম্ভব হয় নি। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-পাঠক 'বিবিধার্থ' সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন, 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ভক্তিপূর্বক পাঠ করিতাম। তাহা হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম বহুতর। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায় সাহিত্য-শিক্ষার কোন সুবিধা পাই নাই, বলিতে কি ভাষাশিক্ষারও নহে।' সাহিত্য ও ভাষা-শিক্ষার জন্য তখন 'তত্ত্ববোধিনী' ছিল, কাজেই 'বিবিধার্থে'র দ্বারা সে-উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও মধ্যবিত্ত পাঠকদের ক্ষতি হয় নি। বরং লাভ হয়েছে। সেই লাভের কথা রবীন্দ্রনাথও 'বিবিধার্থ' প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন। 'সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ' তখন ছিল না। 'বিবিধার্থ' সেই অভাব পূরণ করে এবং মধ্যবিত্তের সাধারণ স্তরে পর্যন্ত গুরুবিষয় পাঠের অভ্যাস তৈরি করে। আজকের দিনেও যখন পঠনক্ষম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে রুচিবিকৃত অপসাহিত্যপাঠের আগ্রহ এত প্রবল, তখন উনিশ শতকের মধ্যভাগে সুসাহিত্যের পাঠকবৃদ্ধির দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে 'বিবিধার্থ' একটা বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করেছিল।

'বিবিধার্থে'র পর 'মাসিক পত্রিকা'র আবির্ভাব হয় (১৮৫৪)। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দু'জনেই ডিরোজীয়ান। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে ইংরেজিশিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গলে'রও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি উদাসীন মনোভাব বদলাচ্ছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এদেশের ইংরেজিশিক্ষিতরাও উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন যে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রসার ভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ বা সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের যুগে ও 'তত্ত্ববোধিনী'র যুগে এই সুস্থ চেতনার বিকাশ হয় এবং তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। এর পর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গলের পদার্পণ প্রত্যাশিত। কেবল পাশ্চাত্যবিদ্যার অস্মিতা নয়, শিক্ষাভিমান পর্যন্ত পরিবর্জন করে তাঁরা সর্বসাধারণের জন্য বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'মাসিক পত্রিকা' তারই নিদর্শন। সাধারণের জন্য, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের জন্য, এই পত্রিকা। উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেন: 'বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

বাংলাভাষায় গম্ভীর জ্ঞানসাহিত্য রচনার পথপ্রদর্শক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' তার প্রয়োজনীয়তা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ব্যক্ত করে। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' শিক্ষিতজনের মধ্যে এই সাহিত্যচেতনার ব্যাপক প্রসারে সচেষ্ট হয় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে'র প্রথম সর্গ মুদ্রিত করে আধুনিক বাংলা কাব্যের সাধনপথের

সন্ধান দেয়। অতঃপর 'মাসিক পত্র' বাংলা সাহিত্যের সীমানা সাধারণ স্তরে, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের কাছে পর্যন্ত, বিস্তৃত করতে উদ্‌যোগী হয় এবং প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ করে নবযুগের বাংলা কথাসাহিত্যের সাধনপথ উন্মুক্ত করে দেয়।

এর পর 'বঙ্গদর্শনে'র যুগ স্বভাবতঃই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। তার উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয় উনিশ শতকের ষাটের মধ্যে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্তরটিও দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে এবং সাহিত্যের পোষকতার অভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩), 'সুলভ সমাচার' (১৮৭০) প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সর্ববিধ সমাচারক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে—রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়মিত আলোচিত হতে থাকে। 'সোমপ্রকাশ' ও 'সুলভ সমাচারে' রাজনীতি ও সমাজবিষয় বেশি, 'অবোধবন্ধু'তে সাহিত্যবিষয় বেশি। 'অবোধবন্ধু' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত··· বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।' শুকতারা 'অবোধবন্ধু'র পর প্রভাতসূর্য 'বঙ্গদর্শন'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্গদর্শন' প্রসঙ্গে: 'কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেইসব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' থেকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আলো এল, আশা এল, সংগীত ও বৈচিত্র্য এল। কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেটি' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রগুলি অন্ধকার ও সুপ্তির বিরুদ্ধে খড়্গ তুলেছিল বলেই এত আলো ও আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল 'বঙ্গদর্শনে'র যুগ।

মুদ্রণ-নগর কলকাতা

ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার যুগের উদয় হলেও, কলকাতা শহরে তখনও মন্থরগতি হাতীর যুগ অস্ত যায় নি। চৌরঙ্গির জঙ্গলে তখনও বাঘ বিচরণ করছে। কলিতীর্থ কালীঘাটের যাত্রীরা বাঘের ভয়ে সূর্যাস্তের আগে ধর্মকর্ম সেরে ঘরে ফিরে যান। খানাডোবা পুকুর বাগান ধানক্ষেত বাঁশবন আর হোগলাপাতার কুঁড়েঘরে তখন কলকাতা শহর ভর্তি। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধারণ করলেও তখনও কলকাতা শহরে তাঁরা আমিরী মেজাজে পুরো জমিদারী চালে চলাফেরা করছেন। এই-সময় লালবাজারের জেলখানায় দেনার দায়ে বন্দী জন অগস্টস হিকি নামে একজন সাহেব একটি বই পড়ে ছাপাখানা সম্বন্ধে উৎসাহিত হন এবং প্রথমে তিনি একটি ছাপাখানা কলকাতায় স্থাপন করেন। সেই ছাপাখানার কাজকর্ম থেকে কিছু টাকা জমিয়ে হিকি ইংলণ্ড থেকে একটি ছোট প্রেস কলকাতায় আমদানি করেন এবং ১৭৮০ সালে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। 'বেঙ্গল গেজেট' ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদ প্রকাশের সম্মান কলকাতা শহরের প্রাপ্য এবং প্রথম সম্পাদকের সম্মান দাবি করতে পারেন হিকি সাহেব।

ইংরেজদের আগে পর্তুগীজরা প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন ভারতবর্ষে গোয়াতে। কিন্তু ইংরেজ আমলে বাংলা দেশে কোথায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়? হুগলীতে, না কলকাতায়? ছাপাখানা কলকাতা শহরেই প্রথম স্থাপিত হয়, হুগলীতে নয়। ১৭৭৮ সালে বাংলা অক্ষর প্রথম মুদ্রিত হয় হলহেডের ব্যাকরণে এবং এই বই ছাপা হয় হুগলীতে, অ্যানড্রুজ নামে এক সাহেবের প্রেসে। হুগলীতে কোথায় অ্যানড্রুজের প্রেস ছিল তা জানা যায় নি। কিন্তু ১৭৭৮ সালের আগে যে কলকাতায় ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাণ্ডেল অঞ্চলে পর্তুগীজরা গির্জা স্থাপন করেছিলেন, বাংলার প্রাচীনতম খ্রীস্টান উপাসনালয়, কিন্তু কোনো প্রেস স্থাপন করে ছাপার কাজ করতেন বলে জানা যায় না। হিকি ১৭৭৮ সালের আগেই কলকাতায় প্রেস করেছিলেন মনে হয়, কারণ প্রেসের কাজকর্ম কিছুদিন করার পরে তিনি ১৭৮০ সালে 'সংবাদপত্র' প্রকাশ করেন। তা ছাড়া তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'প্রথম প্রিণ্টার' বলে পত্রিকায় নিজের পরিচয়ও দিতেন। তাতে মনেহয় হিকির প্রেস থেকেই কলকাতায় কোম্পানির

কাজকর্ম হত। তা যদি হয় তাহলে কলকাতা শহরের প্রথম প্রিণ্টার ও প্রথম প্রেসের প্রতিষ্ঠাতার সম্মান হিকি সাহেবকেই দিতে হয়।

১৭৭৯ সালে দেখা যায়, চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে গবর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিল কলকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। রাজস্ববিভাগের সেক্রেটারি হজসন সাহেবের এই চিঠি (সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি অরিওল সাহেবকে লিখিত, ৮ জানুয়ারি ১৭৭৯ তারিখে) থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

Sir, —The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing Office under the Superintendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed Copy of the Rates of Printing.

Rates of Printing

For English Impressions

For every Quire of Folio Post, Paper included.

If Printed on one Side	..	Sa. Rs. 3
If Printed on both Sides	..	„ 5
For Persian and Bengali		
For every Quire of Folio Post, Printed on one Side		„ 5
Do · Do	...	„ 7

১৭৭৯ সালের ৮ জানুয়ারি চিঠিখানা লেখা। তার আগে ১৭৭৮ সালেই ছাপাখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছে বোঝা যায়। কৌতূহলী হবার মতো আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে চিঠির মধ্যে। বাংলা ও ফার্সী ছাপার বিষয়। বাংলা ছাপার ব্যবস্থাও যে ১৭৭৮ সালের মধ্যে করা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হল, ছাঁচেঢালা বাংলা অক্ষর কোথা থেকে পাওয়া গেল? বিলেত থেকে কি বাংলা অক্ষর ঢালাই করে আনা হয়েছিল? জানা যায় না। সম্ভবত চার্লস উইলকিন্স এই বাংলা ও ফার্সী অক্ষর ঢালাই করেছিলেন, বাংলার সুদক্ষ কারিগর কর্মকারদের সহযোগিতায়। এই কর্মকারদের মধ্যে পঞ্চানন কর্মকার অন্যতম। পঞ্চানন, তাঁর জামাই ও দৌহিত্রের কথা জানা যায়, অন্যান্য কর্মকারদের কথা জানা যায় না। আরও একটি প্রশ্ন হল, যে-অক্ষর পঞ্চানন ঢালাই করেন, তার ছাঁদ বা মডেলটি তিনি কোন বাংলা অক্ষর থেকে গ্রহণ করেন? পঞ্চানন নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন কি-না জানা নেই। জানলেও তাঁর হস্তাক্ষরের ছাঁদ যে ভাল হবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে বাংলা অক্ষরের

নমুনা তিনি কোথা থেকে পেলেন? স্বভাবতঃই সেকালের হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির লিপিকরদের অক্ষরের বিভিন্ন ছাঁদ থেকে একটি ছাঁদ উইলকিন্স ও পঞ্চানন বাছাই করে নিয়েছিলেন। 'নববার্ষিকী' পত্রিকায় (১২৮৪ সন) এ-সম্বন্ধে লেখা হয়

> উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে সার চার্লস্ উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে সার ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডন্‌কেন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎ মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফস্টর (ফরস্টর) সাহেব কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্মকার নূতন এক সেট তাঁবা নির্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। এই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে।

'নববার্ষিকী'র উক্তি সত্ত্বেও সঠিক বলা যায় না, কার হস্তাক্ষরের ছাঁদ থেকে পঞ্চানন বাংলা মুদ্রণাক্ষরের সাট তৈরি করেছিলেন। একজনের হস্তাক্ষর থেকে নাও হতে পারে। একথার সত্যমিথ্যা যাচাই করা কঠিন। হলহেডের ব্যাকরণের প্রয়োজনে প্রথম কয়েকটি বাংলা মুদ্রণাক্ষর কোথায় তৈরি হয়েছিল, তাও বোঝা যায় না। তবে সম্পূর্ণ বাংলা বই বাংলা ছেনিকাটা ছাঁচেঢালা হরফে ১৭৮৫ সাল থেকে কলকাতা শহরে একটির পর একটি মুদ্রিত হতে থাকে। যেমন

> ১৭৮৫ সাল। জোনাথান ডানকান *Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewannee Adaulut* বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই বই কলকাতায় অনরেবল কোম্পানির প্রেস থেকে ছাপা হয়।
>
> ১৭৯১ সাল। এডমনস্টোন *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice, in the Fouzdarry, or Criminal Courts, in Bengal, Behar and Orissa* বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ছাপা হয় কলকাতায় কোম্পানির প্রেস থেকে।
>
> ১৭৯২ সাল। *Bengali Translation of Regulations for the Guidance of the Magistrates. Passed by the Governor-General in Council*

in the Revenue Department, on the 18th of May 1792 (with some supplementary enactments) গ্রন্থের অনুবাদ ছাপা হয় কলকাতায় কোম্পানির প্রেস থেকে।

১৭৯৩ সাল। হেনরি পিট্স ফরস্টার 'শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত' করেন কলকাতায়।

১৭৯৩ সাল। এ. আপজন তাঁর 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশ করেন। ছাপা হয় কলকাতায় ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রেসে।

১৭৯৭ সাল। জন মিলার *The Tutor* বা 'সিক্ষ্যা গুরু' বই প্রকাশ করেন। ছাপা হয় কলকাতায় ক্রনিকেল প্রেস থেকে।

১৭৯৯ সাল। পূর্বোক্ত ফরস্টার তাঁর বিখ্যাত *A Vocabulary in two parts. English and Bengalee, and vice versa* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ সালে ছাপা হয়। কলকাতায় ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রেসে ছাপা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ছাঁচেঢালা বাংলা অক্ষরে ছাপার কাজ কলকাতা শহরে বেশ ভালভাবেই আরম্ভ হয়েছিল দেখা যায়। এটা বাস্তবিকই হুগলী-ত্রিবেণী-শ্রীরামপুরের সৌভাগ্য যে পঞ্চানন কর্মকার, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—যিনি প্রথম বাঙালী মুদ্রক প্রকাশক—সকলেই এই অঞ্চলের লোক। বস্তুত কলকাতার লোক হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়, অন্য কারও পক্ষেই নয়, কারণ কলকাতা তো তার চারিদিকের গ্রামের অভিবাসীদের (immigrants) নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ধীরে-ধীরে শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ডিহি-কলিকাতা গ্রামের আদিবাসিন্দা যারা ছিল, তারা নগর উন্নয়নের চাপে উৎখাত হয়ে অন্যান্য গ্রামে চলে গিয়েছে। কাজেই হুগলী-শ্রীরামপুর অঞ্চল থেকে যে মুদ্রণযুগের আদিপর্বের শিল্পী-কর্মী-ব্যবসায়ীরা এসেছেন—এবং কলকাতা শহরে এসেছেন—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাংলা অক্ষরে নিয়মিত বইপত্র ছাপার কাজ করতে হলে অক্ষর তৈরির কারখানা (type-foundry) প্রয়োজন। হলহেডের ব্যাকরণের কয়েকটি বাংলা হরফ যেখানেই ছেনিকাটা হয়ে থাক না কেন, অক্ষর তৈরির ফাউনড্রি কোথায় হয়েছিল? ১৭৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় দেশীয় ভাষায় অক্ষর তৈরির কারখানা স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়। উইলিয়াম কেরি ১ জানুয়ারি ১৭৯৮ খবর পান

A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the

country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe.

কেরি এখানে ইয়োরোপের কথা উল্লেখ করেছেন, শুধু ইংলণ্ডের কথা বলেন নি। কিছু-কিছু বাংলা হরফ হয়ত বিশেষ প্রয়োজনে ইংলণ্ড বা ইয়োরোপ থেকে ছাঁচে ঢালাই করে আনা হত। ইয়োরোপ থেকে মুদ্রিত বাংলা অক্ষরের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন ১৬৯২ সালের একটি মুদ্রিত বইতে পাওয়া গিয়েছে। বইটির নাম *Observations Physiqes et Mathematiques*। দ্বিতীয় নমুনা ১৭২৫ সালে জার্মানির লাইপ্‌-জিগ শহরে মুদ্রিত *Aurenk Szeb* বইতে পাওয়া যায়। ১৭৪৩ সালে হল্যাণ্ডের লাইডেন শহরে মুদ্রিত ডেভিড মিলের *Dissertationes Selectae* বইতে বাংলা অক্ষর ছাপা হয়। এই বইয়ের শেষে Miscellanea Orientalia নামে হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি ব্যাকরণ আছে। তাতে বাংলা ও দেবনাগরী অক্ষরের প্রতিলিপি আছে। বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড মিল তাঁর লাটিন ভূমিকায় যা লিখেছেন তার মর্ম এই : 'আমি আরও দুটি অক্ষরমালা তামার ফলকে খোদাই করেছি, ব্রাহ্মণদের বর্ণ-মালার পরিচয়ের দিক থেকে এটি মূল্যবান। যে ব্রাহ্মণ অক্ষরমালা (অর্থাৎ বাংলা) এখানে দেখানো হয়েছে তা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হত।' ১৭৭৬ সালে হলহেডের *A Code of Gentoo Laws* লণ্ডন থেকে ছাপা হয় এবং তাতে অনেক বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন

বেত বহেড়া ব্যাপারী বেনা ভেড়ুয়া ভাণ্ডারা চণ্ডাল চৈত বাঁধ কাহন চৌকী কুলী কোল পছাড়ি ডাল ঘি ঘড়ি হাট হরকরা গোমস্তা গণ্ডা কাঁসা হাওলা পান পিপুল নালা ফটিক পেয়াদা পুথি শাক ঠাকুর তরকারী টুকরি তোলা উকীল সাধ ইত্যাদি।

এর দু'বছর পরে ১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণে বাংলা অক্ষর ছাপা হয়, বাংলা দেশের হুগলীতে অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানায়।

ছেনিকাটা ছাঁচেঢালা বাংলা অক্ষর মধ্যে-মধ্যে ইয়োরোপ থেকে এদেশে আমদানি করা হত না, এমন কথা বলা যায় না। কেরির কথা থেকে এ-রকম সম্ভাবনা অযৌক্তিক মনে হয় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন বাংলাভাষায় ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ ছাপা আরম্ভ হল কলকাতায়, তখন বাংলা অক্ষর তৈরির কারখানাও কলকাতাতে স্থাপিত হয়েছিল দেখা যায়। এই ফাউনড্রির কথাই কেরি বলেছেন। এই কারখানার প্রধান মিস্ত্রী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। মার্শম্যান বলেছেন

...the punches were cut by the workman whom Sir Charles

Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of the scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengallee types from England.

কলকাতা শহরের এই দেশীয় ভাষার টাইপ ফাউনড্রিতে উইলিয়াম কেরির সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের পরিচয় হয় ১৭৯৮ সালে। তারপর শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কাজের জন্য পঞ্চাননকে কেরি সাহেব নিয়ে যান ১৮০০ সালে।

পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে পলাশীর যুদ্ধের পর কুড়ি বছরের মধ্যে ছাপাখানার আদি কেন্দ্ররূপে কলকাতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইংরেজি ছাপা তো আরম্ভ হয়েছিলই, দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলাভাষায় ছাপাও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে পূর্ণোদ্যমে চলছিল। উদ্যমটা যদিও বেশির ভাগই ছিল হিকি, উইলকিন্স প্রমুখ ইংরেজদের, তাহলেও পঞ্চানন কর্মকারের মতো এদেশীয় কারুশিল্পীদের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালীরা উদ্যোগী হয়ে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রধানত বাংলা মুদ্রিত সংবাদপত্র পুস্তক পুস্তিকার সাহায্যে তাঁরা ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার ও আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হন। হাতেলেখা পুথিপাণ্ডুলিপির যুগে এ-রকম আন্দোলন সম্ভব ছিল না। কলকাতা শহরই এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, কারণ অধিকাংশ ইংরেজি-বাংলা ছাপাখানা, সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সংস্থা তো বটেই, কলকাতাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল।

বাংলা মুদ্রণের সাংস্কৃতিক প্রসার

মুদ্রণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হল জ্ঞাপনের অর্থাৎ কমিউনিকেশনের এবং জ্ঞাপন হল ক্ষুধানিবৃত্তির মতো মানুষের অন্যতম আদিম সমস্যা। জীবজগতে পশুপক্ষীর মধ্যেও জ্ঞাপনের ব্যাপার আছে এবং তার চমকপ্রদ প্রণালীর বর্ণনা করেছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা। আদিমতম মানুষের মধ্যে জ্ঞাপনের প্রণালী পশুপক্ষীর মতো হাবভাবভঙ্গি ও ধ্বনি-প্রধান ছিল, একথাও ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন। বোবা মানুষের জ্ঞাপনের রীতি দেখে তার রূপ খানিকটা অনুমান করা যায়। এই আদিম হাবভাবভঙ্গিধ্বনি থেকে ক্রমে যখন ভাষার উদ্ভব হল তখন নিঃসন্দেহে প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ জ্ঞাপনের চড়াই-উতরাইয়ের পথে অনেক ধাপ এগিয়ে গেল অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায়। কারণ ভাষা হল হাবভাবভঙ্গি অথবা অস্পষ্ট ধ্বনির চাইতে জ্ঞাপনের অনেক বেশি সুস্পষ্ট উন্নত মিডিয়াম। শব্দধ্বনিগ্রামের তরঙ্গভঙ্গ থেকে মৌখিক ভাষার উৎপত্তি হল বটে, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র মানবজাতির মধ্যে একপ্রকারের ভাষার বিকাশ হল না। সমগ্র মানবজাতি বহুভাষাভাষী বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল। অতঃপর যখন লৈখিক ভাষার বর্ণমালার বিকাশ হল তখন তার রূপবিন্যাস একরকম হল না, নানারকমের হল। যেমন মৌখিক ভাষার বৈচিত্র্য, তেমনি লেখিক বর্ণমালার বৈচিত্র্য। ক্যানভাসে বিভিন্ন বর্ণমালা রূপায়িত করে সাজিয়ে রাখলে তা যে-কোনো চিত্রপ্রদর্শনীর তুলনায় কম আকর্ষণীয় হবে না। তেমনি বিভিন্ন মৌখিক ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য টেপরেকর্ড করলে শ্রুতিপথে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ক্যাকোফনির মতো মনে হবে। বর্ণমালার নিকট-সাদৃশ্যের মধ্যে ভাষার বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করার মতো। সম্পত্তি-ধন-দৌলতের শ্রেণীগত ভেদবৈষম্যের মতো মানবজাতির মধ্যে এই ভাষাগত বৈষম্যের সামাজিক গুরুত্ব কম নয়।

বর্ণমালাহীন অর্থাৎ লেখ্যভাষাহীন মৌখিক ভাষা আজও পৃথিবীর অনেক মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে আছে এবং বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক সামাজিক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে, বহু উন্নত সমাজ-সংস্কৃতির নিবিড় স্পর্শ এবং তরঙ্গাঘাতের মধ্যে তারা বর্তমান বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নকাল পর্যন্ত তাদের নিজেদের সমাজবিন্যাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য কেবল মৌখিক ভাষার মাধ্যমেই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। যদিও মৌখিক

ভাষার জ্ঞাপনের প্রসারক্ষেত্র একটি বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তথাপি যে-কোনো লোকভাষা হোক, তার মূল যে জনমানসের কোন অদৃশ্য অতল গভীর পর্যন্ত প্রসৃত, তা এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশে প্রতিবেশী সাঁওতালজাতির সাঁওতালী ভাষার কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। সাঁওতালী লেখ্য ভাষা নেই, সাঁওতালী বর্ণমালা নেই, সম্প্রতি তার জন্য আন্দোলনও হচ্ছে, কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে সাঁওতালী সমাজের বিশিষ্ট গঠনবিন্যাস রীতিনীতি ধর্মকর্ম সংস্কৃতি কোনকিছুই তার জন্য বিবর্ণ বা বিকৃত হয় নি, যেমন তাদের বর্ণাঢ্যতা সুদূর অতীতে ছিল, তেমনি আজও আছে। সাঁওতালরা অনেকে ইংরেজি বাংলা হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা জানেন, শিখেছেন, ভিন্ন সমাজের লোক-জনের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশাও করেন, অথচ তার জন্য কোনো প্রভাব তাঁদের ভাষার ব্যূহ ভেদ করে সমাজসংস্কৃতিকে স্পর্শ করতে পারে নি। যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে স্বজনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা। অনেক বাঙালী যাঁরা কৃত্রিম সাহেব হয়েছেন এবং সাহেবী ভাষা চিবিয়ে উচ্চারণ করেন, তাঁরা যেমন বঙ্গজনসংস্কৃতির প্রতিভূ নন, ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। অতএব মৌখিক ভাষার জ্ঞাপনগণ্ডি যতই সংকীর্ণ হোক, সমাজসংস্কৃতির লৌহবর্ম হিসেবে তার দৃঢ়তা লেখ্যভাষা অথবা মুদ্রিতভাষার চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়।

তাই যদি হয় তাহলে মৌখিক ভাষা থেকে অক্ষরবিন্যস্ত লেখ্যভাষা এবং হাতে-লেখা লেখ্যভাষা থেকে ছাঁচেঢালাই অক্ষরে মুদ্রিত ভাষা, জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কমিউনি-কেশনের মিডিয়াম হিসেবে ক্রমিক উন্নতি, না ক্রমিক অবনতির সূচক, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যদি উন্নতি হয় তাহলে সেই উন্নতি-বিচারের মানদণ্ডগুলি কি তা জানা দরকার এবং যদি অবনতি হয়ে থাকে তাহলেও তার স্বরূপ জানা আবশ্যক। প্রথমেই যেকথা মনে হয় সেটা হল এই যে 'মৌখিক ভাষা' সর্বলোকবোধ্য ভাষা, এমনকি শিশুরও বোধ্য। বর্ণমালা বা হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি সকলের বোধগম্য নয়, কারণ তা বুঝতে হলে অক্ষর-পরিচয় থাকা প্রয়োজন এবং তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। ছাঁচেঢালা মুদ্রিত ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। অতএব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রণের প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হল সর্বজনস্তর থেকে ভাষাকে জ্ঞাপনের বাহন হিসেবে অক্ষরশিক্ষিতের সংকীর্ণ স্তরে সীমিত করা। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে মৌখিক ভাষার 'মোবিলিটি' লেখ্য বা মুদ্রিত ভাষার তুলনায় অনেক কম। যেমন আমরা আজ বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর পূর্তি স্মরণ করে গর্ববোধ করছি। গর্ববোধ করতে বাধা নেই, কারণ মুদ্রণের অগ্রগতির ফলাফল বিচার করে গর্ব করার মতো বস্তু নিশ্চয় কিছু খুঁজে পাওয়া

যাবে। কিন্তু ১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণের আমল থেকে ১৯৭৮ সালের অফসেট মুদ্রণের শুরু পর্যন্ত এগিয়ে, লক্ষাধিক মুদ্রিত বাংলা বইপত্রের সম্ভার নিয়ে, আজও যখন আমরা দেখতে পাই যে বাংলাভাষী অর্ধেকের বেশি মানুষ নিরক্ষর, পাণ্ডুলিপি তো দূরের কথা তথাকথিত 'পপুলার' মুদ্রিত বইয়ের চেহারা পর্যন্ত তারা দেখে নি, দেখার আগ্রহও নেই, এবং যখন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত শহুরে বাবুরা নিরক্ষরতা দূর করার পুণ্যকর্মে ব্রতী হয়েছেন আর ব্রত যত উদ্‌যাপিত হচ্ছে তত দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে, তখন মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে আলোচনা করতে বাস্তবিকই সংকোচ হয়। যদি বাংলার কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাপলে সমগ্র বাঙালী-জনের ব্যাসার্ধ একশো হয়, তাহলে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক ব্যাসার্ধ কত হবে? খুব বেশি হলে কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়, সাক্ষরতা ও শিক্ষাদীক্ষার হিসেবে। জীবন-যাত্রা ও আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে বিচার করলে 'পাঁচ' হবে কি-না সন্দেহ। এই প্রসঙ্গ পরে আমরা উত্থাপন করব।

ইদানীং জ্ঞাপনের মিডিয়াম সম্বন্ধে মার্শাল ম্যাকলুহান নানাদিক থেকে আলোচনা করে বুদ্ধিমান পাঠকমহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর একাধিক গ্রন্থে, ১৯৬০-এর দশক থেকে, তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এখনও করছেন।[১] আধুনিক যান্ত্রিক মুদ্রণের অন্যতম প্রবর্তক জার্মান কারুশিল্পী গুটেনবার্গের নামে তিনি মুদ্রণযুগের মানুষকে বলেছেন 'গুটেনবার্গ ম্যান'। ম্যাকলুহানের প্রধান বক্তব্য হল, এই গুটেনবার্গ-মানুষ মুদ্রিত পাঠ্যবিষয়ের সত্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনেকটা অজ্ঞাতসারে, যান্ত্রিক জীবনের মানবিক বিকৃতিকে মেনে নিয়েছে। ম্যাকলুহান বলতে চেয়েছেন[২]

the visual uniformity of print constitutes a primitive model of industrial technology, and he asserts that by immersing our-

selves in information which has been processed in this way we have inadvertently conditioned ourselves to accept, without knowing that we have done so, the dehumanising tyranny of mechanical life. The man who lives in and through print submits without complaint to timetables, lists of weights and measures, formal instruction, and to all the other rationalised fiats of modern life. Gutenberg Man is punctual, productive and expedient; and since moreover he now receives so much of his knowledge without ever having to face the individual human source, his sense of spiritual community has dwindled even as his technical mastery has flourished.

ম্যাকলুহানের বক্তব্যের মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে, সত্যও আছে, কিন্তু যতটুকু সত্য আছে তা অতিরঞ্জিত। ছাপার হরফে নিজের নাম, নিজের বক্তব্য বা লেখা দেখলে কার না আনন্দ হয়। সংবাদপত্রে নাম ছাপা হলে, নিজের রচনা মুদ্রিত বইতে দেখলে সকলেই খুশি হয়। মুদ্রিত অক্ষরের সুসংযত পংক্তিবদ্ধ ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য সত্যিই মন হরণ করে, এমনকি আচ্ছন্ন করে ফেলে এতদূর যে তার ভিতর থেকে সত্যমিথ্যা বাছাই-যাচাই করার কথা আমরা ভুলে যাই। সারিবদ্ধ সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের দিকে যেমন আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তেমনি পঙক্তিবদ্ধ মুদ্রিত অক্ষরের উপরেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়, মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছাপা হরফের নিঃশব্দ কুচকাওয়াজে আমরা অভিভূত হই। সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত মানুষকেও বলতে শোনা যায় 'সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে', 'বইতে লেখা আছে' (ছাপার হরফে), অতএব সত্য। মুদ্রণের মোহজাল ছিন্নকরা সত্যিই কঠিন।

গুটেনবার্গ-মানুষের বিরুদ্ধে ম্যাকলুহানের অভিযোগ তাই একেবারে মিথ্যা নয়, কেবল সত্যটুকু অতিকথিত। মুদ্রণযুগের গুটেনবার্গ-মানুষ কিছুটা যে যন্ত্রের দাস হয় নি তা নয়, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি মুক্ত মানুষ হয়েছে মুদ্রণের দৌলতে। পাণ্ডুলিপির অতিসংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানবিদ্যা আজ মুদ্রণের মুক্তডানায় ভর দিয়ে বিশাল মানবসমাজের আকাশে বিচরণ করছে। তাতে মানুষের মঙ্গল হয়েছে এবং ব্যক্তিমুক্তি ও সমষ্টিমুক্তির সম্ভাবনাও যে বেড়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। তার জন্য ম্যাকলুহানের লাডাইটসুলভ যন্ত্রবিরোধী অগ্নিমূর্তি অভিনন্দন দাবি করতে

পারে না, কারণ যন্ত্র সকল অনর্থের মূল নয়। যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষকে অঙ্গবদ্ধ মেহনতের গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য, নতুন করে যন্ত্রের গোলাম করার জন্য নয়। যন্ত্র যদি বিকৃত হয়ে থাকে, যন্ত্র যদি মানুষকে যান্ত্রিক করে থাকে, তার জন্য যন্ত্র দায়ী নয়, যন্ত্রের মালিক-পরিচালক দায়ী। কোনো রোটারী বা অফসেট মুদ্রণযন্ত্রের গায়ে লেখা নেই যে তাকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ কপি সংবাদপত্র বা বই ছেপে মিথ্যা অথবা কোনো বিষাক্ত অকল্যাণকর ভাবধারা প্রচার করতে হবে। যদি তা করা হয় তাহলে যন্ত্রের পরিচালক তা করেন, যন্ত্র করে না। মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত বই বা পত্রিকা যদি কোনো দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ নিরক্ষর বলে অথবা দরিদ্র বলে পড়তে না পারে, তাহলে তার জন্য কি মুদ্রণযন্ত্র দায়ী, না তার মালিক অথবা সমাজের কর্ণধাররা দায়ী? গুটেনবার্গ-মানুষের বিরুদ্ধে ম্যাকলুহানের বিষোদগার তাই যুক্তিহীন।

ম্যাকলুহানের একথা ঠিক যে আদিম সমাজের মৌখিক ভাষার ভাবভঙ্গিধ্বনির আকর্ষণ লেখ্য বা মুদ্রিত ভাষার চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষজ্ঞাপনের সম্পর্ক মৌখিক ভাষার মাধ্যমে অনেক বেশি রূপরসবর্ণময় হয়ে ওঠে, যা মুদ্রিত ভাষার যান্ত্রিক পঙক্তিবদ্ধতায় হয় না। ম্যাকলুহান প্রসঙ্গে জোনাথান মিলার বলেছেন[৩]

> Primitive man, who relies almost entirely on oral exchanges, lives therefore in a condition of rich imaginative enchantment, his mentality galvanised throughout the length and breadth of its sensory repertoire. According to McLuhan, the invention of writing violated this sacred manifold and forced men to attend to vision at the expense of all the other sensory channels ..the message transmitted by manuscript is like a symphonic melody picked out on the violin, while the same idea expressed in spoken words projects the condition of the all orchestral score.

মুদ্রণযুগের মধ্যগগনে পৌঁছেও শ্রোতাদের মধ্যে সোজাসুজি বক্তৃতার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে আজও বোঝা যায়, মৌখিক ভাষার প্রতিক্রিয়া কত গভীর এবং তার সঙ্গে আঙ্গিক ভাবভঙ্গি শব্দধ্বনি ইত্যাদির সম্পর্ক কত প্রত্যক্ষ। তা বুঝবার জন্য আদিসমাজের স্তর পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন হয় না। কথার উল্লম্ব গভীরতা যাই হোক, তার অনুভূমিক

৩ Miller: pp. 9-10

সংঘাত খুবই সীমাবদ্ধ এবং মুদ্রিত বইয়ের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। মুদ্রিত বইয়ের প্রসার-সম্ভাবনা মানবসমাজের দূরদিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই দিগন্ত যদি সুপরিমিত সামাজিক বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার দায়দায়িত্ব বহন করতে হয় সমাজতরীর কাণ্ডারীদের, গুটেনবার্গ অথবা অন্য কোনো মুদ্রককে নয়। সাঁওতালী ভাষা-সংস্কৃতির কথা আগে বলেছি। আজ যদি সাঁওতালরা তাঁদের নিজেদের বর্ণমালা রচনা করেন এবং সেই বর্ণমালা ছাঁচেঢালাই হয়ে মুদ্রিত সাঁওতালী বই প্রকাশিত হয়, তাহলে সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারক্ষেত্র নিঃসন্দেহে অনেক বিস্তৃত হবে, যারা সাঁওতাল নন তাঁরা শিখতে পারবেন, সাঁওতালী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ও তাঁদের হবে। অগ্রগতি হিসেবে সেটা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু যদি সাঁওতালী বর্ণমালা ও মুদ্রিত ভাষা প্রচলনের পরেও দেখা যায় যে সাঁওতালদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহলে তার জন্য বর্ণমালা অথবা মুদ্রণ দায়ী হবে না, সাঁওতালী সমাজের প্রধান পরিচালকরাই দায়ী হবেন এবং তাতে অগ্রগতি হবে না, অধোগতিই হবে।

এ-রকম যুক্তির মধ্যে কোনো হেত্বদোষ বা ফ্যালাসি নেই। সরল প্রাঞ্জল যুক্তি। কিন্তু আশ্চর্য হল, ম্যাকলুহান বহুরকমের বিচিত্র সব যুক্তির অবতারণা করেও এই সহজ যুক্তির পথ এড়িয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ যন্ত্রের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেছেন, যে সামাজিক পরিবেশে যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে বিকৃত হচ্ছে তার দিকে ফিরে চান নি। মনেহয় তিনি জ্ঞানপাপী। তা না হলে রেডিওতে কণ্ঠস্বর শুনে এবং টেলিভিশানে চেহারা ভাবভঙ্গির সঙ্গে কণ্ঠস্বর শুনে অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে তিনি ভাবতেন না যে সেই আদিম ট্রাইবাল-যুগের জ্ঞাপনের বর্ণাঢ্যতা ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমাবেশ আবার ইলেকট্রনিকযুগে সম্ভব হয়ে উঠেছে, মুদ্রণযুগের বিচ্ছিন্ন মানুষ আবার অবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধতার উত্তাপ অনুভব করছে। মামফোর্ড মনেহয় একটু বিদ্রূপ করেই ম্যাকলুহানকে ইলেট্রনিকযুগের 'পয়গম্বর' বলেছেন। বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হলেও অযৌক্তিক নয়, কারণ মামফোর্ড যন্ত্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী দুই-ই, ম্যাকলুহান কোনটাই নন। মুদ্রণের সমাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে মামফোর্ড বলেছেন[৪]

No one worthy of respect seriously doubts the social advantages of multifolding the printed word, for this invention broke down the class monopoly of written knowledge and opened the world in time as decisively as the new explora-

tions that were contemporary with it opened the world of space.

ম্যাকলুহানের 'বিশ্বজোড়া গ্রাম' সম্বন্ধে মামফোর্ড বলেছেন[৫]

Audo-visual tribalism (McLuhan's 'global village') is a humbug. Real communication, whether oral or written, ephemeral or permanent, is possible only between people who share a common culture—and speak the same language; and though this area can and should be enlarged by personally acquiring more languages and extending one's cultural horizon through travel and active personal intercourse, the notion that it is possible to throw off all these limits is an electronic illusion.

ম্যাকলুহানের ইলেকট্রনিক বিভ্রম নিয়ে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাঁর চক্ষুকর্ণ-ইন্দ্রিয়নির্ভর বিশ্ব-গ্রামে ইলেকট্রনিক স্বপ্ন যেদিন বাস্তব সত্যে পরিণত হবে সেদিন 'বিশ্ব' অথবা 'গ্রাম' কোনটারই অস্তিত্ব থাকবে কি-না সন্দেহ।

ছাঁচেঢালা সচল অক্ষরের মুদ্রণকাল জার্মান স্বর্ণকার গুটেনবার্গের সময় থেকে পাঁচশো বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আধুনিক মুদ্রণরীতির এই কৃতিত্ব জার্মানির গুটেনবার্গের লভ্য কি-না তা নিয়েও মুদ্রণবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাঠের ব্লক থেকে ছাপা, হাতেতৈরি কাগজ থেকে যন্ত্রে তৈরি কাগজ, চীনদেশেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। ব্লকপ্রিন্টিংএর মতো সচল টাইপপ্রিন্টিংও চীনে একাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয় এবং পি শেঙ নামে একজন কারুশিল্পী ছাঁচেঢালা অক্ষরে মুদ্রণের প্রথা আবিষ্কার করেন। কিভাবে অক্ষর ছাঁচেঢালাই করে ছাপার জন্য ব্যবহার করতে হবে, সেকথাও তিনি লিপিবদ্ধ করে যান এবং বৈজ্ঞানিক শেন কুয়া (১০৩২-৯৬ খ্রীস্টাব্দ) তার বিবরণ দেন 'মেঙ চি পি তান' নামে বইতে।[৬] এক্ষেত্রে আমাদের ভারতের দানও কম নয়। বস্তুত বিজ্ঞান ও টেকনোলজির প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস কতকটা ভারত ও চীনের মতো এসিয়ার প্রাপ্য এবং কতটা ইয়োরোপের প্রাপ্য, তার বিজ্ঞানসম্মত বিচার আজও হয় নি। তা

৫ **Mumford :** *Ibid*, p. 29

Mumford : *Technics and Civilization*, London, 1934, pp. 135-36

৬ **Liu Kuo-Chun :** *Story of the Chinese Book*, Peking, 1958.

সত্ত্বেও আধুনিক মুদ্রণের আদিপর্বের ইতিহাসে গুটেনবার্গ নিউমিস্টার মেনটেলিন, জন ও ওয়েনডেলিন (ভেনিস), জাঁ দুপ্রে ও আঁতোয়া ভেরাদ (ফ্রান্স) প্রমুখ প্রিন্টারদের কথা স্মরণীয়। প্রথমদিকে মুদ্রক-প্রকাশকদের অনেকরকমের বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির লিপিকররা (কপিস্ট) বাধা দিয়েছেন, যেমন অনেকক্ষেত্রে কারুশিল্পীরা নতুন উৎপাদনযন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। মধ্যযুগের শাসকশ্রেণী ও অভিজাতশ্রেণী মুদ্রণের ব্যাপারটাকে আদৌ সুনজরে দেখেন নি। তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারকে তাঁরা সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করতেন এবং লিপিকরদের হাতেলেখা পুথিপাণ্ডুলিপির সংগ্রহকে তাঁরা মণিমুক্তার অলংকারসম্ভার ভাবতেন। কার সংগ্রহে কত দুষ্প্রাপ্য এবং সংখ্যায় কত বেশি পুথিপাণ্ডুলিপি আছে তাই দিয়ে মর্যাদার বিচার করা হত। পেটের অন্নের দায়ে লিপিকররা শুধু ছাপাখানার বিরোধিতা করেন নি, ধনিক অভিজাতরাও সামাজিক মর্যাদালোপের আশংকায় মুদ্রকদের কাজকর্মে ও প্রভাববিস্তারে বাধা দিয়েছেন। ডিউক ফেডেরিগোর মতো লর্ড ডিউক মনে করতেন[৭]

> In his splendid library all books were superlatively good and written with the pen, had there been one printed book, it would have been ashamed in such company.

মুদ্রণের প্রতি অভিজাতদের বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা অপসারণ করতে অনেকটা সাহায্য করেছেন জেল্‌দগররা (বাইণ্ডার)। অনেক মুদ্রিত বই খুব চমৎকার করে বাঁধিয়ে তাঁরা ধনিকদের গ্রন্থাগারে পাঠিয়েছেন। সুদৃশ্য মহার্ঘ্য বাঁধাইয়ের পরে কুশ্রী অপাঠ্য আদিপর্বের ছাপা বই অভিজাতদের গ্রন্থাগারে পুথিপাণ্ডুলিপির পাশে স্থান পেয়েছে[৮]

> It was the binders rather than the printers who overcame the reluctance of highbrow connoisseurs in admitting printed books to their stately shelves, and down to the present the sumptuousness of choice bindings frequently contrasts oddly with the shoddiness of printing and the worthlessness of contents thus bound.

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের অগ্রগতির পথে অনেক বাধা এসেছে দেখা

যায়। সেইসব বাধা অতিক্রম করে ছাপা বাংলা বই ধীরে-ধীরে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে যে রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ হয়েছে, তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় পরিবেশের পার্থক্য অনেক। প্রধান পার্থক্য হল, আমাদের দেশে আধুনিক মুদ্রণের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ পরাধীন ঔপনিবেশিক পরিবেশের মধ্যে হয়েছে, যেটা কোনদিক থেকেই তার অগ্রগতির অনুকূল নয়।

প্রথম ছেনিকাটা ছাঁচেঢালা বাংলা অক্ষর হলহেডের ব্যাকরণে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা দেশে বেশ কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং তাতে বই নয় শুধু, সংবাদপত্রও মুদ্রিত হতে থাকে। বাংলা অক্ষরমুদ্রণের দুশো বছর ১৯৭৮এ পূর্ণ হলেও আর দুবছর পরে ১৯৮০ সালে সংবাদপত্রের দুশো বছর পূর্ণ হবে, কারণ ১৭৮০ সালে জন অগস্টস হিকি যখন এদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' ইংরেজিতে প্রকাশ করেন তখন তার প্রসপেকটাসে তিনি লেখেন[১]

> This paper is set on foot with that design and to bring into one Focus, or immediate point of view, the numerous notices, advertisements etc, now handed about by Harcarrahs in Manuscript—

ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জন হিকি বেশ একটু মাথা পাগলা লোক ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং সাংবাদিকের সেটা বড় গুণ। দেনার দায়ে হিকি প্রায় লালবাজারে জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতেন এবং সেইখানেই তাঁর সঙ্গে অ্যাটর্নি হিকির প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে জেলখানায় জন হিকি প্রিন্টিং সম্বন্ধে একখানি বই হাতে পান এবং সেই বই পড়ে তাঁর প্রিণ্টার হবার বাসনা হয়। অনেকদিন ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করে হিকি একসেট ছাপার হরফও তৈরি করেন এবং তাই দিয়ে ছাপাখানার ব্যবসাও করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকা জমিয়ে বিলেত থেকে তিনি ছাপাখানার যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদি অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে কিছু বিলেতি ওষুধও আমদানি করেন ডাক্তারী করবেন বলে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাংবাদিক হবার ইচ্ছা হয় এবং একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৭৮০ সালে। সংবাদপত্রের নাম হল

১ হিকির সংবাদপত্রের পরিকল্পনা 'Proposals' নামে ছাপা হয়। লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

HICKY'S

BENGAL GAZETTE

Or The Original

CALCUTTA GENERAL ADVERTISER

A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties,

but influenced by None

বাঁকা হরফে মুদ্রিত কথাগুলি (হিকির নিজস্ব), সকলেই জানেন, গুরুত্বের জন্য বাঁকানো। সকল দলের জন্য এবং কারও দ্বারা প্রভাবিত নয় এমন একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হিকি। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার শেষে প্রিণ্টার্স লাইনে লেখা থাকত

CALCUTTA, Printed by J. A. HICKY, *first* and late

PRINTER, TO the HON. COMPANY

এখানেও 'ফার্স্ট' কথাটির উপর গুরুত্ব লক্ষণীয়। প্রেসের ঠিকানা নেই, মনে হয় লালবাজার অঞ্চলে কোথাও হিকির প্রেস ছিল। প্রিণ্টার এডিটার ফিজিসিয়ান হিকির নাট্যশালা প্রতিষ্ঠারও বাসনা হয়েছিল। নাট্যকারও তিনি ছিলেন। তাঁর পত্রিকার একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় তিনি লিখেছেন ১০

Mr. HICKY begs leave to inform his friends and the Public in Gen'l that he will speedily (at the solicitation of several Ladies and Gentlemen of Distinction) open a subscription for erecting a NEW THEATRE in Calcutta, and as he is well versed in the Sock, and Buskin, having practiced when at School, and tho' many years has elapsed since that time, yet he hopes by their friendly Indulgence, he will soon be able to render some entertainment.

He is now writing out a Comic, Tragic Play, Call'd the Medly of Mortals, wherein during the space of two Acts Tyranny Triumphs over Virtue. At Length the plot is discovered and Virtue Triumphs and the Captive Mortals are brought to public view loaded with chains, and disgrace.

১০ *Bengal Gazette*, December 2, 1780. লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

নাটকের বিষয়বস্তুর বিবরণ থেকে মনে হয় হিকি নাটকটি লিখেছিলেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল ধর্মের জয়, ন্যায়ের জয়, অধর্ম ও অন্যায়ের পরাজয়। নাটকের অভিনয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় হয়েছিল কি-না জানা যায় না। এই নাট্যশালা ও নাটকের বিজ্ঞপ্তির মধ্যেও হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার আদর্শের কথা জানাতে ভোলেন নি। তিনি লিখেছেন

> As the original Bengal Gazette, will in future abound with lively and entertaining matter, and that the most secret, and oppressive transactions if properly authenticated and supported shall be insertcd without any regard being paid to the oppressors, or the rank they may bear.

হিকির সাংবাদিক শালীনতার স্তর উচ্চাঙ্গের ছিল না, তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রায় তার শোভন সীমা লংঘন করে যেত। কিন্তু তাঁর কালের কথা মনে রেখে এই ত্রুটি ক্ষমা করা যেতে পারে। মুদ্রণের কয়েকটি যুগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্য তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। মুদ্রণের ফলেই আমাদের দেশে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের আবির্ভাব সম্ভব হল, পুথিপাণ্ডুলিপি থেকে বই প্রকাশ ও প্রচার করাতেও কোনো বাধা রইল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তো বটেই, রাজনীতির সংবাদ, শাসকদের কার্যকলাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ, দেশের নানাবিধ ঘটনা, যা মুদ্রণপূর্ব যুগে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জানার অথবা জানাবার উপায় ছিল না, তা জানা ও জানানো মুদ্রিত সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রচারের ফলেই সম্ভব হল। প্রথমদিকে এই প্রচারক্ষেত্রের সীমানা খুবই সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মুদ্রণের দান সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচলতার কথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন ১৭৮০ সালে হিকির ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ক'জন কিনতেন বা পড়তেন, অর্থাৎ তার প্রচারসংখ্যা কত ছিল? কয়েকশো মাত্র, খুব বেশি হলে চার-পাঁচশোর বেশি নয়। কারা পড়তেন? কলকাতা শহরের সাহেবরাই বেশি, কয়েকজন ধনিক অভিজাত বাঙালী ও ভারতীয়, যাঁরা কয়েকডজন ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করে তৎকালে ইংরেজিবিদ্যায় 'পণ্ডিত' বলে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মোগল আমলের হাতেলেখা সংবাদলিপির আমলে, যা হরকরারা বহন করে নিয়ে যেত, সংবাদের এই সামান্য সচলতাও সম্ভব ছিল না। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি সংবাদলিপির আমলের সামাজিক অচলতাকে মুদ্রণযন্ত্র ভেঙ্গে দেয় এবং জ্ঞাপনের পথ প্রশস্ত করে। মুদ্রণের ফলে জ্ঞাপনের স্বাধীনতাও সমাজে স্বীকৃত হয়, যা তার আগে, মানুষের কাছে কল্পনাতীত ছিল। হিকির পত্রিকার আদর্শ ঘোষণার মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যই প্রকাশ পেয়েছে এবং এই

জ্ঞাপনের স্বাধীনতাই মুদ্রণযুগের সবচেয়ে বড় দান।

বাংলা বই ও পত্রিকা নিয়মিতভাবে ছাপা যখন আরম্ভ হল উনিশ শতক থেকে, তখন বাংলার সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল উন্নয়ন ও সংস্কারসাধনে যাঁরা অগ্রসর হলেন —রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর ও তাঁর উত্তরসূরীরা—তাঁদের সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকা, জনসভায় বক্তৃতা নয়, কারণ এ-রকম বক্তৃতার রেওয়াজ তখন ছিল না। রামমোহন, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী, বিদ্যাসাগর, সকলেই মুদ্রণযন্ত্রের পোষক ছিলেন, এমনকি নিজেরা কেউ-কেউ মুদ্রণপ্রকাশন বাণিজ্যে উদ্‌যোগীও হয়েছেন, যেমন বিদ্যাসাগর।[১১] কাজেই মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রিত বাংলা বই-পত্রিকার সাহায্যে তাঁরা যে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ব্যাসার্ধ কিছুটা অন্তত বিস্তৃত করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তার জন্য বাংলার ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতিও সাধারণভাবে খানিকটা সম্ভব হয়েছে, জীবনের গতি জনসমাজমুখী হয়েছে। কিন্তু জনসমাজমুখী কতদূর হয়েছে, তার পথের অন্তরায়গুলিই বা কতখানি অপসারিত করা সম্ভব হয়েছে, সেটাও বিচার্য বিষয়।

অন্তরায় অনেক ছিল এবং ইয়োরোপের চাইতে বেশি, কারণ ইয়োরোপীয় সমাজের গড়ন আর আমাদের সমাজের গড়নের পার্থক্য অনেক। আমাদের দেশেও পুথিপাণ্ডুলিপির লিপিকররা মুদ্রণের আবির্ভাবকে সুনজরে দেখেন নি, পুথিপাটার চিত্রকররা শংকিত হয়েছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজা-মহারাজারা, জমিদাররা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা মুদ্রিত বইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ অশাস্ত্রীয় ধর্মবিরোধী ব্যাপার বলে প্রতিবাদও করেছেন। তৎসত্ত্বেও রামমোহন বিদ্যাসাগর কেউ মুদ্রণ বর্জন করেন নি এবং ক্রমেই তার প্রচলনের পথ প্রশস্ত করেছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকার মূল্য ছিল অত্যধিক এবং বইয়ের দোকানও বিশেষ ছিল না। প্রকাশকের বাড়ি থেকে অথবা ছাপাখানা থেকে বই কিনে নিয়ে আসতে হত। এই কারণে বাংলা বই ছাপা হলেও তার প্রসার বা প্রচার তেমন হত না এবং তার ফলে তার জনসমাজমুখী গতি খুবই মন্থর ছিল। উনিশ শতকের প্রথমপর্বের মুদ্রিত বাংলা বই সম্পর্কে যে কয়েকটি নির্বাচিত সংবাদ এখানে আমরা উল্লেখ করছি, তা থেকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা খানিকটা পরিষ্কার হবে।[১২] সংবাদগুলি প্রাচীন পত্রিকায় সংকলিত হলেও আধুনিক ভাষায় সংক্ষেপিত।

জুলাই ১৮১৮। পীতাম্বর শর্মা জানাচ্ছেন যে অমর সিংহকৃত অভিধান আকারাদি-

১১ বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্রষ্টব্য।

১২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড।

ক্রমে ছাপা হয়েছে। ৪৯২ পৃষ্ঠার বই। মূল্য ছয় টাকা। যাঁর নেবার ইচ্ছা তিনি উত্তরপাড়ায় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অথবা রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভায় চেষ্টা করলে পাবেন।

অক্টোবর ১৮১৮। ইংরেজি বিদ্যা সহজে শেখা যেতে পারে এরকম বই ছাপা হয়েছে বাংলায়। 'চামড়া বন্ধ জেল্দ করা' – মূল্য 'ফি কেতাব ৩ টাকা'। যাঁর কেনার বাসনা তিনি কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আফিসে অথবা শ্রীরামপুরে কাছারী বাড়ির কাছে 'শ্রীজান দেরোজাঞ সাহেবের' বাড়িতে খোঁজ করবেন।

অক্টোবর ১৮১৯। উইলসন সাহেবের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান ছাপা হয়েছে, ১১১৬ পৃষ্ঠার বই। মূল্য ইংলিশ কাগজে ছাপা ১০০ টাকা, পাটনাই কাগজে ছাপা ৮০ টাকা।

ফেব্রুয়ারি ১৮২২। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা বইয়ের দাম এই :

সংস্কৃত

ইংরেজিসহ রামায়ণ, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ	:	প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	:	৪ টাকা
সাংখ্যসার	:	৬ টাকা

বাংলা

কেরী সাহেবের ইংরেজিসহ ব্যাকরণ	:	৪ টাকা
বত্রিশ সিংহাসন	:	৫ টাকা
রাজাবলী	:	৫ টাকা

জানুয়ারী ১৮২৫। আড়পুলির ছাপাখানায় বারানসী আচার্যের ছাপা

কালীর সহস্র নাম	:	১ টাকা
বিষ্ণুর সহস্র নাম	:	১ টাকা
রাধিকার সহস্র নাম	:	১ টাকা

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃতসহ উত্তম কাগজে ছেপেছেন। পত্রসংখ্যা ৫০৫, মূল্য ১৬ টাকা। 'মনুসংহিতা'রও বাংলা অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। 'গ্রাহকের অভাবে মনু ছাপা না হয় এ বড় খেদের বিষয়। যদি মনু জীব জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন।'

আগস্ট ১৮২৭। চন্দ্রিকাযন্ত্রের মালিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রণের পরিকল্পনা করে জানাচ্ছেন : শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ 'তুলাত কাগজে প্রাচীন

ধারা মত পুস্তকের পাত' করে 'ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত' করা হবে। মূল্য গ্রাহকদের জন্য ৩২ টাকা সাধারণের জন্য ৫০ টাকা।

জানুয়ারি ১৮৩০। গত বছরে (১৮২৯) প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা লিখছেন যে এদেশে কেবল ১৬ বছর হল বাংলা বই ছাপা আরম্ভ হয়েছে। গত বছর বাংলা ভাষায় ৩৭ খানা বই ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি ছোট পুস্তিকা আছে। ছাপা বাংলা বইয়ের 'অধিকাংশই হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত।'

১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের যুগের প্রায় শেষ এবং ইয়ংবেঙ্গল যুগের সূচনা বলা যেতে পারে। এই সময়টাকে বাংলা মুদ্রণের আদিপর্ব বলা যায়। দেড়শো বছর আগেকার কথা। তখন বেশির ভাগ ধর্মসংক্রান্ত বই ছাপা হত, বইয়ের দাম বেশি ছিল, গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়েও অনেক বই ছাপা হত, বই বিক্রির ভাল ব্যবস্থা ছিল না, প্রচারও তেমন হত না, পুথির আকারে ব্রাহ্মণ মুদ্রক দিয়েও ধর্মগ্রন্থ ছাপা হত। যখন একজন লোকের পেট ভরে একমাস খেতে খরচ হত তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকা, তখন ৫০ টাকা মূল্য দিয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবত কিনে পাঠ করা অথবা ৫ টাকা দিয়ে 'বত্রিশ সিংহাসন' কেনা, এমনকি ১ টাকা দিয়ে কালী বা বিষ্ণু বা রাধিকার সহস্রনাম জানার আগ্রহ সমাজের ক'জনের থাকতে পারে তা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। কলকাতার বাইরের গ্রামাঞ্চলের কথা না বলাই ভাল। কলকাতা শহরের মধ্যেও সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের খুবই ক্ষুদ্রাংশ বাংলা বই কিনে পড়তে আগ্রহী হতেন। কিন্তু মুদ্রিত বইয়ের জন্য 'সাধারণ গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, যা পুথিপাণ্ডুলিপির যুগে সম্ভব ছিল না। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ফলে বইয়ের পাঠকসংখ্যা বাড়ে, যাঁরা বই কিনতে পারেন না তাঁরা গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে বই পড়তে পারেন। কলকাতায় 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' ১৮৩৫ সালেই স্থাপিত হয় এবং এই গ্রন্থাগার পরিচালনার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকরা খানিকটা পাঠকদের পাঠাভ্যাস ও পাঠরুচি পরিবর্তন করতে পারেন। গুরুবিষয়ের বই কিনে, লঘু বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে, তাঁরা পাঠকদের পাঠ্যবিষয়ে রচি কিছুটা বদলাতে পারেন।[১৩] উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন নগরে ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, এবং তার ফলে বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক প্রভাবের ক্রমবিস্তার সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু তা সম্ভব হলেও একথা অনস্বীকার্য যে তার ব্যাসার্ধ খুব বেশি বাড়ে নি। তার প্রধান কারণ, সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসার হয় নি, এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাব।[১৪] মুদ্রণের স্বাধীনতা অপব্যবহার করে অনেক মুনাফালোভী প্রকাশক রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রভৃতি যৌনবিষয়ের সচিত্র বই ছেপে স্বল্পশিক্ষিত পাঠকদের রুচিবিকৃতিতে সাহায্য করেছেন। রেভারেণ্ড লঙ তাঁর ১৮৫৬-৫৭ সালের বাংলা বইয়ের হিসেবের উল্লেখ করেছেন যে অশ্লীল যৌনবিষয়ের একটি বই, ২০খানা চিত্রসহ, একবছরে তিরিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। কিন্তু ১৮৫৬-৫৭ সালের এই সমস্যা ১৯৭৮ সালে কি আরও বেশি ভয়াবহরূপে প্রকট নয়? এই একই সমস্যা বর্তমানে অনেক বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা তো বটেই, বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণী মুদ্রণের স্বাধীনতা ও প্রসার-ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণের পাঠ্যবিষয় ও রুচি যে কতদূর পর্যন্ত বিকৃত বা ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলতেই হয় যে ম্যাকলুহানের ‘গুটেনবার্গ-মানব’ বাস্তবিকই মুদ্রণযুগে দানবের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার সমাধান ম্যাকলুহানের ইলেকট্রনিক যুগের রেডিও-টেলিভিজানের ‘গ্লোবাল গ্রামে’র পুনরাবির্ভাবে সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু শ্রেণীস্বার্থশূন্য মুনাফালোভমুক্ত জনকল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। তাহলে মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণ-যন্ত্রীদের স্বপ্ন সার্থক হবে এবং তার সাংস্কৃতিক প্রভাব সমাজের সর্বজনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হবে।